ঈদ সংখ্যা

জুন ২০১৭ ■ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

২৩শে জুন : আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস

বাংলাদেশের জনপ্রশাসন

৫ই জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আমাদের করণীয়

সাক্ষাৎকার

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন

অভিনেত্রী দিলারা জামান

ঈদ উৎসব : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

জুন ২০১৭ ❑ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৪

জনসাধারণের সাথে কোলাকুলিরত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –ফাইল ছবি

সম্পাদকীয়

সংযম, ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির বার্তা নিয়ে আবার এল রমজান। এ মাসে রয়েছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এক রজনী–লাইলাতুল কদর। এক মাসের সিয়াম সাধনা শেষে খুশির বার্তা নিয়ে আসে ঈদ। বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর একটি সার্বজনীন উৎসব। এদেশে ঈদ উৎসবে ধর্মীয় আচার ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার একাকার হয়ে এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। বাঙালি মুসলমানেরা ঈদ উৎসবকে বিশাল জাতীয় উৎসবে পরিণত করেছে। উৎসবের আমেজে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর ঈদ সংখ্যাটি ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হলো। ঈদ ও রমজান নিয়ে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*-এ একাধিক নিবন্ধ রয়েছে।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। মানব সভ্যতার বিকাশ ও অস্তিত্বের জন্য পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ জরুরি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে পরিবেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ সুরক্ষায় সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ'-এ 'পরিবেশ সুরক্ষা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশ বিষয়ে নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যায়।

২৩শে জুন আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস। বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত গণকর্মচারীদের জন্য দিবসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নানা আয়োজনে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। জনসেবায় উদ্ভাবন ও প্রণোদনাকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার ২০১৫ সাল থেকে জনপ্রশাসন পদক প্রবর্তন করেছে। দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ ছাপানো হলো এ সংখ্যায়।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, অভিনেত্রী দিলারা জামান এবং কবি নির্মলেন্দু গুণ সহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের প্রতি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। এ সংখ্যায় সেলিনা হোসেন ও দিলারা জামান-এর সাক্ষাৎকার এবং নির্মলেন্দু গুণ, কবি আহসান হাবীব এবং কলম জাদুকর হুমায়ূন আহমেদ-এর ওপর নিবন্ধ প্রকাশ করা হলো।

১৮ই জুন বাবা দিবস উপলক্ষে নিবন্ধ ছাড়াও এবারের ঈদ সংখ্যায় গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনিসহ বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। এছাড়া রয়েছে নিয়মিত প্রতিবেদন। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক ও প্রচ্ছদ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারি পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; **স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।**

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

নিবন্ধ
ঈদ উৎসব : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৪
শামসুজ্জামান খান

রোজা, জাকাত, মহিমান্বিত রজনী ও ঈদ ৭
ড. ফজলুর রহমান

পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের করণীয় ৯
শামসুজ্জামান শামস

২৩শে জুন আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস বাংলাদেশের জনপ্রশাসন ১২
মুহা. শিপলু জামান

বৃহৎ ঈদ জামাত ২০
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

কবি নির্মলেন্দু গুণ : স্বাপ্নিক ধ্যানমগ্ন মনীষী ৩৬
শাফিকুর রাহী

সুন্দর পরিবেশে গড়ে তুলি সুন্দর পৃথিবী ৩৯
মিজানুর রহমান মিথুন

বাবা : বটবৃক্ষের ছায়া ৫১
মঈনুল হক চৌধুরী

প্রবন্ধ
শান্তি ও মানবতায় ইসলাম ২৩
ম. মিজানুর রহমান

আহসান হাবীবের কবিতায় মধ্যবিত্তের চালচিত্র ২৫
আজাদ এহতেশাম

একজন হুমায়ূন আহমেদ ৩১
লিটন ঘোষ জয়

নকশিকাঁথা ৫৬
শিবনাথ বিশ্বাস

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির শুদ্ধতা ৫৮
শাহ সোহাগ ফকির

মানুষ মানুষের জন্য ৬১
মোহাম্মদ হাসান জাফরী

সাক্ষাৎকার
কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ৪০
অভিনেত্রী দিলারা জামান ৫৯

বড়ো গল্প
যায় বেলা ৪২
আরেফা চৌধুরী

ভ্রমণকাহিনি
মীর সাহেব থেকে আমঝুপি ২৮
হুমায়ুন মুজিব

গল্পগুচ্ছ

বৃক্ষবন্ধু ১১
নুরুল ইসলাম বাবুল

আগুন পাখি ১৬
আফরোজা পারভীন

অসুখ ২২
সুধীর কৈবর্ত

মেঠোপথ ২৭
সাদিকুল ইসলাম

দুঃস্বপ্ন ৩৩
সাহস রতন

প্রতিশোধ ৩৭
সালাম হাসেমী

তাসের ঘর ৫৩
নাসিম সুলতানা

কবিতাগুচ্ছ

মনজুরুর রহমান, মোশাররফ হোসেন ভূঁঞা, ফারুক নেওয়াজ, আবুল আউয়াল রণী ১৯

আমিরুল হক, বাতেন বাহার, নাহার আহমেদ, আবুল হোসেন আজাদ ৩০

লিলি হক, জাকির হোসেন চৌধুরী, শামসুল করিম খোকন, মনসুর জোয়ারদার, দেলোয়ার বিন রশিদ ৫০

খান মো. রফিকুল ইসলাম, আনসার আনন্দ, খান চমন-ই-এলাহি, মাজেদুল হক, শিলা চৌধুরী ৫৫

এস এম শহীদুল আলম, রুস্তম আলী, নাসিমা আক্তার নিঝুম, মোহাম্মদ ইলিয়াছ, মাহতাব আলী, অপু বড়ুয়া ৬২

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬৩
প্রধানমন্ত্রী ৬৪
তথ্যমন্ত্রী ৬৫
আমাদের স্বাধীনতা ৬৬
জাতীয় ঘটনা ৬৬
উন্নয়ন ৬৮
আন্তর্জাতিক ৬৯
শিক্ষা ৭০
প্রতিবন্ধী ৭০
স্বাস্থ্যকথা ৭০
সংস্কৃতি ৭১
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৭২
যোগাযোগ ৭৩
কৃষি ৭৪
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৪
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৭৪
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭৫
জেন্ডার ও নারী ৭৬
নিরাপদ সড়ক ৭৭
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৭
শিল্প-বাণিজ্য ৭৮
চলচ্চিত্র ৭৯
ক্রীড়া ৮০

ঈদ উৎসব: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলায় ঈদ উৎসব বিষয়ক ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশ মুসলিম অধিকারে এলেও এদেশে নামাজ-রোজা ও ঈদ উৎসবের প্রচলন হয়েছে তারও আগে। অষ্টম শতকে আরব ও মুসলিম বণিকেরা চট্টগ্রামের নৌ-বন্দরের মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এভাবেই মুসলিম সংস্কৃতির সাথে পূর্ব বাংলার পরিচয় ঘটে। রাজধানী ঢাকা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঈদ উদ্‌যাপনের কিছু খবর পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ঈদ উৎসবের নানা মাত্রিকতা ও বহুল বিস্তৃত তাৎপর্য আছে। ঈদ উৎসবের সঙ্গে ধর্ম ও আচার ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ঈদ আমাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশভঙ্গির অন্যতম মাধ্যম ও বাহন। এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, পৃষ্ঠা-৪।

পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের করণীয়

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই পরিবেশ। পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। পরিবেশের ক্ষতির মাত্রাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হয় পরিবেশ দিবস। উন্নয়ন ও পরিবেশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ সুরক্ষা জরুরি। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বনায়নের বিকল্প নেই। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষা অপরিহার্য। প্রাণের অস্তিত্বের জন্যই সবুজ বৃক্ষরাজি ও বনায়নের প্রয়োজন অপরিসীম। এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখুন, পৃষ্ঠা-৯।

আহসান হাবীবের কবিতায় মধ্যবিত্তের চালচিত্র

ত্রিশোত্তর বাংলা কাব্যের উত্তরণ পরিক্রমায় আধুনিক কাব্য মনস্কতায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কবি আহসান হাবীব। সমকালীন কাব্যধারায় লীন মধ্যবিত্তের গভীর জীবনবোধ ও সত্তার সংকটময় পরিস্থিতি তাঁর লেখনিতে প্রকট হয়েছে। আধুনিক নাগরিক জীবনে নৈরাশ্য, হতাশা, ব্যর্থতা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের চালচিত্র অপূর্ব রূপে উদ্ভাসিত তাঁর কাব্যে। পাশাপাশি সংকট উত্তরণে বেঁচে থাকার নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা পরিব্যপ্ত তাঁর সৃষ্টিজুড়ে। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা ২৫।

বাংলাদেশের জনপ্রশাসন

জনগণকে নানাবিধ সেবা প্রদান ও নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য সরকারের যে অঙ্গ সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে তাহলো জনপ্রশাসন। বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে আজকের জনপ্রশাসন পূর্বে এমন ছিল না। কালের বিবর্তনে ও সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন গ্রহণ করে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, জনসেবায় উদ্ভাবন, শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। মেধাভিত্তিক, সেবামুখী, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রবর্তন করা হয়েছে জনপ্রশাসন পদক। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১২।

একান্ত সাক্ষাৎকারে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও অভিনেত্রী দিলারা জামান

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, শিশু সাহিত্য, সম্পাদনা, অনুবাদসহ সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর রয়েছে দৃপ্ত পদচারণা। তাঁর একাধিক উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপ পেয়েছে। তাঁর গল্প, উপন্যাস ইংরেজি, রুশ ও কানাড়ী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর লেখনিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

প্রখ্যাত অভিনেত্রী দিলারা জামান দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ অভিনয় করছেন। মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে তাঁর রয়েছে সমান পদচারণা। নিভৃতচারী কথাশিল্পী হিসেবেও তিনি পাঠক মহলে পরিচিত। একুশে পদক ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই দুই বরণ্যে ব্যক্তির ঈদ ভাবনা বিষয়ে সাক্ষাৎকার দেখুন পৃষ্ঠা ৪০ ও ৫৯।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

ঈদ উৎসব

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

শামসুজ্জামান খান

বাংলায় ঈদোৎসবের বিশদ ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। আমাদের এই ভূখণ্ডে কবে, কখন, কীভাবে ঈদোৎসবের উদ্ভব হয়েছে তার কালক্রমিক ঘটনাপঞ্জি কোনো ইতিহাসবেত্তা বা ইসলামের ইতিহাস গবেষক এখনও রচনা করেননি। তবে নানা ইতিহাস গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক সূত্র থেকে বাংলাদেশে রোজা পালন এবং ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আজহা উদযাপনের যে খবর পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশ মুসলিম অধিকারে এলেও এদেশে নামাজ-রোজা ও ঈদোৎসবের প্রচলন হয়েছে তারও বেশকিছু আগে থেকেই। এতে অবশ্য বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, বঙ্গদেশ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে মুসলিম অধিকারে আসার বহু আগে থেকেই মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে মুসলিম সুফি, দরবেশ ও সাধকরা ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে উত্তর ভারত হয়ে পূর্ব বাংলায় আসেন। অন্যদিকে আরবীয় এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের বণিকরা চট্টগ্রাম নৌবন্দরের মাধ্যমেও বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এভাবেই একটা মুসলিম সাংস্কৃতিক তথা ধর্মীয় প্রভাব যে পূর্ব বাংলায় পড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঈদোৎসবের সূচনাও ওই প্রক্রিয়াতেই হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আব্বাসীয় খলিফাদের আমলের রৌপ্য মুদ্রা থেকে জানা যায়, অষ্টম শতকের দিকেই বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ফলে এই সুফি-দরবেশ ও তুর্ক-আরব বণিকদের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশে রোজা-নামাজ ও ঈদের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে সে যুগে তা ছিল বহিরাগত ধর্ম সাধক, ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীদের ধর্মীয় কৃত্য ও উৎসব। এদেশবাসীর ধর্ম সামাজিক পার্বণ নয়। এ দেশে রোজা পালনের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় *'তাসকিরাতুল সোলহা'* নামক গ্রন্থে। এ গ্রন্থে দেখা যায়, আরবের জনৈক শেখউল খিদা হিজরি ৩৪১ সন মোতাবেক ৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় আসেন। বঙ্গদেশে ইসলাম আগমন-পূর্বকালে শাহ সুলতান রুমি নেত্রকোনা এবং বাবা আদম শহীদ বিক্রমপুরের রামপালে আস্তানা গেড়ে (সেন আমল) ইসলাম প্রচার শুরু করেন বলে জানা যায়। শেখউল খিদা চন্দ বংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের শাসনকালে (৯০৫-৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলায় আগমন করেন বলে অনুমান করা হয়। তবে এদের প্রভাবে পূর্ব বাংলায় রোজা-নামাজ ও ঈদ প্রচলিত হয়েছিল তা বলা সমীচীন নয়। এরা ব্যক্তিগত জীবনে ওইসব ইসলাম ধর্মীয় কৃত্য ও উৎসব পালন করতেন– এ কথা বলাই সংগত। কারণ বাংলাদেশে 'নামাজ', 'রোজা' বা 'খুদা হাফেজ' শব্দের ব্যাপক প্রচলনে বোঝা যায়, আরবীয়রা নয়; ইরানিরাই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কারণ শব্দগুলো আরবীয় ভাষার নয়; ফার্সি ভাষার।

রাজধানী ঢাকা (প্রতিষ্ঠা ১৬০৮ বা ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ঈদ উদযাপনের কিছু খবর পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম আকর গ্রন্থ *বাহারাস্তানই গায়েবী* গ্রন্থের লেখক মির্জা নাথান ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার ইসলাম খাঁর সঙ্গে ঢাকায় আসেন। মির্জা নাথান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ঢাকায় ঈদোৎসবের কিছু

বিবরণ দিয়েছেন। সে বিবরণ থেকে জানা যায়: 'সপ্তদশ শতকের গোড়াতে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরবি শাবান মাসের ২২ তারিখ থেকেই রোজার আয়োজন শুরু হতো। এ সময় থেকে মসজিদ সংস্কার ও আবাসিক গৃহাদি পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলত। বাড়ির কর্তৃ পানি ঠাণ্ডা রাখার জন্য নতুন সুরি ক্রয় করতেন। ইফতারের সময় ঠাণ্ডা পানি পান করা হতো, ইফতার সামগ্রী তৈরি করার জন্য গোলাপ জল, কেওড়া ও তোকমা ব্যবহার করা হতো। মুঘল ও পাঠান আমলে ঢাকায় পঞ্চায়েতি চৌকিদারের মাধ্যমে ডেকে সেহরি খাওয়ানোর প্রচলন ছিল। পরে ঢাকার নওয়াব খাজা আহসান উল্লাহর আমলে (১৮৪৬-১৯০১) বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে কাসিদা দল বের হওয়া শুরু হয়।'

ঢাকা বিষয়ক গবেষক দেলওয়ার হাসান *নওবাহারই মুরশিদ কুলি খান* গ্রন্থের লেখক আজাদ হোসেনী বিলগ্রামীর লেখার বরাত দিয়ে লিখেছেন : 'নওয়াব সুজাউদ্দীনের অধীনস্থ মুরশিদ কুলি খান (১৭০৪-২৫) ঈদের দিন ঢাকার দুর্গ থেকে ঈদগাহের ময়দান পর্যন্ত এক ক্রোশ পথে প্রচুর পরিমাণ টাকাকড়ি ছড়িয়ে দিতেন। নওয়াবের সহযাত্রী হয়ে ওমরাহ, রাজকর্মচারী এবং মুসলমান জনসাধারণ শোভাযাত্রা করে ঈদগাহ মাঠে যেতেন ঈদের নামাজ পড়তে।'

ঢাকার ইতিহাসবিদ হাকিম হাবীবুর রহমান বলেছেন: ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার শাহ সুজার নির্দেশে তাঁর প্রধান অমাত্য মীর আবুল কাসেম একটি ঈদগাহ নির্মাণ করেন। এর দৈর্ঘ্য ছিল ২৪৫ ফুট ও প্রস্থ ১৩৭ ফুট। নির্মাণকালে ঈদগাহটি ভূমি থেকে বারো ফুট উঁচু করা হয়। ঈদগাহের পশ্চিম দিকে ১৫ ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে সেখানে মেহরাব ও মিনার নির্মাণ করা হয়। মুঘল আমলে দরবার, আদালত, বাজার ও সৈন্য ছাউনির কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল এ ঈদগাহ। প্রথমদিকে এখানে শুধু সুবেদার, নায়েবে নাজিম ও অভিজাত মুঘল কর্মকর্তা এবং তাঁদের স্বজন-বান্ধবই নামাজ পড়তে পারতেন। পরে ঈদগাহটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই ঈদগাহর পাশে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে একটি মেলারও আয়োজন করা হয়। এই ঈদগাহর পাশে একটি সুন্দর সেতুর চিহ্নও রয়েছে রেনেলের মানচিত্রে। ঈদগাহটি এখন সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। তবে এর পূর্বদিকে নতুন মসজিদ নির্মাণ করে নামাজ পড়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঢাকা শহরে ঈদ উদযাপন এবং ঈদের মিছিলের অঙ্কিত বর্ণাঢ্য চিত্র জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ঢাকার নওয়াবদের সদ্য প্রকাশিত (কাজী কাইয়ুমের ডায়েরি) ডায়েরি থেকে ঢাকা শহরে ঈদের কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো: 'আজ রবিবার, পবিত্র বকরি ঈদ। নামাজ শেষে আমিও অন্যান্যের মতো কোলাকুলি করি। নওয়াব সাহেব আমাকে আদেশ দেন অন্যান্যকে নিয়ে বিনা খরচে ক্লাসিক থিয়েটারে নাটক দেখার জন্য। খাজা সলিমুল্লাহ তখন নওয়াব। নবাবরা রাজনৈতিক সুবিধার স্বার্থে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ইহজাগতিক স্বার্থের অনুসারী– এ ঘটনা তার প্রমাণ। ঈদের নামাজ আর নাটকের সহ-অবস্থানেই তৈরি হয়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা'। (১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ. ২৮ শে ফেব্রুয়ারির ঈদের বর্ণনা)।

বাংলাদেশে ঈদোৎসবের সাম্প্রতিক বিপুল বিস্তার ও গভীরতা আমাদের আর্থসামাজিক রূপান্তরের একটি নতুন চিত্র সামনে এনেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয়, ঘুষ-দুর্নীতির বিস্তার, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, সন্ত্রাসের সঙ্গে রাজনীতির সখ্য, অশান্তি ও আবিলতার সৃষ্টি করেছে। তার ভেতর দিয়েও সমাজ এগোচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে নিরন্তর এবং এই পরিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতাও আছে। ঈদোৎসবের এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের ধারার উৎস খুঁজতে হলে আমাদের ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের গ্রামীণ এবং সদ্য গড়ে ওঠা খুবই সীমিত আকারের নগর জীবনকে অবলোকন করতে হবে। তাতে হয়ত একটা সমন্বিত লোকজীবন (synthesized) খুঁজে পাওয়া যাবে; কিছু বিরোধাত্মক উপাদান সত্ত্বেও। মৈমনসিংহ গীতিকা বিষয়ে অথরিটি চেক পণ্ডিত দুশান জবাভিতেলের বক্তব্য উদ্ধৃত করে মার্কিন ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটন (Richard Eaton) যে মন্তব্য করেছেন তার সারবত্তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। মৈমনসিংহ গীতিকার গবেষক দুশান তাঁর বিখ্যাত Folk Ballads from Mymensing and the problems of their Authenticity 1963-এ মৈমনসিংহ গীতিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন: 'আধুনিক-পূর্বকালের (Pre-modern) ময়মনসিংহের গীতিকাগুলো Neither the Products of Hindu or Muslim culture but of a single Bengali Folk culture' এই সূত্র ধরে ঐতিহাসিক ইটন সাহেব আধুনিক পূর্ব বাংলাদেশের লোকধর্মকেও শাস্ত্রীয় ধর্মের তুল্যমূল্য বিবেচনা করেছেন। সেভাবে দেখলে পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলের প্রচলিত ইসলামও ছিল লৌকিক ইসলাম, যাতে স্থানীয় আচার-সংস্কার বিশ্বাসের ছোপ লেগেছিল বেশ ভালোভাবেই। এই সমন্বয়ধর্মিতার নানা উপাদান (various syncritistic elements) বাংলার ইসলামকে বিশিষ্ট করেছিল।

ঈদোৎসব শাস্ত্রীয় ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে দ্বাদশ শতকের বাংলায় ইসলাম এলেও চার-পাঁচ শত বছর ধরে শাস্ত্রীয় ইসলামের অনুপুঙ্খ অনুসরণ যে হয়েছিল, তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেকালের বাংলায় ঈদোৎসবেও তেমন কোনো ঘটনা লক্ষ করা যায় না। এর কারণ হয়ত দুটি : এক. গ্রামবাংলার মুসলমানরা ছিল দরিদ্র এবং দুই. মুসলমানের মধ্যে স্বতন্ত্র কমিউনিটির বোধ তখনও তেমন প্রবল হয়নি। ফলে ধর্মীয় উৎসবকে একটা সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর অবস্থা তখনও সৃষ্টি হয়নি। আর এটা তো জানা কথা যে, সংহত সামাজিক ভিত্তি ছাড়া কোনো উৎসবই প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। বৃহৎ বাংলায় ঈদোৎসব তাই সপ্তদশ, অষ্টাদশ এমনকি ঊনবিংশ শতকেও তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। নবাব-বাদশারা ঈদোৎসব করতেন, তবে তা সীমিত ছিল অভিজাত ও উচ্চবিত্তের মধ্যে, সাধারণ মানুষের কাছে সামাজিক উৎসব হিসেবে ঈদের তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। তবে গোটা উনিশ শতক ধরে বাংলাদেশে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন চলে তার প্রভাব বেশ ভালোভাবেই পড়েছে নগর জীবন ও গ্রামীণ অর্থবিত্তশালী বা শিক্ষিত সমাজের ওপর। মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাও এই চেতনাকে শক্তিশালী করেছে। আর তাই এই অনুকূল পরিবেশেই ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে এক শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেন্দ্রে রেখে পরিচালিত বাংলাদেশ আন্দোলন এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার যে নব রূপায়ণ ঘটেছে, তাতে ঈদোৎসব রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নতুন গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর যে বিপুল মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছে তা বিদ্যা, বিত্ত, রুচি ও সংস্কৃতিতে তেমন পাকা না হয়ে উঠলেও তারা সামাজিক শ্রেণি হিসেবে নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করায় তাদের প্রধান উৎসব হিসেবে ঈদোৎসব জাতীয় মর্যাদা লাভ করে। এই ভূখণ্ডে ঈদের এই নতুন মর্যাদা এই প্রথম। বাংলাদেশে ঈদ এখন তাই যতটা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির অংশ, তার চেয়ে বেশি জাতিগত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নির্মাণের নব

প্রকাশ। বাংলাদেশের আধুনিক বাঙালি মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে সমন্বিত করার এক নতুন প্রকাশও আমরা লক্ষ করি ঈদোৎসবের নব বিন্যাসের মধ্যে। বাঙালি মুসলমান এভাবেই তাদের জীবনের একটা কন্ট্রাডিকশন বা দ্বন্দ্বের সমাধান প্রত্যাশা করেছিল। কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা আর জাতিগত সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের ভাষা ভিন্ন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রশাসকরা এই দুই ধারাকে এক করে দিতে চেয়েছিল। পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান তা হতে দেয়নি। তারা দুই ধারাকেই রক্ষা করে তার মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছে। ফলে ঈদ বা বাংলা নববর্ষ বা একুশে ফেব্রুয়ারি-এর কোনো উৎসবই তাদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (tension) সবকিছুই এর সঙ্গে মিশে আছে। এটা এই বাংলার, বাঙালির এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্জন। আসলে বাংলাদেশের বাঙালি তার আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বিন্যস্ত করছে এক নতুন ও বড়ো আয়োজনের মধ্য দিয়ে। এটা করতে গিয়ে জটিল ও কষ্টকর এক প্রক্রিয়াকে তারা অতিক্রম করছে কখনো সময়ের সাহসী সন্তান হিসেবে কখনো কিছু দ্বিধা ও সংকটে, কিছু বা বিভ্রান্তিতে থমকে দাঁড়িয়ে; কখনো অস্পষ্টতায় পথ হাতড়ে। তবে লক্ষ্যটা বোধ হয় ঠিকই আছে।

বাঙালি মুসলমানের কোনো জাতীয় উৎসবই ছিল না। পশ্চিম বাংলার বাঙালি মুসলমান তাদের জন্য কোনো জাতীয় উৎসব নির্মাণ করে নিতে পেরেছে কি-না তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালি বিগত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশাল ও কষ্টকর কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে গেছে। বাঙালি ঈদোৎসবকে তারা বিশাল জাতীয় উৎসবে পরিণত করেছে। তার মধ্যে এনেছে সাংস্কৃতিক মাত্রিকতা এবং তাতে যোগ করেছে নতুন নতুন ইহজাগতিক উপাদান। ঈদোৎসব তাই যতটা ধর্মীয় তার চেয়ে বোধহয় বেশি পরিমাণে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক উপাদানে পূর্ণ। ঈদ ফ্যাশন ও ডিজাইন শো, পত্র-পত্রিকার ঈদসংখ্যা, নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠানের মঞ্চায়ন, টেলিভিশনে সপ্তাহব্যাপী ঈদের বিচিত্র অনুষ্ঠানমালা ঈদ অনুষ্ঠানকে অন্য ধর্মের মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্য করে সর্বজনীন ও লোকপ্রিয় করে তুলেছে। নিছক ধর্মীয় এক উৎসবকে একই সঙ্গে জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত করা হয়েছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার প্রাগ্রসর কারণেই হিন্দু বাঙালির দুর্গোৎসব আর মুসলমান বাঙালির ঈদোৎসব একই সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক উৎসবও বটে।

বাংলাদেশের বাঙালি একুশে ফেব্রুয়ারির জাতীয় শোক দিবসকেও যথাযোগ্য মাত্রা ও তাৎপর্যে তাদের নব জাগৃতির স্মারক উৎসবে পরিণত করেছে। এর মধ্য দিয়ে তার বাঙালিত্বের চেতনা যেমন তীক্ষ্ণতা পায়, তেমনি এ উৎসবের মধ্য দিয়ে তার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইহজাগতিকতা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সাফল্য-ব্যর্থতারও যেন একটা পরিমাপ করা হয় বইমেলা ও তার জন্য প্রকাশিত অসংখ্য গ্রন্থের মাধ্যমে। বাংলাদেশের বাঙালির নিজেদের নির্মাণ করে নেওয়ার প্রয়াস সমকালীন ইতিহাসের এক আকর্ষণীয় ঘটনা। এই বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞানীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে। এই বাঙালির শত–সহস্র বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিকড় স্বদেশের মাটির গভীরে প্রোথিত হলেও আর্থিক বা সামাজিক কৌলীন্য তেমন না থাকায় এ অর্জনকে চমকপ্রদই বলতে হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী স্বৈরশাসকরা বাংলাদেশ, জাতীয়তাবাদ বা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেও তাই বাঙালির নিজস্ব বা আত্মনির্মাণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি। প্রবল প্রতাপশালী জিন্নাহর 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'র হুঙ্কার, আর ছোটো ডিকটেটরদের রাষ্ট্রধর্ম ও 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'-এর নকশা বাংলাদেশের বাঙালি গ্রহণ করেনি। এখানেই এ বাঙালি পুরাণের চাঁদ সওদাগর, সাহিত্যের হানিফ বা তোরাপ এবং বাস্তবের শেখ মুজিব। উৎসবের অন্তর্নিহিত অর্থ মানুষে মানুষে মিলন, আনন্দের আয়োজনে সমবেত হওয়া, অসূয়া ও বিদ্বেষকে ঝেড়ে ফেলে মৌল মানবিক স্বার্থে সম্প্রীতি গড়ে তোলা। এতেই উৎসবের সাফল্য ও সার্থকতা।

বাংলাদেশের বাঙালির ঈদোৎসবের নানা মাত্রিকতা ও বহুতল বিস্তারিত তাৎপর্য আছে। পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ব বা ফোকলোর পণ্ডিতরা উৎসবকে নানা প্রতীক, সংগুপ্ত অভীপ্সায় দেখতে চেয়েছেন। এ থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে নানা তত্ত্ব ও ডিসকোর্স। ঈদোৎসবকে ওই রকম তাত্ত্বিক ফ্রেমে ফেলে বহুমুখী আলোচনা করা যায়। ঈদোৎসবের সঙ্গে ধর্ম ও আচার ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও তার অন্তঃসারকে কেন্দ্রে রেখেও সেন্টার (Centre) আর পেরিফেরির (Periphery) মধ্যকার বিন্যাস বিভাজন ঘটছে ঈদোৎসবে। রাষ্ট্র ও সমাজের স্বীকৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইহজাগতিক ও নান্দনিক নানা ভাব, বিষয় ও ভাবনা যুক্ত হচ্ছে ঈদোৎসবের সঙ্গে। আগে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়াও মেলা, খেলাধুলা, নৌকাবাইচ, নৃত্য-গীত, নাটক, ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ঈদ মিছিল প্রভৃতি বহুদিন যাবৎ অনুসৃত অনুষঙ্গের সঙ্গে এখন যুক্ত হচ্ছে স্থপতি বা চিত্রকরের ডিজাইন করা শাড়ি প্রদর্শনী বা ফ্যাশন প্যারেড। আমরা ঈদকে আনতে চেয়েছি আমাদের ব্যাপক জীবনযাত্রার কেন্দ্রে; সাংস্কৃতিক রুচির নব নব আয়োজন, নান্দনিক বোধ ও বিবেচনার প্রতিফলনকে যুক্ত করেছি ঈদোৎসবের সঙ্গে। ফলে ঈদ আমাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশভঙ্গির অন্যতম মাধ্যম ও বাহনও হচ্ছে। ফলে ধর্মীয় ঈদোৎসবও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ঈদুল ফিতরের নামাজ শেষে আনন্দঘন কোলাকুলি

লেখক : গবেষক, ফোকলোরবিদ ও মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

নিবন্ধ

রোজা-জাকাত মহিমান্বিত রজনী ও ঈদ

ড. ফজলুর রহমান

হিজরি বর্ষপঞ্জির নবম মাস রমজান। ইসলামি দুনিয়ায় রমজান মাস অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাস। রোজা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেও সকল স্তম্ভই পরস্পরের পরিপূরক। রমজানের প্রধান পাঁচটি বিষয় হলো– রোজা, জাকাত, লাইলাতুল কদর ও ঈদ। রমজান মাস রোজাদারের জন্য সৃষ্টিকর্তার অপার ও বিশেষ নেয়ামত হিসেবে হাজির হয়।

রোজার ফজিলত অনেক। রমজান মাসে কোরান পাক নাজিল হয়েছে। এই পবিত্র মাসের একটি রাত লাইলাতুল কদর মহিমান্বিত রজনী। হাজার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ একটি রাত। যে রোজাদার অধিক এবাদত বন্দেগির দ্বারা এই রাতের মহিমা ও গৌরব লাভে সক্ষম হন তিনি ভাগ্যবান।

রোজার সাথে নামাজের যেমন সংযোগ রয়েছে তেমনি জাকাতেরও। মুসলমানরা রোজার মাসে অধিক মাত্রায় নফল নামাজ, তারাবি নামাজ ও বিভিন্ন সৎকর্মে নিয়োজিত থাকেন তেমনি এই সংযমের মাসে চিত্তের বিশুদ্ধতা আনয়নের পাশাপাশি সম্পদের বিশুদ্ধতার জন্য জাকাত আদায়ে তৎপর থাকেন। এছাড়া জাকাতের রয়েছে বিশাল সামাজিক মূল্য। সামাজিক অসাম্য নিরসনে জাকাতের ভূমিকা অনন্য। পবিত্র কোরান পাকে সালাত কায়েম ও জাকাত আদায়ের কথা ৮২ বার উচ্চারিত হয়েছে।

রোজা শেষে ফিতরা আদায়ের বিধান রয়েছে ইসলামে। ঈদের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত যে শিশুটি জন্ম নেয় তারও ফিতরা আদায় করা ইসলামের বিধান। স্থানীয় নির্ধারিত নিয়মে দরিদ্রদের মাঝে চাল, গম, আটা অথবা নগদ অর্থ দিয়ে ফিতরা আদায় করতে হয়।

প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে খুশির ঈদ। উৎসবমুখর পরিবেশে কেনাকাটার ধুম-যানজট-ঘরমুখী মানুষের ভিড়। কিন্তু ঈদ কি সবার জন্য আনন্দ বয়ে আনতে পারছে সেটিই হলো আসল প্রশ্ন। অনেকক্ষেত্রে আমরা রোজার তাৎপর্য ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। সংযম প্রসঙ্গে রোজার মাসের খাওয়া-দাওয়ার স্টাইলটা এসে পড়ে। ইসলাম ধর্মে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বরাবরই সংযমী হতে বলা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবিজির একটি হাদিস অনুযায়ী মানুষ তার পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ ভর্তি করবে খাবার দ্বারা, এক তৃতীয়াংশ পূরণ করবে পানীয় দ্বারা আর এক তৃতীয়াংশ খালি রাখবে সালাতের জন্যে। বস্তুত অনেকেই মনে করেন যে, এই খাদ্য অনুশাসন মেনে চললে রোগবালাই থেকে অনেকাংশেই দূরে থাকা সম্ভব। কিন্তু রমজান মাসে অনেকেই আমরা এর বিপরীত করে ফেলি। সারাদিন যে সব জিনিস খেতে পারি না, রাতে খেতে বাধা নেই বলে সেইসব (এবং তার চাইতেও বেশি বেশি) খাবার খেতে শুরু করি। ইফতারির টেবিলে খাদ্যের কী অপূর্ব বর্ণালি সমাহার! অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, রমজান মাসে তাদের বাজেট ফেল করে। এখানে সংযমটা তাহলে কোথায় থাকল? অন্যান্য মাসে যা আমরা খাই, রমজান মাসে তার চাইতে কম ছাড়া বেশি খেতেও বলা হয়নি অথচ গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের রোজনামচার অন্যান্য দিন যেভাবে খেয়ে থাকে, রোজার সময় একই ধরনের খাবার খায়। অনেকের ভাগ্যে খাবারই ঠিকমতো জোটে না। বিত্তবান লোকেরা যদি এদের কথা চিন্তা করতেন তাহলে তাদের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন দেখা যেত। আবারও ঘুরে ফিরে সেই ট্রান্সফার ভ্যালুর কথা এসে পড়ে। ঈদের দিনের আগে একমাস সিয়াম পালন মানুষের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে দারুণভাবে সহায়তা করার কথা। এই নৈতিক শক্তির জোরে মানুষ শুধু লোভনীয় খাবারদাবারই নয়, সব রকম লোভলালসা থেকে দূরে থাকতে পারে। কিন্তু ঈদের মৌসুমে সকল বিবেকবান মানুষেরই কষ্ট হয় যখন দেখা যায় যে, রোজাদার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই জুলাই ২০১৬ বঙ্গভবনে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন -পিআইডি

ব্যবসায়ীরাও নৈতিকতার ধার ধারছেন না। তারা সচরাচর জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেন। আর সাধারণ মানুষকে এই মূল্যবৃদ্ধির দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এই দেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তাদের অনেকেই রোজা রাখে–কী তাদের ইফতার আর কী তাদের সেহরি, সে কথা কতজন ভালো করে জানে। এরপর আছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারগুলো। রোজার মধ্যে এদের মধ্যেও সংসার খরচে টানাপড়েন শুরু হয় মূল্যবৃদ্ধির কারণে। কেউ লোকসান করবার জন্য ব্যবসা করে না। ব্যবসায় লাভ করার কথা। লাভ হয়ও। ব্যবসা একটি ভালো পেশা, কুরআনেও এর উল্লেখ আছে। কিন্তু লাভের মাত্রাটা কত হবে? মানুষের সহ্যশক্তির বাইরে? কম মার্জিনে বেশি জিনিস বিক্রি করাটা ছিল এক সময় পেশাদার ব্যবসায়ীদের মনোবৃত্তি। এখন সে দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। ডিমান্ড আছে, তাই দাম যত পারো আদায় কর–এই দর্শন আমাদের দেশে যতটা জেঁকে বসেছে, আর কোথাও ততটা দেখা যায় না। অবশ্য ব্যবসায়ীদেরও মন আছে। তাদের কাছে এই নৈতিক আবেদনটি রাখতে হবে যে, রোজার মাসে স্বল্প মূল্যে জিনিস বিক্রির জন্য যদি তাদের সামান্য কিছু ক্ষতি হয় সেটাকে তারা 'আল্লাহর পথে দান' হিসেবে দেখতে পারেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জুন ২০১৭ গণভবনের ব্যাংকোয়েট হলে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, এতিম, প্রতিবন্ধী শিশু ও বিশিষ্ট আলেমদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন –পিআইডি

যে শুধু তাদেরই থাকতে হবে তা নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

এবারে ঈদের প্রসঙ্গে আসি। মিলনের উৎসব ঈদ। ঈদের দিন নামাজের পর সবাই পরিচিত সবাইকে আলিঙ্গন করছে, হাসিমুখে অভিবাদন করছে, 'ঈদ মোবারক' জানাচ্ছে–এ এক আনন্দময় দৃশ্য। কারো সাথে কারো বিরোধ থাকলে, রাগ অভিমান হলে, এদিন সবাই সবকিছু ভুলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। যারা মুসলমান নয়, তাদেরকেও ডেকে এনে খাওয়ানো হয়, কুশল বিনিময় হয়। এতে মানুষের মধ্যে একটা সৌহার্দের সেতুবন্ধ রচিত হয়। এখানেই ঈদের সামাজিক যথার্থতা, এখানেই ঈদের আনন্দ। আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঈদ-বকরি ঈদে পালাক্রমে নিজের বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়িতে ঈদের উৎসব পালন করা হতো। এখন আর তেমনটি হচ্ছে না–আর্থিক সমস্যা, যানজট সমস্যা ইত্যাদির কারণে।

কিন্তু এর একটা বাড়তি লাভ ভুলে গেলে চলবে না। দেশের বাড়িতে ঈদ করলে শুধু কি পারিবারিক বন্ধন শক্ত হয় তা নয় দেশের যে তরুণ ছেলেমেয়েরা আছে তারা নানাভাবে উৎসাহিত হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, মজে যাওয়া পুকুর-ডোবার উন্নয়নে মতবিনিময় হয়, ছেলেমেয়েরা পথের হদিস পায়, সাহায্য পায়। আমাদের কাছ থেকে তাদের এতটুকু পাওনাও কি খুব বেশি। আমাদের ঈদ প্রসঙ্গে এতসব বলার উদ্দেশ্য শুধু গ্রামে ঈদের আনন্দকে ফিরিয়ে আনা। গ্রামে যদি আমরা নাও যেতে পারি, তবুও দূর থেকেও এই আনন্দ সঞ্চারের কাজটি ঠিকই করা যায়।

আমাদের অনেকেই ঈদের সময় জাকাত দিয়ে থাকেন। জাকাত সবার উপর বর্তায় না। আয়ের ওপর এটা নির্ভর করে। সাদামাটা ভাষায় বলা চলে, দিনযাপন আর প্রাণ ধারণের খরচ বাদ দিয়ে যে বাড়তি অর্থ সঞ্চিত থাকে, তার শতকরা আড়াই ভাগ অন্যকে দিয়ে দিতে হবে। এই অন্যেরা কারা? কারা জাকাতের দাবিদার সে ব্যাপারে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধান রয়েছে–সে সবের গভীরে না গিয়েও মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, জাকাতে গরিব মানুষদের হকই বেশি। জাকাত ইসলামের একটি মূল্যবান অর্থনৈতিক বিধান এবং সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণে এর ভূমিকা অপরিসীম। কোনো কোনো হিসাবে দেখা গেছে যে, ঠিক মতো জাকাত আদায় করলে বছরে এদেশে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি জাকাত হতো। যে-কোনো অর্থনীতিবিদই স্বীকার করবেন যে, প্রতিবছর এই পরিমাণ অর্থ ঠিকভাবে খরচ করলে 'দারিদ্র্য বিমোচন' কর্মসূচি দারুণভাবে চাঙা হয়ে উঠত। এজন্য একটি বিশ্বাসের প্রয়োজন। বিশ্বাসটি হচ্ছে: দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব। এ বিশ্বাস সামনে রেখে জাকাতটা ঠিকমতো দিতে হবে। সরকারিভাবে জাকাত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ব্যাংকে দেওয়া আছে অ্যাকাউন্ট নম্বরও। কিন্তু জাকাতের অর্থ আসছে না কেন? কারণ, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে না। জাকাত পেলে সেই টাকা দিয়ে কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এ ব্যাপারে অনেকের মনেই প্রত্যয় জন্মানো সম্ভব হয়নি। যারা মিথ্যা কথা বলেন না, হালাল রোজগার করেন এবং আমানতের খেয়ানত করেন না, অর্থাৎ যাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে আল্লাহভীতি আছে এমন লোকদের নিয়ে একটি ট্রাস্টি গঠন করে জাকাত ফান্ড কর্মসূচি দেওয়া যায় এবং তা যদি গরিব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যবহার হয়, তবে সারাদেশের লোকেরা সেই ফান্ডেই জাকাতের টাকা দিতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। বিশ্বাসযোগ্যতা ও কর্মসূচিই হচ্ছে অনেকের কাছে এক্ষেত্রে আসল বিষয়।

জাকাত যার ওপর বর্তায়, তাকে দিতেই হবে, অবশ্য তিনি যদি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেন এবং কুরআনের বিধানগুলো পুরোপুরি মানেন। এখন যারা জাকাত দেন, তাদের সবাই ঠিক হিসেব করে দেন না। দেওয়ার ধরনটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। ৫শ' পিস শাড়ি বিতরণ করা হলো, কয়েকজনকে কিছু টাকা দেওয়া হলো, এগুলো কি জাকাত নয়? নিশ্চয়ই এগুলো জাকাত (যদি ঠিকমতো হিসাব হয়ে থাকে)। তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। একটি গরিব মানুষ কয়েকটি টাকা হাতে পেলে দু'একদিন খায়-দায়, কিন্তু সে গরিবই থেকে যায়। মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারলেই জাকাত সবচাইতে অর্থবহ হয় এবং শুরুটা ঘর থেকেই করা ভালো। প্রায় সবারই গরিব আত্মীয়স্বজন আছে যারা আর্থিক অসচ্ছলতায় ভুগছে। এদের কেউ নিজের অবস্থার কথা বলে, কেউ লজ্জায় বলতে পারে না। আমরা যদি প্রথমে সকলে এদের দিকে নজর দিই এবং জাকাতের টাকা দিয়ে এদের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি। সেটাই হতে পারে একটা উত্তম ব্যবস্থা। একজন গরিব আত্মীয়কে একটি দু'টি করে সেলাইয়ের কল কিনে দিলে তা থেকে তার রোজগার হয়। অভাব কিছুটা কমে। গরিব আত্মীয়কে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে টেনে তোলা একটা নৈতিক দায়িত্ব। প্রত্যেক ঈদে জাকাতের মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করেও গ্রামের মানুষটির মুখে কিছুটা হাসি ফোটানো সম্ভব। অবশ্য গরিব লোকদের আরো গরিব আত্মীয় আছে। এক্ষেত্রে তারা কিছুই করতে পারে না, নৈতিক সমর্থন দান ছাড়া। কিন্তু এদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। এদের ছেলেমেয়েরা ঈদের দিনে একটা নতুন কাপড় যেন পরতে পারে তার ব্যবস্থা করা খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু টাকাটা খরচের আগে উদ্দেশ্যটা ঠিক করে নিলেই ভালো।

রমজানের সফল পরিসমাপ্তির পর সারা মুসলিম জাহানে আসে খুশির ঈদ। ঈদের আনন্দে, খুশিতে সকলের জীবন কানায় কানায় ভরে উঠুক। ঈদ সকলকে ইসলামের আলো ও স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত করুক। সকলকে পবিত্র ঈদের আগাম শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধ

৫ই জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস

পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের করণীয়

শামসুজ্জামান শামস

পরিবেশের একটি ব্যাপক পরিধি রয়েছে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই পরিবেশ। আমাদের চারপাশে আছে– গৃহ-পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সামাজিক পরিবেশ, আকাশ-পাতাল, ঘটন-অঘটন, বায়ু-পানি-মাটি, জল-স্থল, পাখপাখালি, বনজঙ্গল, মানুষ, পশু, গাছপালা, দিগ্বিদিক, আলো-আঁধার, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, দেশ-বিদেশ,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা জুন বাণিজ্য মেলার মাঠে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭-এর উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

জাতীয়-আন্তর্জাতিক, কলকারখানা, যানবাহন, রাস্তাঘাট, কৃষি, শিল্প, আহার-ভোজন, লেখাপড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অনুসন্ধান-গবেষণা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই পরিবেশের উপাদান। কোনোকিছুই পরিবেশের বাইরে নেই। পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস'। উদ্দেশ্য, পরিবেশের ক্ষতির মাত্রাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ক্ষতির সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। জীবনধারণের জন্য দরকার খাদ্য আর খাদ্য উৎপাদনের জন্য দরকার উর্বর মাটি। অবস্থা অনুধাবনে শ্রীপুরের বর্জ্য মেশানো কিছু মাটি পরীক্ষা করে পাওয়া গিয়েছে ভয়াবহ চিত্র। কপার, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম এবং লেডের মতো পদার্থ রয়েছে সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। ঢাকার মানুষেরা বুক ভরে বিশুদ্ধ বাতাস নেওয়ার পরিবর্তে উলটো শিকার হচ্ছেন বায়ুদূষণজনিত রোগের । ২৫% মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন কিডনি রোগ, শ্বাসকষ্টসহ মারাত্মক সব রোগে । প্রশাসনও কিন্তু বসে নেই। সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। আমাদের সুস্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে আমাদেরই ওপর। আমরা নিজেরা কোথায় আবর্জনা ফেলছি কিংবা নিজের বাসার সামনে কতটা পরিষ্কার রাখছি সেটাও ভাববার সময় এসেছে।

বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন আর প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশনের ফলে দিন দিন পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং জলবায়ু। যার ফলাফল স্বরূপ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ তলিয়ে যেতে পারে ভারতের পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছুটা জায়গা, সাথে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ আর শ্রীলঙ্কাসহ পৃথিবীর নিম্নভূমির দেশসমূহ। যার যতটুকু সাধ্য ততটুকু দিয়েই চেষ্টা করা দরকার পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য রাখার ।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আওতায় ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ই জুন পর্যন্ত জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ওই কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবীজুড়ে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাহলো কীভাবে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে পৃথিবী নামক গ্রহকে রক্ষা করা যায়। এই তৎপরতার ফলে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্য সব দেশের মতোই বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়। কারণ, পরিবেশ মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সভ্যতার ক্রমবিকাশ থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে তার পরিবেশ। মানুষের রচিত পরিবেশ তারই সভ্যতার বিবর্তনের ফসল।

বিশ্ব পরিবেশের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে এ অবনতি হয়েছে আরো দ্রুত। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পাস হয়েছে। কিন্তু জনবিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের ঘাটতি ও বৃক্ষ নিধন এবং শিল্প ও পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের দরুণ পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে যাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণে নতুন অনুষঙ্গ হিসেবে যোগ হয়েছে ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক পণ্যের বর্জ্য। যাকে এক কথায় বলা হচ্ছে ই-বর্জ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হোক অথবা যুগের বাস্তবতার কারণেই হোক, শহর-গ্রাম সর্বত্রই প্রতিনিয়ত ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক পণ্যের প্রতি মানুষের নির্ভরতা বাড়ছে। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ই-ওয়েস্টের পরিমাণও। কিন্তু আজও দেশে গড়ে ওঠেনি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এসব বর্জ্যের সঠিক কালেকশন সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ফলে পরিবেশ দূষণের চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে বাড়ছে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকিও। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা গবেষণা তথ্যের বরাত দিয়ে এমনটি জানাচ্ছেন পরিবেশবিদ এবং পরিবেশ সংশ্লিষ্টরা। অন্যদিকে বিগত দুই দশকে নদীমাতৃক এই দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নদী আজ মৃতপ্রায়। বিলীন

হয়ে গেছে অনেক নদী। যে কয়েকটি নদীর অস্তিত্ব আছে তা ভূমিদস্যুদের দখলবাজিতে ক্রমশ খালে রূপান্তরিত হচ্ছে। কলকারখানার বর্জ্য পতিত হয়ে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। ঢাকার আশপাশের নদীগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় পরিবেশ বিপর্যয় কীভাবে বেড়ে চলেছে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, বংশাইসহ আরো অনেক ছোটো-বড়ো নদী আজ মৃতপ্রায়। ছোটো-বড়ো লেক ও ঝিলগুলোও দখল করে নিয়েছে ভূমিদস্যুরা। ভূমিদস্যু ও দখলদারের প্রতাপ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে নদী দখলমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। নদী নাব্যতা হারাচ্ছে যত্রতত্র। বাঁধ নির্মাণ করে প্রপার্টি ও ভূমি ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো বালু ভরাট করে জমিয়ে তুলেছে ভূমি ব্যবসা।

অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করে চলেছি। নদী দখল ও অপরিকল্পিত নদী শাসনের ফলে দেশের নদীগুলোও মরে যাচ্ছে। বনাঞ্চল উজাড় করে যেখানে-সেখানে জনবসতি ও শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার ফলে আমাদের দেশে ঋতুও তার বৈচিত্র্য হারিয়েছে। গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী ২৫ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবে, যার মধ্যে ২ কোটি হবে বাংলাদেশে এবং যা একটি দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদির বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের চেয়ে বাংলাদেশ বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। পৃথিবীর পরিবেশ দিন দিন দূষিত হয়ে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। আর এরজন্য মূলত মানুষই দায়ী। ১৮০০ সালের আগে থেকে ইউরোপের পুঁজিপতিরা কলকারখানা গড়ে তুলতে থাকে। এরপর বিশ্বজুড়ে কলকারখানা বিস্তার লাভ করে। দ্রুত শিল্পায়ন করতে গিয়ে বনাঞ্চল ধ্বংস ও অপরিকল্পিত নগরায়নের হিড়িক পড়ে। কলকারখানায় ব্যবহৃত তেল, গ্যাস, কাঠ, কয়লা, কৃষিকাজে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার ও জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত হচ্ছে। এতে মাটি, পানি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, মাত্রাতিরিক্ত দূষণ প্রকৃতির নির্দিষ্ট সহ্য ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডে প্রকৃতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। আর আমাদের সবুজ ধরিত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্যাস নির্গমনের কারণে দ্রুত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া আরো যেসব গ্যাস বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার জন্য দায়ী সেগুলো হলো– হাইড্রো কার্বন, কার্বন মনোঅক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, মিথেন, সিএফসির হ্যালন, ক্লোরোফর্ম, মিথাইন ইত্যাদি।

বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ যাবতীয় গ্যাস শুষে নিয়ে বাতাসকে দূষণ মুক্ত রাখে বৃক্ষ। কিন্তু মানুষ নির্বিচারে পৃথিবী থেকে বৃক্ষ নিধন করে ফেলছে। পৃথিবী থেকে বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবছর মানুষের হাতে পৃথিবী থেকে ৪১ লাখ হেক্টর বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। বৃক্ষ কমে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক মাত্রা পরিবর্তন হয়ে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ যাবতীয় বিষাক্ত গ্যাস ও মনুষ্য সৃষ্ট সিএফসি গ্যাস অব্যাহতভাবে বেড়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতা পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে ফেলছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাবে মেরু অঞ্চলসহ হিমবাহ দ্রুত গলে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব আজ হুমকির মুখে। ক্রমে বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে এ ধরিত্রী। বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। আয়তনে ছোটো হলেও প্রাকৃতিকভাবে জীববৈচিত্র্যে খুবই সমৃদ্ধ। আর এ জনসংখ্যার চাপের মাঝে থেকে প্রকৃতিতে জীব ও তার সৌন্দর্য এখন হুমকির সম্মুখীন।

পৃথিবী পৃষ্ঠের উষ্ণতা যে হারে বাড়ছে, তা প্রতিরোধ করা না গেলে আগামী শতাব্দীতে বিশ্বের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে সারাবিশ্বে তীব্র মাত্রায় সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হবে, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ আনুষঙ্গিক অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে। বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রার মান কমে যাবে এবং তারা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হবে। এমনকি সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা পরবর্তী নানা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যও বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তীব্র মাত্রার শীত ও গরম বেড়ে যাবে। ফলে সাধারণ রোগে আক্রান্ত রোগীর অবস্থার অবনতি হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে। উন্নত দেশগুলো এ অবস্থা মোকাবিলায় সক্ষম হলেও উন্নয়নশীল দেশের মানুষের পক্ষে এ অবস্থা মোকাবিলা করা কঠিন হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ২৯,৮৪৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা তলিয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। যার ফলে ১৮.৮ মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হবে। বর্তমানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৪-৮ মিলিমিটার বাড়ছে। বাংলাদেশে পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে কৃষি খাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ জীবিকার সন্ধানে নিজের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে শহরমুখী হচ্ছে। শহরমুখী এ ধরনের জনস্রোত প্রতিদিনই বাড়ছে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো শহরে পরিবেশগত সমস্যা এ কারণে প্রকট আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশের ১ কোটি মানুষ তাদের জীবিকার অবলম্বন ও বাস্তুভিটা হারাবে। ভবিষ্যতে পরিবেশগত কারণে স্থানচ্যুতির ঘটনা আরো বাড়বে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বনায়নের বিকল্প নেই। আধুনিক সুরম্য অট্টালিকা আর ইট-কাঠের নগরজীবন সত্ত্বেও বনাঞ্চল ছাড়া মানুষের বাঁচার উপায় নেই। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্য থাকা অপরিহার্য। পৃথিবীতে লাখ লাখ প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস হলেও গাছ কাটার কারণে গহীন অরণ্যের জীববৈচিত্র্য লোপ পাচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করার জন্য মানুষই যে একমাত্র দায়ী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে সামাজিক বনায়ন ব্যাপকভাবে বাড়ানো সময়ের অপরিহার্য দাবি। প্রাণের অস্তিত্বের জন্যই সবুজ বৃক্ষরাজি ও বনায়নের প্রয়োজন অপরিসীম।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বৃক্ষবন্ধু

নুরুল ইসলাম বাবুল

বিজ্ঞান ক্লাসটা আজ জমে উঠেছিল। প্রতিদিনের মতোই সাইদুল স্যার পড়াচ্ছিলেন। ক্লাস শুরু হওয়ার একটু পরেই আরো একজন যোগ দিলেন। তিনি আমাদের স্বাস্থ্য ম্যাডাম। আমাদের সপ্তম শ্রেণিতে তার কোনো ক্লাস নেই। মাঝেমধ্যে আসেন। ক্লাসে ঢুকেই গল্প জুড়ে দেন। ঠিক গল্প বলেন না। গল্পের ছলে আমাদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেন। গল্পে গল্পে স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে কথা বলেন। তাই আমরা তার নাম দিয়েছি স্বাস্থ্য ম্যাডাম। আসলে স্বাস্থ্য ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকলেই আমরা চাঙা হয়ে উঠি। কোনো কঠিন বিষয়কেও তিনি গল্পের ঢঙে তুলে ধরেন। ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা নীরবে সেই গল্প শোনে।

আজ তড়িঘড়ি করে ক্লাসে ঢুকলেন স্বাস্থ্য ম্যাডাম। সাইদুল স্যার তখন ব্ল্যাকবোর্ডে হাত দিয়েছিলেন। ম্যাডাম স্যারকে কিছু না বলে দুচোখ গোল করে তাকালেন। চোখ ঘুরালেন সমস্ত ক্লাসের দিকে। যেন কাউকে খুঁজছেন তিনি। মুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হাসি ছড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'নওশিন, তুই দাঁড়া।' আমি নির্ভয়ে দাঁড়ালাম। স্বাস্থ্য ম্যাডাম হাসির সেই রেশ টেনেই বললেন,'সাইদুল স্যার তোদের কী পড়াচ্ছেন?' আমি জবাব দিলাম, 'জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে পড়ানো শুরু করেছেন।' ম্যাডাম দুচোখ গোল করে আরো একবার সমস্ত ক্লাস দেখে নিলেন। তারপর সাইদুল স্যারের দিকে লক্ষ করে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্যার একটু বসুন, আমি দেখছি।' ম্যাডাম একটু পেছনে সরে গেলেন। তারপর এগিয়ে এলেন। শুরু করলেন গল্প–

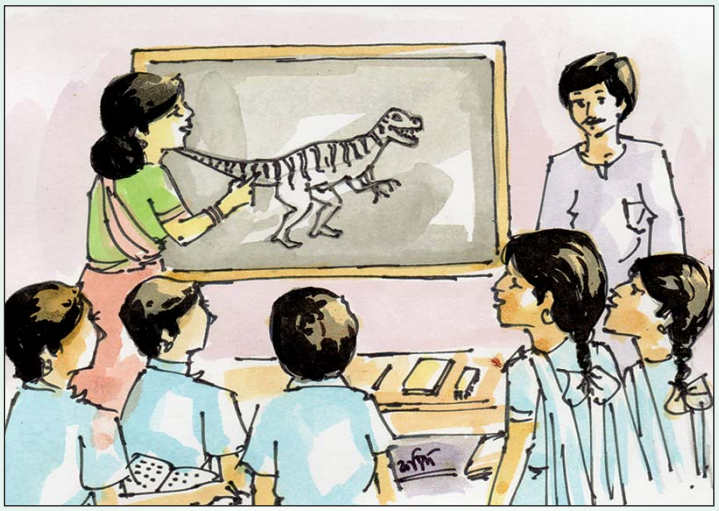

'বহু বছর আগের কথা। তখনও পৃথিবী ছিল। সূর্য ছিল। চাঁদ ছিল। এই পৃথিবীতে বাস করত বিশাল বিশাল প্রাণী। সারা পৃথিবী চষে বেড়াত তারা। সেই প্রাণীর নাম ডাইনোসর। পৃথিবীতে খুব মজা করে বসবাস করত। কত বড়ো পৃথিবী। কত্তো খাবার। সব ছিল তাদের দখলে। কোনো অশান্তি ছিল না। কোনো অভাবও ছিল না। হাসি আর আনন্দে ভরা ছিল ডাইনোসরদের জীবন। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর কাটতে লাগল। হঠাৎ কী যেন হতে লাগল এই পৃথিবীর!' এটুকু বলে একটু থামলেন ম্যাডাম। এই ফাঁকে পেছন বেঞ্চের রকি জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডাম কী হতে লাগল ?' স্বাস্থ্য ম্যাডাম হাতের ইশারায় রকিকে বসতে বলে জবাব দিলেন, সব বলব।' রকি বসে পড়ল। যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে ম্যাডাম বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে লাগল। এই পরিবর্তন ছিল অস্বাভাবিক। পুরো পৃথিবী গরম হতে শুরু করল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রায় বিশ লক্ষ বছর ধরে এইভাবে গরম হতে থাকে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে পৃথিবীর জলবায়ুরও পরিবর্তন ঘটে। আর তাতে ভীষণভাবে বদলে যায় এই সুন্দর পৃথিবী। বদলে যায় প্রকৃতি ও পরিবেশ। অতি তাপমাত্রায় মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায়। ডুবে যেতে থাকে পৃথিবীর স্থলভাগ। কমে যায় বনভূমি। সেই সাথে ভয়ানক ব্যাপার ঘটতে থাকে। কমতে থাকে খাদ্য উৎপাদন। চারদিকে অভাব। খাবার নাই। না খেতে খেতে হাড্ডিসার হয়ে যায় ডাইনোসররা। শক্তিশালী প্রাণী দুর্বল হয়ে পড়ে। না খেয়ে থাকতে থাকতে মরতে শুরু করে প্রাণীগুলো। একে একে মরে যায় সব ডাইনোসর। আজ সারা পৃথিবী খুঁজে একটা ডাইনোসরও পাওয়া যাবে না। হঠাৎ হঠাৎ মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় তাদের হাড়। পাওয়া যায় কঙ্কাল'।

থামলেন ম্যাডাম। আমরাও চুপ করে বসে থাকলাম। ডাইনোসরদের করুণ পরিণতির কথা শুনে সত্যি ব্যথিত হলাম। পর মুহূর্তেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, যখন স্বাস্থ্য ম্যাডাম বলে উঠলেন, 'আমাদেরও এমন অবস্থা হতে চলেছে।' ম্যাডামের এই কথায় পুরো ক্লাস যেন 'থ' হয়ে গেল। আমরা ঝিম মেরে বসে রইলাম। আমাদের বান্ধবী রিতু জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডাম কেন এমনটা হয়'? ম্যাডাম বলতে শুরু করলেন, 'সেই কথাই বলছি এখন। ডাইনোসররা জানত না কী কারণে আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটছে। তারা জানত না কীভাবে এটা রোধ করা যায়। আমরা মানুষ। আমরা জানি এবং বুঝি'। মাঝখান থেকে শাকিল বলে উঠল, 'ম্যাডাম বলেন তাহলে।' ম্যাডাম বলতে লাগলেন,'কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন প্রভৃতি গ্যাসকেই 'গ্রিন হাউস গ্যাস' বলে। এই গ্যাস পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী হয় জানো'? আমরা ক্লাসের ছেলেমেয়েরা একবাক্যে বলে উঠলাম, 'কী কী হয় ম্যাডাম'? এবার ম্যাডাম দ্রুতগতিতে বললেন,'ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-বন্যা-নদীভাঙন-খরা-অতিবৃষ্টি-শৈত্যপ্রবাহ-টর্নেডো সব হয়। স্বাস্থ্য ম্যাডাম একদমে কথাগুলো বলে থামলেন। তারপর একটু দম নিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন,'আমাদের সামনে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কেননা আগের তুলনায় বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের সঞ্চার বেড়ে গেছে। আর মানুষই এর জন্য বেশি দায়ী।' ম্যাডামের এ কথায় আমরা সজাগ হয়ে উঠলাম। আমি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম,'ম্যাডাম মানুষ কেন বেশি দায়ী'? স্বাস্থ্য ম্যাডাম দুচোখ গোল করে আমার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়েই থাকলেন। আমার কেমন যেন বিব্রত বোধ হতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম আমি কি ভুল কিছু বলেছি। না, ভুল কিছু বলিনি। বুঝতে পারলাম ম্যাডামের জবাব শুনেই। ম্যাডাম জবাব দিলেন,'এই যে গ্রিন হাউস গ্যাস, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। যানবাহন-কারখানা-ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এসব তো মানুষই করছে, তাই না'? আমরা সমস্বরে জবাব দিলাম, 'জি ম্যাডাম'। ম্যাডাম বলতে শুরু করলেন, 'পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ এই কার্বন ডাই-অক্সাইড। এটাই হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। অতিকায় প্রাণী ডাইনোসর এত কিছু বুঝতে পারত না। আমরা মানুষ। আমরা বুঝি। আর তাই আমরাই পারব এটা রোধ করতে'। আমরা আবারো একসাথে বলে উঠলাম, 'ম্যাডাম কীভাবে?' ম্যাডাম কিছু সময় নিয়ে সবার দিকে তাকালেন। হয়ত আমাদের আগ্রহ আর উদ্দীপনা দেখে নিলেন। হাসিমাখা মুখে বললেন,'জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ যেমন একাধিক, তেমনি রোধ করার উপায়ও অনেক। তোমরা শিশু-কিশোর। একটা কাজ তোমাদের করতে হবে'। আমরা হইহই করে বললাম,'কী কাজ ম্যাডাম' ? ম্যাডাম হেসে হেসেই বললেন, 'প্রত্যেকে যার যার বাড়িতে খোলা জায়গায় গাছ লাগাবে। গাছ খাদ্য তৈরির সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। তাই পৃথিবীতে যত বেশি গাছ হবে কার্বন ডাই-অক্সাইড তত কমে যাবে। বুঝতেই পারছ আমাদের এই দুঃসময়ে বৃক্ষগুলো মানুষের পরম বন্ধু। বৃক্ষকে ভালোবেসে রোধ করা যায় জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন'। ম্যাডাম থামলেন। এবার সাইদুল স্যার উঠে দাঁড়ালেন। খুব কঠিন শপথ করার মতো করে বললেন,'আমাদের পৃথিবীকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। প্রকৃতি ও পরিবেশ ঠিক থাকলে তবেই টিকে থাকবে মানুষ। তা না হলে পরিণতি হবে বহুকাল আগের ডাইনোসরের মতো'। ■

২৩শে জুন : আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস

বাংলাদেশের জনপ্রশাসন

মুহা. শিপলু জামান

প্রশাসন হচ্ছে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ও ব্যয়ে একটি সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট অর্জনে সহায়তা করে। আর জনগণকে নানাবিধ নাগরিক সেবা প্রদান ও নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য সরকারের যে অঙ্গ সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে তাই হলো জনপ্রশাসন। সাধারণ জনগণকে কেন্দ্র করে, জনগণের উদ্দেশে ও পক্ষে সরকারকে বিভিন্ন নীতিমালা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরাসরি সহযোগিতা করে জনপ্রশাসন। একইভাবে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনও সাধারণ মানুষের কল্যাণে সদা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়ের মাতৃ-প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের Statistics of Civil Officers and Staff 2015 অনুযায়ী, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মোট ১৩,৮২,৩৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন যাদের মধ্যে ১,৪৮,৮১৯ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদায়ন, বদলিসহ নানাবিধ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এছাড়া বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) কে সহযোগিতা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। বর্তমান জনপ্রশাসন অত্যন্ত গতিশীল, সক্রিয় ও দক্ষ। জনসেবায় উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচারের যথাযথ প্রয়োগ করাই বর্তমান জনপ্রশাসনের মূল লক্ষ্য। জনপ্রশাসনের রূপকল্প (Vision) হচ্ছে 'দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন' এবং অভিলক্ষ্য (Mission) হলো 'প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী, কল্যাণধর্মী ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা'।

তবে আজকের জনপ্রশাসন পূর্বে এমন ছিল না। যদিও বাংলাদেশের জনপ্রশাসন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কর্মধারা উত্তরাধিকারসূত্রে ব্রিটিশদের থেকে প্রাপ্ত। তবে কালের বিবর্তনে ও সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন গ্রহণ করে আজকের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। কিছুদিন পূর্বেও এই মন্ত্রণালয়ের নাম ছিল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। কার্যসম্পৃক্ত নামকরণের যথার্থতার জন্য ২০১১ সালের ২৮শে এপ্রিল সংস্থাপন– এর বদলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নাম করা হয় । ১৯৬২ সালের আগে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের Home Department অধীন Administrative Branch সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ বিষয়ক কাজ করত। পরবর্তীতে Provincial Reorganization Committee- এর সুপারিশক্রমে ১৯৬২ সালে এটি Service and General Administration (S. & G. A) নামে একটি Department- এর মর্যাদা লাভ করে।

অবিভক্ত পাকিস্তান আমলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় পাঁচটি অনুবিভাগ বা শাখা নিয়ে গঠিত ছিল। Service and General Administration Department, Government of East Pakistan এর Year Book 1968-69 এ দেখা যায়, তৎকালীন গভর্নরের অধীন একজন প্রধান সচিব নিয়োজিত ছিলেন। একজন অতিরিক্ত প্রধান সচিব এবং একজন অর্থ উপদেষ্টা প্রধান সচিবের অধীনস্থ ছিলেন। আবার অতিরিক্ত প্রধান সচিবের তত্ত্বাবধানে থেকে একজন সচিব ও ৬ জন উপসচিব ৫টি অনুবিভাগ/শাখার দায়িত্ব পালন করতেন। অনুবিভাগগুলো হলো: ১. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২. সাধারণ প্রশাসন ৩. বিধি ৪. সাধারণ সেবা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ৫. কল্যাণ। নামের সাথে সাথে অনুবিভাগগুলোর কাজেও ভিন্নতা ছিল।

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা শাখায় মূলত ২ জন উপসচিব নিয়োজিত ছিলেন। ১ জন সিনিয়র কর্মকর্তা, ৫ জন অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার, ৪ জন বিশেষ কর্মকর্তার সহযোগিতায় একজন উপসচিব কার্যবিধিমালা, সচিবালয় নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ, পাঠাগার, কেস-স্টাডি, অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি বিষয়াদি দেখতেন। অন্যজন বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ এবং গবেষণামূলক কাজ দেখতেন এবং তাকে সহযোগিতা করতেন একজন সিনিয়র

২৩শে জুলাই ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জনপ্রশাসন পদক-২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

কর্মকর্তা ও ২ জন গবেষণা কর্মকর্তা। অন্যদিকে সাধারণ প্রশাসন শাখার একজন উপসচিব ১০ জন সিনিয়র কর্মকর্তার কাজের তদারকি করতেন। পাশাপাশি সাইফার ব্যুরো ও মন্ত্রীর দপ্তরের কাজ দেখতেন। এই শাখায় প্রধানত কর্মকর্তাদের পদায়ন, বদলি, দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করা হতো। বিধি শাখায় ৭ জন সিনিয়র কর্মকর্তা একজন উপসচিবের অধীন কর্মরত থাকতেন; তারা কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও চাকরি বিধিমালা, ছুটি বিধিমালা, বেতন নির্ধারণ, আচরণ ও শৃঙ্খলা বিধিমালা, পেনশন ও আনুতোষিক, প্রভিডেন্ট ফান্ড, কর্মকমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করতেন। নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাধারণ সেবা শাখা নানাবিধ সেবা প্রদান করত যেমন: টেলিফোন, স্টেশনারি, সংবাদপত্র ইত্যাদি সরবরাহ, কোষাগার রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচয়পত্র ইস্যু করা, স্টেনোগ্রাফারদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়া তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো ও পূর্ব পাকিস্তান সাধারণ প্রেসের প্রশাসনিক কাজকর্ম এই শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, সমন্বয় ও সকল উন্নয়ন প্রকল্পের কাজও সাধারণ সেবা শাখা সম্পন্ন করত। শাখায় একজন উপসচিব ৬ জন সিনিয়র কর্মকর্তা নিয়ে কাজ করতেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষোভ নিরসন ও বিভিন্ন সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং তাদের কল্যাণ সাধনই ছিল কল্যাণ শাখার মূল কাজ। শাখাটি একজন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র কর্মকর্তা ও ১ জন কল্যাণ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত হতো।

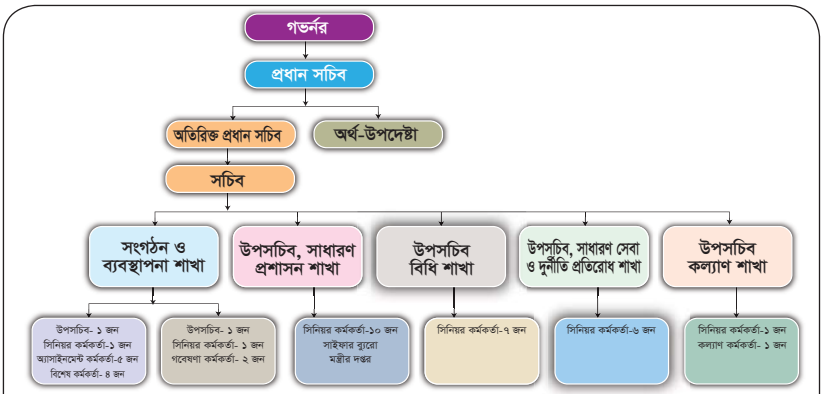

সূত্র: Year Book 1968-69, Service and General Administration Department, Government of East Pakistan.

স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

অতঃপর ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার গঠনের পরে এটি Establishment Division হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৮২ সালে এনাম কমিটি এটিকে Ministry of Establishment & Reorganization নামকরণের সুপারিশ করে। পরবর্তীতে এই মন্ত্রণালয়ের নাম করা হয় Ministry of Establishment।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বর্ষপঞ্জি ১৯৮৭–১৯৮৮তে এটিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে অভিহিত করা হয়। পুস্তিকাটিতে দেখা যায়, সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। সচিবকে সহযোগিতা করার জন্য ১ জন অতিরিক্ত সচিব, ৪ জন যুগ্মসচিব, ২০ জন উপসচিব এবং ৪৪ জন সিনিয়র সহকারী সচিব নিয়োজিত ছিলেন। মন্ত্রণালয়ে ৫টি অনুবিভাগ ছিল যথা: ১. প্রশাসন ২. নিয়োগ, বদলি ও প্রেষণ, ৩. বিধি ও শৃঙ্খলা ৪. নব-নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এবং ৫. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা।

বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি ও কাজের ব্যাপকতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পরিবর্তন হয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক ও কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায়। বিশ্বায়ন, আধুনিকতা ও প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান যুগে মানুষের চাহিদা ও জীবনমানে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতার স্তর। এছাড়া প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে প্রয়োজন জনমুখী, দক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন। তাই মেধাভিত্তিক জনপ্রশাসন গড়তে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ে ৯টি অনুবিভাগ, ২৬টি অধিশাখা ও ৭৩টি শাখা রয়েছে; এছাড়া সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও লোকপ্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র এই মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ মন্ত্রণালয়ের কাজের বিস্তৃতি, পরিমাপ ও ধরন পরিবর্তন হয়েছে, ফলে লোকবল সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান জনপ্রশাসন এখন অনেক গতিশীল ও দক্ষ। নিয়মিত কর্মকাণ্ড যেমন: লোকবল নিয়োগ, পদায়ন, প্রশিক্ষণ, প্রেষণ, চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ইত্যাদির পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধ, জনসেবায় উদ্ভাবন, শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কার্যকর অবদান রাখছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কাজগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে প্রদান করা হলো :

১. জনসেবায় উদ্ভাবন

বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে। স্বল্প সময়ে, সুলভে জনগণকে আধুনিক ও উন্নত সেবা প্রদান করা প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীর নৈতিক দায়িত্ব। সে লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুঘটক হিসেবে থেকে জনসেবায় উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করছে। সরকারের মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের এ বিষয়ে বলেন, প্রশাসনিক কাঠামো ও গণ্ডির মধ্যে থেকেও জনসেবায় উদ্ভাবনের প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব। জনসেবার পাশাপাশি রাষ্ট্রের উন্নয়নেও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে তিনি সকল সরকারি কর্মচারীদের সব সময় উদ্বুদ্ধ করেন। সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যন্ত প্রায় ২০০ রকমের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাগণ জনসেবা প্রদানে তাদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির যথাযথ ব্যবহার করছেন। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হচ্ছে এবং তাদের কাজের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে।

২. জনপ্রশাসন পদক প্রবর্তন

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। তথাপি ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর ও ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মেধাভিত্তিক, সেবামুখী, দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসনের কোনো বিকল্প নেই। আর সে লক্ষ্য অর্জনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদান করতে হয়। ফলে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২০১৫–২০১৬ অর্থবছরে জনসেবায় ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় প্রথমবারের মতো ১১ জন কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটুআই কর্মসূচি ও গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিটকে জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, যা সরকারি কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৩. সরকারি কর্মচারী আইন

প্রত্যেক দেশের জনপ্রশাসন একটি নির্দিষ্ট ও সুগঠিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশেও 'সরকারী কর্মচারী আইন২০১৫'-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরেও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 'সরকারি কর্মচারী আইন' চূড়ান্ত হয়নি। আশা করা যায়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রণীত আইনটি দ্রুত চূড়ান্ত হবে এবং সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সমভাবে মূল্যায়ন ও সন্তুষ্ট করবে । তাহলেই দেখা যাবে, জনপ্রশাসন আরো গতিশীলতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবে।

৪. নারী ক্ষমতায়ন

সরকার নারীর ক্ষমতায়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সে ধারাবাহিকতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ও নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত Statistics of Civil Officers and Staff ২০১৫ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ৩,৭৮,৩৫৪ জন মহিলা সরকারি কাজে নিয়োজিত, যাদের মধ্যে ২৫,৯৯৬ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা। নারীদের সরকারি কাজে অংশগ্রহণের সংখ্যাটি বেশি বড়ো নয় কিন্তু তারা সুনামের সাথে কাজ করছেন। ইতোমধ্যে ১৭ জন নারী প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ সচিব/ সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় আসীন হয়েছেন। সম্প্রতি প্রধান তথ্য অফিসার (গ্রেড-১) হিসেবে সর্বপ্রথম একজন নারী কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। এছাড়া এ যাবৎকাল ৯৮ জন অতিরিক্ত সচিব, ১৫০ জন যুগ্মসচিব, ২৩৬ জন উপসচিব, ৩৯৪ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও ৪৮৭ জন সহকারী সচিব পদে নারীরা কর্মরত অথবা নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে অনেক নারী কর্মকর্তাই জেলা কিংবা উপজেলা প্রশাসনের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করছেন।

৫. শুদ্ধাচার

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগের সহায়ক হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করেছে।

মূলত জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই সরকার দৃঢ় এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের মানুষের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাই হচ্ছে এই কৌশলের রূপকল্প। সাধারণভাবে শুদ্ধাচার বলতে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বুঝায়। পাশাপাশি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বুঝায়। আর ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা। ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচারচর্চা ও মেনে চলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেননা ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ স্বচ্ছতা ও নিয়মনিষ্ঠা পালন করে ও দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে জনগণের সেবা প্রদান করে। তাই বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনের বিপুল কর্মযজ্ঞে দক্ষতা আনয়ন, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভূত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রধানত নীতি বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেজন্য কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতিমুক্ত করা আবশ্যক। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরাসরি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

- প্রথমত, সকল ক্যাডার গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত এবং যুগোপযোগী একটি সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন, যে আইন সকল ক্ষেত্রে সকল ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৫-২০১৬ অনুযায়ী, 'সরকারী কর্মচারী আইন ২০১৫'– এর খসড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। কিন্তু কিছু অজানা কারণে, চূড়ান্ত অনুমোদনের ও প্রয়োগের অপেক্ষায় আইনটি মাঝপথে থমকে গেছে।
- দ্বিতীয়ত, 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন', যার অংশ হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যেমন: প্রতিবছর ২৩শে জুন জনপ্রশাসন দিবস পালন, জনসেবায়

২৩শে জুন ২০১৬ অফিসার্স ক্লাবে আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আলোচনা সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম, প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন মুখ্য সচিব মো. আবুল কালাম আজাদ, বর্তমান মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন –পিআইডি

উদ্ভাবন কার্যক্রম, জনসেবা পদক প্রদান, বিভিন্ন মেয়াদে নানাবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ, ই-ফাইলিং চালু ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি।

- তৃতীয়ত, অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন যা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
- চতুর্থত, বিধানানুসারে আয় ও সম্পদের বিবরণ নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা প্রদান। বর্তমানে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাগণ যোগদানের সময় তাদের সম্পদের হিসাব জমা দিচ্ছেন। তবে নিয়মিতভাবে সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়া পুরোপুরি চালু হয়নি।
- সর্বশেষ, মন্ত্রণালয়সমূহের গুচ্ছ গঠন সরকারি কর্মচারী আইনের মতো এই বিষয়টিও অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। যদিও গুচ্ছ গঠন হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের স্পৃহা বেড়ে যাবে, জনগণ সুলভে আরো বেশি সেবা পাবে।

২৩শে জুন ২০১৬ আগারগাঁওস্থ বনভবনে আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর ও সংস্থা প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ –পিআইডি

৬. প্রশিক্ষণ

কর্মচারীদের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাদারি মনোভাব সৃষ্টিতে দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীগণ নিজেদের জ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করতে পারেন এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০১৫–২০১৬ অর্থবছরে মোট ২৫০২ জনকে (নবীন থেকে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় কর্মচারীকে) বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের জন্য প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবছর বিভিন্ন খাত ও প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। ২০১৫–২০১৬ অর্থবছরে মোট ১১৪০ জন কর্মচারীকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চীন, ভিয়েতনাম, ভারত, মালেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৮৯ জনকে উচ্চশিক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়। এছাড়া 'Strengthening Government through Capacity Development of BCS Cadre Officials', শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Duke Centre for International Development (DCID), Duke University, USA; International Training Centre of ILO, Italy এবং Macquaire University, Australia-তে ৪৭ জন অতিরিক্ত সচিব, ৯৪ জন যুগ্মসচিব এবং ৯৩ জন উপসচিবকে প্রশিক্ষণে এবং ৫০ জনকে মাস্টার্স কোর্সে প্রেরণ করা হয়। একইভাবে ২০১৬–২০১৭ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ১২০৭ জন; তন্মধ্যে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৮০১ জন কর্মচারীকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তদুপরি, 'জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা ২০০৩' মোতাবেক সামগ্রিক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমকে বেগবান করতে সরকারি কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘণ্টা কর্মসহায়ক প্রশিক্ষণের 'প্রশিক্ষণ মডিউল' তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি দপ্তরসমূহের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য 'Improving Public Services through Total Quality Management (IPS-TQM)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কালের প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নব নব উদ্যোগ, চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা নিয়ে জনগণের সেবার মান উন্নয়নের চেষ্টা করছে। তবু এদেশের জনপ্রশাসনের কাছে জনগণ ও সকল সরকারি কর্মচারীর বেশ কিছু প্রত্যাশা রয়েছে যেমন:

- সুলভে, কম সময়ে সাধারণ মানুষের নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা
- সকল ক্যাডারের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি 'সরকারী কর্মচারী আইন' প্রণয়ন করা
- উন্নততর দায়বদ্ধতাসহ কর্ম সম্পাদন
- প্রশাসনিক কর্মপ্রক্রিয়ায় অধিকতর কর্মদক্ষতা ও কার্যকারিতা আনয়ন
- সকল ক্যাডারের মেধাবী ও দক্ষ কর্মচারীদের যথাযথ মূল্যায়ন তথা বৈষম্যহীন পদায়ন ও পদোন্নতি নিশ্চিতকরণ
- পদোন্নতি প্রদানে পরীক্ষা পদ্ধতি চালুকরণ
- কাজের ধরন ও পদ্ধতি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহের গুচ্ছ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা ইত্যাদি।

সর্বোপরি, সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়তে একটি দক্ষ, গতিশীল ও জনবান্ধব প্রশাসন দরকার যা সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসের প্রাক্কালে সকল সরকারি কর্মচারীকে সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

আগুন পাখি

আফরোজা পারভীন

মেয়েটা কথায় কথায় কাঁদে। মা বলে, ও চোখে একটা পানির কল বসিয়ে রেখেছে। ওয়াসার পানির সংকট হয়, ওর চোখে পানির সংকট হয় না কখনো। কী গ্রীষ্মে, কী বর্ষায়, কী খরায় ! কেউ জোরে কথা বললে, ধমক দিলে, রাগি চোখে তাকালেও থরথর করে কাঁপতে থাকে। মনে হয় বেতসপাতা, এখনই ভেঙে পড়ে যাবে। ভয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বড়োজোর দাঁড়ায় একপা হেলিয়ে । শুধু যে দাঁড়াতে পারে না তাই-ই না, চোখ তুলে তাকাতেও পারে না। আর কথা, সে তো ওর মুখ থেকে বোমা মেরেও বের করা যায় না। একটা কথা বলতে ও দশবার তোতলায়। যদিও ওর তোতলামির অসুখ মোটেও নেই। এসব দেখে পাড়ার এক শিক্ষক বলেছিলেন, ওর ব্যক্তিত্বে সমস্যা আছে। সে সমস্যা ভীরুতা, পলায়নপর মনোবৃত্তি। আর এসবের কারণে ও নিজেকে অতি তুচ্ছ ভাবে। তাই কখনো নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না।

পড়াশুনাতেও খারাপ মেয়েটা। পড়া না বুঝলে সাহস করে কখনই স্যারদের জিজ্ঞাসা করতে পারে না। আর পড়া পারলে উঠে দাঁড়িয়ে সাহস করে বলতেও পারে না। সারাক্ষণ বসে থাকে মুখ গুঁজে। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন না বুঝলে একটিবারও স্যারদের জিজ্ঞাসা করে না। যে প্রশ্ন না বোঝে সেটা না লিখেই চলে আসে। তাই শিক্ষকরা ওকে মোটেও পছন্দ করে না। যে মেয়ে খারাপ রেজাল্ট করে, পড়া বলতে পারে না তাকে কে পছন্দ করবে!

বাড়িতেও একই অবস্থা। খাবার না দিলে মুখ ফুটে খাবার চায় না। জামা ছিঁড়ে যায়, জুতো ছিঁড়ে যায়, কিনে দিতে বলে না। ছোটো বোনটা ওর ভাগের ডিমটা, দুধটুকু খেয়ে ফেলে। ও লবণ দিয়ে ভাত মেখে খায়, তবু বোনকে কিছু বলতে পারে না।

এমন হলে কি চলে ! মা মাঝে মাঝে আফসোস করেন। আজকালের দুনিয়ায় যে যত কথা বলবে, চাইবে, ঠকিয়ে নেবে সেই টিকবে। মুখচোরা মানুষের কোনো জায়গা নেই। না ঘরে না বাইরে। মেয়েটা যে কেন এমন হলো। ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়ো চিন্তিত মা। কী হবে এ মেয়ের!

মেয়েটা এমনই বোকা যে বকুনি খায় তবু সত্যি কথা বলে। বানিয়ে একটা মিথ্যে বলতে পারে না। রেজাল্ট খারাপ হলে রেজাল্ট শিট লুকিয়ে রাখতে পারে না। নিজের জিনিসগুলো পর্যন্ত গুছিয়ে রাখতে পারে না যে মেয়ে, সে অবলীলায় সত্যি বলে। বকা খেলে কাঁপে, তোতলায়, তবু সত্যি বলে। ওর এই বোকামি দেখে সবাই হাসে। ছোটো বোনটা পর্যন্ত বলে, 'আপু তুই আর মানুষ হলি না। সত্যি কথাটা বললি বলে মা তোকে কী বকাটাই না দিল। তুই প্লেট ভেঙেছিস তার তো কোনো সাক্ষী ছিল না। তাহলে বলার দরকার কী ছিল যে তুই ভেঙেছিস। জানি না বললেই তো মিটে যেত। প্রমাণ তো আর কেউ করতে পারত না যে, তুই ভেঙেছিস। বোকামি করে শুধু শুধু বকুনি খেলি।

: কিন্তু আমিই তো ভেঙেছি।

: তা ভেঙেছিস বুঝলাম। কিন্তু ভাঙতে তো কেউ দেখেনি। সে কথা গায়ে পড়ে বলে বকুনি খাবার দরকার কী। তোকে তো কেউ জিজ্ঞাসা করেনি ভেঙেছিস কি-না। আগ বাড়িয়ে বললি বলেই না বকাটা খেলি।

: কিন্তু আমি না বললে মা রাহেলাকে বকত। দেখছিলি না মা ওকে বকছিল।

: ওকে বকলে তোর কী। তুই তো আর বকুনি খেতি না।

: কিন্তু রাহেলা তো ভাঙেনি, ভেঙেছি আমি। ও কেন বকা খাবে বলত।

: যাক বাবা অনেক হয়েছে, তোকে বোঝায় কার সাধ্যি।

এভাবেই বেড়ে ওঠে মেয়েটা। এসএসসি টেনেটুনে পাস করে। সরকারি কলেজে অ্যাডমিশন পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাবা বলেন,

: দেখি ধরাধরি করে ভর্তিটা করানো যায় কি-না। প্রিন্সিপালের সামনে নিয়ে যাব তোকে। তুই বলবি, পরীক্ষার সময় ভীষণ অসুখ ছিল তাই পরীক্ষা খারাপ হয়েছিল ।

: আমার পরীক্ষার সময় অসুখ হয়নি আব্বা।

বাবা কড়া ধমক দিয়ে বলেন,

: যা বলতে বলছি তাই বলবি । তা না হলে সরকারি কলেজে অ্যাডমিশন পাবি না।

মেয়েটা কাঁদে, তোঁতলায়, কাঁপে আর বলে,

: কিন্তু আমার অসুখ হয়নি, বলব কেন?

এগিয়ে আসেন মা। বিরক্তির সাথে বলেন,

: এ মেয়ের আর বোধবুদ্ধি হলো না। আপন ভালো পাগলও বোঝে, ও বোঝে না। শোনো, তুমি ওকে নিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে যেও না। আমার মেয়েকে আমি চিনি। ও প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে বলবে পরীক্ষার সময় ওর কোনো অসুখ হয়নি। তোমার মানসম্মান যাবে। তার চেয়ে ওকে বেসরকারি কলেজে ভর্তি করে দাও।

কো-এডুকেশন কলেজ। সেখানেও এই অবস্থা। ও ক্লাসের সবচেয়ে খারাপ ছাত্রী। পড়ালেখায় ভালো না, গান-বাজনা, খেলাধুলা কিছুতেই ভালো না। নিজের মনে আসে যায়, কারো চোখেও পড়ে না। তবে একটা ছেলে ওর সাথে কথা বলে, এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করে, গায়ে পড়ে নোটস দিতে চায়। রাস্তায় অনেক দূর অবধি পাশাপাশি হাঁটে। গল্পে গল্পে অনেক কিছু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করে দিনের পর দিন। মেয়েটা মুখ বুজে চলে, কথা বলে না। ছেলেটা তাতে ক্লান্ত হয় না।

এইচএসসি পাস করার পর আব্বা-মা আর ঝুঁকি নিতে চান না। এ মেয়ে নিয়ে কোনো আশা নেই, জজ-ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তো দূরের কথা, এ মেয়ের স্কুল শিক্ষক হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। ততদিনে ছোটো মেয়েটা কলেজে উঠেছে। ও ভালো ছাত্রী। ওর পেছনে অনেক খরচ। কলেজের মাইনে, কোচিং-এর পয়সা, যাতায়াত, জামা-কাপড়-জুতো-স্যান্ডেল। ও মেয়ের রেজাল্ট ভালো। ও জজ-ব্যারিস্টার-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। গরিবের সংসার চালাতে হয় হিসেব করে। দু মেয়ের পেছনে টাকা ঢালার সামর্থ্য নেই। তাই বড়োটাকে বিয়ে দেওয়াই ভালো। সুতরাং মেয়ের জন্য সম্বন্ধ দেখা শুরু হয়। মেয়েটা দেখতে ভালো। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, নাক চোখ চোখা চোখা, গায়ের রং দুধে আলতা। কাজেই সম্বন্ধ আসতে থাকে। আর মাঝে মাঝেই পাত্রপক্ষের সামনে হাজিরা দিতে হয় মেয়েটাকে। প্রথম দিন পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এলে পোলাও, কোরমা, রোস্ট, বিরিয়ানি, মিষ্টি, দইসহ বহু কিছুর আয়োজন করা হয়। আলমারিতে তোলা বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ নামিয়ে ফিটফাট করে বাইরের ঘরটা সাজায় মা আর বোন। ছেলের বোন মেয়েকে ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখে বলে,

: বাহ বেশ, রংটা টকটকে। চোখ দুটোও টানাটানা।

মেয়ের মা উল্লসিত হয়ে বলেন,

: মেয়ে আমার দেখতে শুনতেই শুধু ভালো না, কাজে কামে চৌকস। এই যে যত রান্না দেখছেন সবই ওর করা। আর এই যে সেলাই ফোড়াই এসবও ওর হাতের। মেয়ে আমার রান্না- বান্না, সেলাই-ফোড়াই সব কিছুতেই পটু।

: বাহ বেশ বেশ

ছেলের মা মেয়েকে বলেন,

: একটা রোস্ট তুলে দাও তো মা প্লেটে

মেয়েটা রোস্ট তুলে দেয়। ছেলের মা তৃপ্তিভরে রোস্টে কামড় দিয়ে বলেন,

: খুব ভালো হয়েছে রান্না। তুমি করেছ ? মেয়েটা ছেলের মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে,

: মা রান্না করেছে, আমি না। আমি রান্না জানি না। ব্যস হয়ে যায়! হওয়া বিয়ে ভেঙে যায়।

: এই, তোর গায়ে পড়ে বলার দরকার কী ছিল। চুপ করে থাকলেই তো হতো। মেয়েটা কাঁপে, তোতলাতে তোতলাতে বলে,

: আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে!

দ্বিতীয় বিয়েটাও ভাঙে প্রায় একইভাবে। প্রথম দিন ছেলের মা-বাবা এসে মেয়েকে দেখে পছন্দ করে যায়। বিয়ের কথা অনেক দূর এগোয়। এরপর আসে ছেলে তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে। ছেলের পছন্দ হলেই বিয়ে ফাইনাল হবে। মেয়ে দেখে ছেলে হা। বড়ো সুন্দর মেয়ে। আজ ছেলে এসেছে বলে মেয়েটার বাবা-মা বা মুরুব্বিরা সামনে নেই। আছে শুধু মেয়ের ছোটো বোন। খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলের বন্ধুরা দুষ্টুমি শুরু করে।

: আপনি তো আমাদের ভাবি হতে যাচ্ছেন তাই না ? মেয়ে চুপ।

: কী হলো বললেন না। আচ্ছা আপনার কি কোনো প্রেম ছিল, আপনি কাউকে পছন্দ করতেন, কিংবা কেউ আপনাকে? মেয়েটা কাঁপতে শুরু করে, কাঁপে আর তোতলাতে তোতলাতে বলে,

: একজন বোধ হয় করে।

: করে মানে ? কী করে জানলেন ও আপনাকে পছন্দ করে? বোন থামাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে মেয়েটাকে থামাতে পারে না।

: ও কলেজ থেকে প্রতিদিন আমার সাথে অনেক দূর আসত। আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করত।

: এখনো আসে?

: এখন তো কলেজ নেই, এখন বাসার সামনে ঘোরাঘুরি করে।

: আর আপনি? আপনি ওকে পছন্দ করেন?

: আমি ভেবে দেখিনি। তবে ও এলে আমার ভালো লাগে।

এরপর আর এ বিয়ে হওয়া কি সম্ভব! সেদিন পাত্রপক্ষ গালাগালি করতে করতে চলে গেছিল। মেয়ের বাবা-মা নাকি ঠকিয়ে খারাপ মেয়েটাকে গছিয়ে দিতে চাচ্ছিল। মা চোখের পানি মুছতে মুছতে বলে,

: এ বোকা মেয়ের আর বিয়ে হবে না। হতেই পারে না।

এরপরও বিয়ে ঠিক হয়। এবার আর বাবা- মা কোনো ঝুঁকি নেয় না। সুকৌশলে পাত্রপক্ষকে তেমন প্রশ্ন করার সুযোগই দেয় না। আর পাত্রের বাবারও প্রশ্ন করা, খাওয়াদাওয়ার চেয়ে নগদ টাকার দিকে নজর বেশি ছিল। তিনি বিয়ের যৌতুক হিসেবে নগদ দুলাখ

টাকা চেয়ে বসেন।

বিয়ে ঠিক হবার পর বাবা হাসিমুখে মায়ের সামনে বলেন,

: যাক শেষ মেষ মেয়েটার একটা গতি হতে চলেছে। ওরা মেয়েকে পছন্দ করেছে ।

: তাই নাকি, এটা তো বিরাট খবর! মহাখুশি হয়ে মা বলল।

: তা ঠিক, তবে ওরা দুলাখ টাকা যৌতুক চেয়েছে ।

: দুলাখ টাকা! দেবে কোথা থেকে ? বলেছ নাকি দেবে ?

: বলেছি, তবে দেব না। পাবো কোথায় যে দেব।

: তাহলে?

: তাহলে কিছুই না। কায়দা করে একবার বিয়েটা পড়িয়ে দিলেই হলো। তারপর ওদের বাড়ির বৌকে ওরা কোথায় রাখবে, রাখবে না ফেলবে সেটা ওদের ব্যাপার।

: মেয়ের জীবন নিয়ে এই ঝুঁকি নেওয়া ঠিক না।

বাবা-মার আলোচনার পুরোটাই মেয়েটার কানে আসে। ও আস্তে আস্তে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওকে দেখে বাবা মুখ তুলে তাকান।

: কিছু বলবি?

মেয়েটা কাঁপতে থাকে। কাঁপে আর তোতলায়। তোতলাতে তোতলাতে বলে,

: যা দিতে পারবে না, তা দেবে বলে কথা দেওয়া ঠিক না।

: এলেন জ্ঞান দিতে । যা যা, নিজের বিয়ের ব্যাপারে যে কথা বলতে নেই তাও জানিস না, নির্লজ্জ মেয়ে।

: বাবা সত্যিই বলছি, যা পারবে না তা দিতে চেও না। আর যারা যৌতুক নেয় তারা লোক ভালো না।

: চুপ চুপ, একদম চুপ। যৌতুক ছাড়া বিয়ে হয় নাকিরে। কেউ সোনা-দানা-ফ্রিজ-টেলিভিশন নেয়, কেউ নেয় নগদ টাকা। শুধু মেয়ের দাম আছে নাকি ! দাম তো ওই টাকা-পয়সা-জিনিসপাতির।

: বাবা !

: আর একটা কথাও বলবি না।

বিয়ের আয়োজন শেষ। বাবা-মা সাধ্যমতো খরচ করেছেন। ভালো শাড়ি গহনাগাটি কেনা হয়েছে। লোকজনও দাওয়াত করা হয়েছে বেশ। আত্মীয়স্বজনে বাড়িঘর গমগম করছে। সুসজ্জিত মেয়ে বসে আছে বিয়ের আসরে। হইহই করতে করতে বরযাত্রীরা এল। গেট ধরাধরি, কথা কাটাকাটি শেষে বরকে এনে বসানো হলো তার নিজের আসনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়ে পড়ানো হবে। কাজী এসে গেছে । তিনি প্রস্তুত হয়ে বসলেন। তখনই ছেলের বাবা বলল,

: বিয়াই মশাই যৌতুকের টাকাটা ?

: দেখুন একটু সমস্যা হয়ে গেছে। যার টাকা নিয়ে আসার কথা তিনি রাস্তায় আটকে পড়েছেন । এই ঘণ্টা দুতিনেকের মধ্যেই এসে পড়বেন। বিয়েটা হয়ে যাক আমি রাতেই আপনার হাতে টাকা পৌঁছে দেব।

: না না, কথা তেমন ছিল না। কথা ছিল বিয়ের আসরেই টাকা দেবেন। এ বিয়ে হবে না, আমি ছেলে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

: ঠিক আছে, ঠিক আছে, বিয়ের আসরেই টাকা দেব। বিয়েটা হয়ে যাক না।

হইচই শুরু হয়। ঝগড়াঝাটি চরমে পৌঁছে। দাওয়াতি ছাড়াও বাইরের লোক জড় হয় বিয়ের আসরে। তারপর একসময় আসরের সবাই ছেলের বাবাকে বুঝাতে থাকে। কী ছেলেপক্ষ, কী মেয়েপক্ষ। এই পর্যায়ে ছেলে উঠিয়ে নেওয়া ঠিক না। মেয়েটার তো আর দোষ নেই। তাছাড়া মেয়ের বাবা যখন বলছেন বিয়ের আসরেই টাকা দেবেন। তা যদি না দেন সে ব্যবস্থা পরে হবে। পরেও তো মেয়েকে বাপের বাড়ি রেখে আসা যাবে। তাতে তো মেয়ে পক্ষেরই ক্ষতি বেশি।

: ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবাই যখন বলছেন আমি বিয়ে পড়াচ্ছি। তবে আজ রাতের মধ্যে টাকা না পেলে মেয়ে কিন্তু কালই এ বাড়িতে ফিরে আসবে।

সবাই সাময়িকভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আর ঠিক তখনই কাঁপতে কাঁপতে ভরা মজলিসে গিয়ে দাঁড়ায় মেয়েটি। তোতলাতে তোতলাতে বলে,

: এ বিয়ে আমি করব না। আমার বাবার সামর্থ্য নেই দুলাখ টাকা দেবার। তারপরও দিতে রাজি হয়েছেন। তার উদ্দেশ্য আপনাদের ঠকানো, যেকোনো প্রকারে বিয়েটা দিয়ে দেওয়া। আর আপনাদের অনেক সামর্থ্য থাকার পরও বিয়েতে দুলাখ টাকা দাবি করেছেন। আপনারা বউ চান না, টাকা চান। যৌতুক দেওয়া-নেওয়া দুটোই অপরাধ। আপনারা দুজনই অপরাধী। আমি এ বিয়ে করব না।

মেয়েটা ঝলসে ওঠে। ওর চোখমুখ জ্বলজ্বল করে। যেন সে মুখে আগুন ঝলকায়। ওর কাঁপুনি দেওয়া শরীর সোজা হয়ে ওঠে। তোতলামি থেমে যায়।

দুপক্ষই মেয়েকে বোঝাতে থাকে। কিন্তু ও অনড়। বাবা অনুরোধ করে, মা চোখের পানি ফেলে, বোন হাত জড়িয়ে কাঁদে। কিন্তু ওকে কেউ বোঝাতে পারে না, না ছেলেপক্ষ, না মেয়েপক্ষ। ছেলেপক্ষের লোকজন রাগারাগি করতে করতে চলে যায়। বাবা কিছুক্ষণ মুহ্যমান বসে থেকে উঠে দাঁড়ান। তারপর একসময় মেয়েকে ঘর থেকে টেনে বের করে দেন। ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে মেয়ের চোখের সামনে দরজা বন্ধ করে দেন।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছে মেয়েটা। তখনই পেছন থেকে ডাক শোনে।

: শোন, শোন

মেয়েটা ঘুরে দাঁড়ায়। সেই ছেলেটা ডাকছে।

: তোমার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার সব ঘটনা দেখলাম । ভাগ্যিস দেখলাম । যাচ্ছ কোথায় ?

: জানি না।

: আমি জানি, তুমি যাচ্ছ আমার সাথে। ও হ্যাঁ, আসল কথাটাই তো জানা হয়নি। এতদিন ধরে ঘুরছি তোমার পেছনে আর তোমার নামটাই জানা হয়নি। তোমার নাম যেন কী ?

: আমার নাম ..

মেয়েটার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ছেলেটা বলে,

: ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তোমার নাম আগুন পাখি। তুমি আমার আগুন পাখি। ■

করিডোর

মনজুরুর রহমান

করিডোর ফাঁকা পড়ে আছে–
সরীসৃপের মতন শুয়ে থাকা শীতের সকালে!
দীঘলদেহী সবুজ দেবদারু ভেদ করা কমলাভো রোদ
আমাকে স্পর্শ করে।

একদিন তুমিও কি সাথে ছিলে?

বছর তিরিশ আগে,
আমরা হেঁটেছি এই চেনা পথে–যুগল;
তখনও দাঁড়ায়নি স্তম্ভ মাথা উঁচু করা–
'বাংলা অপরাজেয়'।
চির বসন্তে রঙিন স্থায়ী উজ্জ্বল করিডোর,
আজ বড়ো ম্রিয়মাণ মনে হয়!

তুমিতো নায়ক গ্রিক ট্র্যাজেডির...
নিয়তির জালে বাঁধা তোমার নিয়তি।
সহস্র স্মৃতির ছায়া নিয়ে অনতিক্রান্ত বৃত্ত
বেনোজল কুরে খায়– হৃদয় কন্দর...

জবুথবু করিডোর শুয়ে থাকে শীতের সকালে;
তার পরে ঢেউ তুলে হেঁটে যায় স্মৃতির মিছিল...

স্বাধীন মৃত্তিকা আমার

ফারুক নওয়াজ

দুধেভাতে নয়, প্রাচুর্য-ঐশ্বর্যে নয়
তোমার সন্তান যেন হয়ে ওঠে প্রকৃত মানুষ
জননী জন্মভূমি; লক্ষ স্বজনের রক্তে পাওয়া
স্বাধীন মৃত্তিকা আমার
দিয়েছ অনেক তুমি– পুষ্প-ফসল-জল।

জননী জন্মভূমি দিয়েছে আশ্রয় আর
নিরাপদ বাঁচার আশ্বাস
আর কী চাওয়ার আছে
জননী জন্মভূমি; লক্ষ স্বজনের রক্তে পাওয়া
স্বাধীন মৃত্তিকা আমার
দিয়েছ অনেক তুমি– পুষ্প-ফসল-জল।

বৃক্ষছায়া, সোনালি প্রত্যুষ
দিয়েছে পাখিডাকা নিঝুম দুপুর
দিয়েছে মায়াবী বিকেল আর
ছাইগন্ধ ধূসর প্রদোষ!

জননী জন্মভূমি দিয়েছে আশ্রয় আর
নিরাপদ বাঁচায় আশ্বাস
আর কী চাওয়ার আছে, শুধু চাই
আমরা তোমার সন্তান যেন
হয়ে উঠি প্রকৃত মানুষ; যেন
তোমাকে ভালোবাসতে শিখি;
যেন ভালোবাসি মানুষ ও প্রকৃতিকে;
যেন হিংসা, দ্বেষ, লোভ, নিষ্ঠুরতা থেকে
পরিপূর্ণ মুক্ত হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে
জেগে উঠি আমরা– তোমার সন্তান!

স্বপ্ন পোড়ানো সুখানুভূতি

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

সমস্ত শরীরের ভাঁজে ভাঁজে গাঢ় অন্ধকার মেখে
প্রকৃতির শয্যায় ঘুমিয়ে গেছে কুমারী রাত।

নাগরিক উদ্যানে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষরাজি–
শ্রাবণ সংগীতের স্বরলিপি পাঠে মুগ্ধ মুখর
অথচ, আমার ভাবনার আঙিনায় হামাগুড়ি দিয়ে
একাকী হেঁটে যায় কোনো এক বিষণ্ন বিকেল।

সেই বিকেলের শেষান্তে এলোমেলো হাওয়ায়
আদিম আনন্দের কার্নিশ ছুঁয়ে নেমেছিল সন্ধ্যা
এ জীবনে একবার তাকে পুড়িয়েছিলাম উষ্ণতার আগুনে।

নিজেকে পুড়ে বাসন্তী স্বপ্ন পোড়ানোর সুখানুভূতি–
যেন প্রদীপের বহ্নিশিখায় পোড়া পতঙ্গের মিনতি
অশ্রুস্নাত একাকীত্বের অভিমানে পুড়তে বড়ো সাধ জাগে।

কী এক অতৃপ্তবোধে একেলা জেগে থাকা নির্জন রাতে
তার প্রিয় মুখখানি বার বার ভেসে ওঠে স্মৃতির আয়নায়
হয়ত এতদিনে সাংসারিক জটাজালে বদলে গেছে-
সেই গোলাপরাঙা ঠোঁট, হাতের মেহেদি আবীর।

রূপের রোদে তপ্তগ্রীবা বেয়ে মন্থর ধারায় নেমে আসা-
ঘামের স্রোতে ভাসা সুখে খোঁজ রাখিনি কতকাল
তবে কী হেমলক সিক্ত সক্রেটিসের ঠোঁটে রেখেছি ঠোঁট?

তুমি বাসন্তী ফুল

আবুল আউয়াল রণী

যখন ফুলের সুবাস
সৌভাগ্যের চূড়ায় বসেছে।
তখন এত বড়ো পাওয়া
কোনো ছলেই হারাব না।
যার সৌরভ মনের মাঝে
কাজে আর ফুরসতের মাঝে।
গীতি কাব্য সুরের মাধুরিতায়,
সৌরভ পাণ্ডুলিপি রচনায় বুলাই ॥
এ পাওয়া মায়ামন্ত্রে
স্বর্গ থেকে বুঝি বা শীলায় লিপিত ছিল।
খুঁজেছি তারে ক্লান্তি চরণ ঝরিয়ে
ত্যাগ তিতিক্ষার আর ধৈর্যের ফল বুঝি হলো।
বাহ এ বসন্তের
বাসন্তী হাওয়ার রঙিন তারুণ্যে
পূজারি মন–
পূজার উপকরণ সাজাই প্রেম কাননে।
সর্ব পূজারি জাত কুল আর গোত্রীয়
অনন্যা বিধি বিধানতায়
ধ্যানের পরিসীমায় হৃদয় নিংড়িয়ে
পূঁজার উপকরণ সাজিয়ে,
তাকে বিলায়ে নিবেদিত মনপ্রাণ।
উজাড় করে মিনতিকাতর নতজানু হয়ে।
কল্যাণের পাওনা যেমন যার প্রাপ্য
তেমনি তোমায় বসন্তের লগ্নে
বাসন্তী রূপে ফুল ফলারির অর্চনায়
মোহিত মন্দিরের আসন
পূর্ণ করব মন্তর আলোর প্রত্যাশায়
এ জগতের মায়ামন্ত্রের মহিমায়
ধন্য জগৎ তোমার পাওনায়
ইহজগতের তুমি ফুল
তোমারে লয়ে রচনায় ফুটাবো আশার ফুল।

নিবন্ধ

বৃহৎ ঈদ জামাত

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

ঈদ উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ ঈদ জামাত। ঈদের দিন সকালে নতুন কাপড় পরে সকলে মিলে ঈদগাহে গিয়ে জামাতে ঈদের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ঈদ উৎসব শুরু হয়। ছোটোবড়ো, গরিব-ধনী, উঁচু-নীচু সকলে মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সারিতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার মাধ্যমে ইসলামের সাম্যের বার্তা নিয়ে শুরু হয় সার্বজনীন ঈদ উৎসব। গরিব, অসচ্ছল ও দরিদ্রদের ঈদ করার

জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের দৃশ্য

সুবিধার্থে ঈদের নামাজের পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। সচ্ছল পরিবারের সদ্য জন্মগ্রহণকারী শিশুসহ জীবিত সকল সদস্যের জন্য নির্ধারিত হারে সাদাকাতুল ফিতর নগদ দরিদ্রদের প্রদান করার বিধান ইসলামে রয়েছে। সূর্যোদয়ের পর থেকে মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের নামাজ আদায় করা যায়। ঈদগাহ বা খোলা মাঠে জামাতের সাথে ঈদের নামাজ পড়া উত্তম, তবে মসজিদেও পড়া যায়। ঈদের নামাজের পর কোলাকুলি করে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। সকল ক্ষোভ, দুঃখ, ব্যথাকে পেছনে ফেলে কোলাকুলির মাধ্যমে নতুন করে সম্প্রীতির মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয় সমাজের প্রতিটি মানুষ, শুরু হয় শান্তির বারতা নিয়ে নবযাত্রা।

জাতীয় ঈদগাহ ময়দান

বাংলাদেশের সকল মসজিদে ও বিভিন্ন ঈদগাহে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়। কোনো কোনো ঈদ জামাতে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের পাশেই প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার বর্গফুটের জাতীয় ঈদগাহ মাঠ অবস্থিত। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠে শামিয়ানা টানানো, মাইক, ফ্যান, সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। ঈদগাহের মূল অবকাঠামো তৈরিতে প্রায় ৫০ হাজার বাঁশ ব্যবহার করা হয়। এই অবকাঠামোকে বৃষ্টি প্রতিরোধী শামিয়ানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে বৃষ্টি হলেও মুসল্লিদের নামাজ আদায়ে কোনো সমস্যা হয় না। ভিআইপিদের জন্য ঈদগাহের ভেতরে প্রায় তিন হাজার বর্গফুট জায়গা আলাদা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হয়। ময়দানের মূল ফটকের পাশেই বসানো হয় অজুখানা। শতাধিক মানুষ একসঙ্গে অজু করতে পারে সেখানে। পানি নিষ্কাশনের জন্য তৈরি করা হয় ড্রেনেজ ব্যবস্থা। মুসল্লিদের সুবিধার্থে ভ্রাম্যমাণ টয়লেটও থাকে ঈদগাহ মাঠে। এ ছাড়া জাতীয় ঈদগাহ ময়দান ঘিরে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ঈদগাহ এলাকায় নিরাপত্তার জন্য পুলিশ-র‍্যাবের দুটি আলাদা নিয়ন্ত্রণ কক্ষও তৈরি করা হয়। প্রধান ফটকে নিরাপত্তা তল্লাশির ব্যবস্থা রাখা হয়।

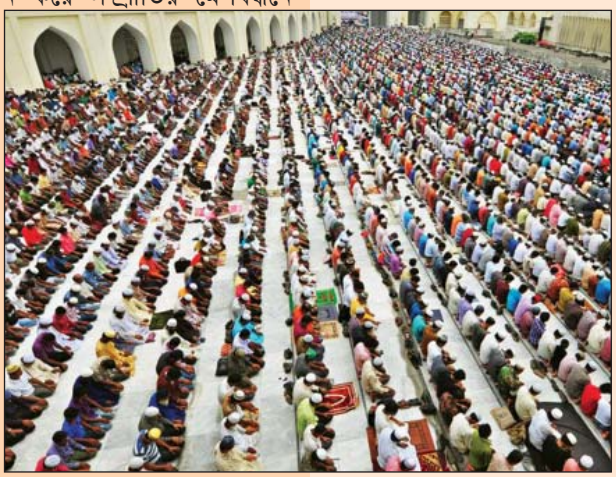

বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে ঈদের জামাত

জাতীয় ঈদগাহে একসঙ্গে এক লক্ষ পুরুষ ও পাঁচ হাজার নারীর নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় ঈদগাহের জামাতে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিচারপতি, কূটনীতিক, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতিসহ বিশিষ্টজন ঈদের নামাজ পড়তে আসেন হাইকোর্টের প্রধান ফটক দিয়ে। ঈদগাহ ময়দানের প্রধান ফটক সর্বসাধারণের জন্য খোলা রাখা হয় । হাইকোর্ট মাজারের রাস্তাটি নারীদের যাতায়াতের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের জামাত সাধারণত সকাল সাড়ে ৮টায় অনুষ্ঠিত হয়।

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

প্রতি ঈদে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি ঈদ জামাত হয়। প্রথম জামাত হয় সকাল ৭টায়। এরপর পর্যায়ক্রমে সকাল ৮টা, ৯টা, ১০টা এবং পঞ্চম ও শেষ জামাত হয় সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে। এখানে নারীদের নামাজের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। ঈদের দিন ভ্রমণকারীদের জন্য এখানে নামাজ পড়া সুবিধাজনক, যে-কোনো একটি জামাতে অংশগ্রহণ করা যায়।

শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান

কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান। কিশোরগঞ্জ শহরের পূর্বে নরসুন্দা নদীর তীরে এই মাঠ অবস্থিত। প্রতিবছর এ ময়দানে ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এ কারণে শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানটি একটি ঐতিহাসিক স্থানে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে এখানে একসঙ্গে তিন লক্ষাধিক মুসল্লি জামাতে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শুরুর আগে শর্টগানের ফাঁকা গুলির শব্দে সবাইকে নামাজের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সংকেত দেওয়া হয়।

ইসলাম প্রচারের জন্য ইয়েমেন থেকে আগত শোলাকিয়া সাহেব বাড়ির পূর্বপুরুষ সুফি সৈয়দ আহমেদ তার নিজস্ব তালুকে

১৮২৮ সালে নরসুন্দা নদীর তীরে ঈদের জামাতের আয়োজন করেন এবং নিজেই ইমামতি করেন। অনেকের মতে, মোনাজাতে তিনি মুসল্লিদের প্রাচুর্য প্রকাশে সোয়া লাখ কথাটি ব্যবহার করেন। আরেক মতে, সেদিনের জামাতে ১ লাখ ২৫ হাজার (অর্থাৎ সোয়া লাখ) লোক জমায়েত হয়। ফলে এর নাম হয় সোয়া লাখি, যা পরবর্তীতে লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে শোলাকিয়া হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, মোগল আমলে এখানে অবস্থিত পরগনার রাজস্বের পরিমাণ ছিল সোয়া লাখ টাকা। উচ্চারণের বিবর্তনে সোয়া লাখ থেকে সোয়ালাখিয়া সেখান থেকে শোলাকিয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে স্থানীয় দেওয়ান মান্নান দাদ খাঁ এই ময়দানকে অতিরিক্ত ৪৩৫ একর জমি দান করেন।

বর্তমান নরসুন্দা নদীর তীরে অবস্থিত শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠের আয়তন ৭ একর। শোলাকিয়া মাঠে মোট ২৬৫ সারির প্রতিটিতে ৫০০ করে মুসল্লি দাঁড়াবার ব্যবস্থা আছে। ফলে মাঠের ভেতর সবমিলিয়ে এক লাখ বত্রিশ হাজার ৫০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন। ঈদগাহ মাঠটি চারপাশে উঁচু দেয়ালে ঘেরা হলেও মুসল্লিদের মাঠে প্রবেশের সুবিধার্থে মাঝে মাঝেই ফাঁকা রাখা হয়েছে। এছাড়া মাঠের দেয়ালে কোনো দরজা নেই। তবে ঈদুল ফিতরের নামাজের সময় আশপাশের সড়ক, খোলা জায়গা, এমনকি বাড়ির উঠানেও মুসল্লিরা নামাজ আদায় করেন । এভাবে সর্বমোট প্রায় তিন লাখ মুসল্লি ঈদের নামাজ পড়ে থাকেন। মুসল্লির এই সংখ্যা প্রতিবছর বেড়ে চলেছে। দূরদূরান্ত থেকে শুধু ঈদের নামাজ পড়ার জন্য অনেকে এখানে ছুটে আসেন। শোলাকিয়া ঈদগাহের ব্যবস্থাপনার জন্য ৫১ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। ঈদের নামাজের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড এই কমিটি করে থাকে।

দিনাজপুর গোর-এ শহীদ বড় ময়দান

উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় দিনাজপুর গোর-এ-শহীদ বড় ময়দানে। দিনাজপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই মাঠে বর্তমানে একসঙ্গে প্রায় ৭০/৮০ হাজার মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করে। মাঠের উত্তর-পূর্ব অংশে এই জামাত হয়। তবে পুরো মাঠজুড়ে ঈদ জামাত আয়োজনের লক্ষ্যে মাঠ সংস্কার ও মিনার নির্মিত হচ্ছে দিনাজপুর গোর-এ শহীদ বড় ময়দানে। দিনাজপুর গোর-এ শহীদ বড় ময়দানে নির্মিত এ বৃহত্তম ঈদগাহ মাঠ ও মিনার নির্মাণ সম্পন্ন হলে এখানে ৬ লক্ষাধিক মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারবেন এবং এটি দেশের বৃহত্তম ঈদ জামাতে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশের অন্যতম বৃহত্তম এই মাঠের চারপাশে পাকা রাস্তা রয়েছে। নির্মাণাধীন এ ঈদগাহ মাঠের মিনার হবে ৫১৬ ফুট উঁচু এবং চওড়া ২০ ফুট। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে মাঠের সামনে থাকবে ৫০টি গম্বুজ। এর মধ্যে মেহরাব সংবলিত ৩২টি আর্চ শোভাবর্ধন করবে। এমনকি দেশের বর্তমানে সর্ববৃহৎ ঈদগাহ মাঠ হিসেবে পরিচিত শোলাকিয়ার চেয়েও বড়ো হবে এটি।

দিনাজপুর গোর-এ শহীদ বড় ময়দান

শোলাকিয়া ঈদগাহে ঈদের জামাত

জমিয়াতুল ফালাহ ঈদগাহ ময়দান

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রামে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় জমিয়াতুল ফালাহ ঈদগাহ ময়দানে। প্রতিবছর সকাল সাড়ে ৮টায় প্রথম এবং সাড়ে ৯টায় দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের বৃহৎ এ ঈদগাহ ময়দানে। এখানে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, মেয়রসহ নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নিয়ে থাকেন। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নগরীর সার্কিট হাউজের পেছনে ওয়াসা মোড়ে জমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে এই ঈদ জামাতের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এখানে প্রতিটি জামাতে প্রায় ৫০-৬০ হাজার মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উদ্যোগে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ঈদের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে সকালে ঈদের দুটি জামাত হয়। চট্টগ্রামে আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদ, এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, পলোগ্রাউন্ড ময়দান, সিলেটের শাহ জালাল দরগাহ প্রাঙ্গণ, খুলনার শহীদ হাদিস পার্ক এবং রাজশাহীর শাহ মখদুম দরগাহ মাঠে ঈদের বড়ো বড়ো জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এসব ঈদ জামাতে অংশগ্রহণ করার জন্য অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে আগমন করেন। এছাড়া দেশের সকল জেলা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ঈদ জামাতের জন্য ছোটোবড়ো ঈদগাহ রয়েছে। ঈদ জামাত উপলক্ষে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় এসব ঈদগাহ ময়দান বর্ণিল সাজে সজ্জিত করা হয়। জামাত শেষে দেশের শান্তি সমৃদ্ধি ও বিশ্বশান্তি কামনা করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করা হয়। ঈদ জামাতে অংশগ্রহণ করা ঈদের আনন্দের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

অসুখ

সুধীর কৈবর্ত

আমার মন যে পাপড়ির মতো নরম না, তা আমি বেশ বুঝতে পারি। আমার চেতনায় হুল আছে। সেই হুল ফুটাতে গিয়ে অন্যকে যেমন কষ্ট দিয়েছি, তেমনি নিজেও পেয়েছি যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে ঘর ছেড়েছি। আপনজন ছেড়ে হয়েছি বিবাগি। আপন আবাস ছেড়ে এখন বসবাস এখন গভমেন্টের এই হাসপাতালের চার নম্বর ওয়ার্ডের পনেরো নম্বর বেডে।

– আর আসবি না! কেন! কেন আসবি না? আমি এসব বলছি বলে? – জানিস টুম্পা, তুই না এলে সব কিছুই কেমন যেন নীরব- নিথর লাগে! অবশ্য, কখনো কখনো একটা অশরীরী কেমন যেন বোবা বোবা, আমার মুখোমুখি হয়। ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমার জীবনে একজন এসেছিল'। আমি তখন জিজ্ঞেস করি, 'সে কোথায়?'

নার্স আসে ওষুধ খাওয়াতে। অন্তরালে চলে যাওয়ার সময়টায় কেমন ব্যথিত ব্যথিত লাগে ওকে ! তখন নার্সের ওপর ভীষণ রাগ হয়। ওকে যা ইচ্ছে তাই বলে ফেলি। নার্স আমার খারাপ খারাপ কথা শুনেও বিরক্ত হয় না মোটেও। বরং হাসে। বলে, 'আপনি শিগগিরি সেরে উঠবেন। ঘরে ফিরে সুখী হবেন।' বোঝ, ঘরই যার নেই তার আবার ঘরে ফিরে সুখী হওয়া!

– আঃ টুম্পা ! তোর চোখে জল! এতটা ছিচকাঁদুনে তুইতো কোনো দিনই ছিলিস না ! দেখ, তুই মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছিস। অথচ আমার কোনো কষ্টই নেই। কোনো দুঃখও নেই। সেই ছেলেবেলায়, তখন দুর্গার সাথে চলতাম, খেলতাম, ভীষণ মনে পড়ছে, কোনো দুঃখ ছিল না। দুর্গার সাথে আমার সেই দিনগুলোর কথা কতবারইতো বলেছি তোকে। বল, বলিনি ? – দুর্গা আর শুদ্ধ, শুদ্ধ আর দুর্গা, এক মন , এক প্রাণ! দুর্গা আগে শুদ্ধ পিছে, দুর্গা পিছে শুদ্ধ আগে। আবার দুজনে পাশাপাশিও। ভোঁদৌড়। হাটে মাছের বাজারে গিয়ে তবে থেমেছি। কিছু সময় দাঁড়িয়ে কেনাবেচা দেখা। দুর্গাকে নিয়ে চলে যেতাম জিলিপি- মিষ্টির দোকানে। বড়শি, সূতা, শিষা কিনত দুর্গা, ভাগ থাকত আমারও।

– ওই কচি বয়সেই হুঁকা টানতো, বিড়ি ফুকত দুর্গা। লুকিয়ে-ছুপিয়ে কখনো বিড়িতে দু-এক টান আমারও দেওয়া হয়েছে। বাড়ির কেউ দেখতে, জানতে পেলে আমার অবশ্য রক্ষা ছিল না।

সন্ধ্যায় এক গানের আসর বসত ছোটো ঠাকুরদার ঘরে। দুর্গা থাকত, থাকতাম আমিও। গানের আসরে বসত আরো অনেকেই। বরেণদা তো গান গাইতে গাইতে প্রায় দিনই ভাবে পড়ে যেত। অচেতন পড়ে থাকত অনেকক্ষণ। দারুণ গাইতে পারত বরেণদা। ওর গলা ছিল সুরেলা মিষ্টি। একটার পর একটা গান চলতে থাকত। রাত বেড়ে চলত। এক ফাঁকে আমি ঘরে ফিরতাম। টুপ করে শুয়ে পড়তাম ঠাকুমার বাম পাশে।

–ভোরে ঘুম ভাঙত, ঠাকুমার গলায় 'উঠরে নন্দলাল, জাগরে গোপাল' কীর্তনের সুরে। বিছানা ছেড়ে উঠে চোখমুখ কচলিয়ে দে-ছুট দুর্গাদের বাড়ি। ঠাকুমা পেছন থেকে চ্যাঁচিয়ে ডাকতে থাকতেন, 'বেইন্নাশের বেইন্নাবালা না খাইয়া যাইছ না সুদ্দ। বালা অইত না কৈলাম...

– কে শোনে কার কথা । আমি তখন দুর্গাকে পাবার তালে । দুর্গা আর শুদ্ধ– দুজনে কত ধান আর পাটের চারা মাড়িয়েছি। বর্ষার পড়ন্ত বিকালে হাঁটুজল ভেঙে দুজনে হারিয়ে গেছি পাটক্ষেতের গভীরে। জাল পেতে ফিরে এসেছি। পরদিন সকাল সকাল আবার জল ভেঙে গিয়ে দেখেছি, জালে মাছ গেঁথে, সাপ গেঁথে...

– সব ভুলতে পারি, কিন্তু সেই একটি দিনের কথা কোনোদিনও না। দুর্গা আর শুদ্ধ মেঘনায় ভেলা ভাসিয়েছিল। কলাগাছের ভেলা। কিশোর বয়স, তখনও সাঁতার কাটতে শিখিনি। দুর্গা অবশ্য সাঁতার কাঁটায় ওস্তাদ। তো আমরা, আমি আর দুর্গা ভেলা ভাসিয়েছি। মেঘনার চরে আমাদের ভূমিতে চাষাবাদ চলছে, সেখানে যাব। দুর্গা বৈঠার কাজ চালাচ্ছিল একটা কাঁচা ডাল দিয়ে। নদীর মাঝখানটায় এসে গেছি , হঠাৎ করে দুর্গার হাত ফসকে ডালটা জলে পড়ে চোখের পলকে তলিয়ে গেল । আমি সাঁতার জানি না , দুর্গার অজানা না । ডালটা পড়ে যাওয়ায় ভয় পেতে পারি ভেবেই হয়ত দুর্গা আমার চোখে চোখ রেখে বাম হাতে চাপ দিয়ে বলেছিল, 'সুদ্ধ, ডরাইছ না কৈল!' দুর্গা পাশে, সত্যি বলছি , সেই পড়ন্ত বিকালে সাহস হারাইনি।

– দুর্গা বলত, আমরা একই তারিখে বিয়ে করব। ও কিন্তু কথা রাখেনি। বিয়ে করে ও দিব্বি ছেলেপুলের বাপ বনে গেছে। জানিস দুর্গার বউর আমি সম্পর্কে কী হই! সেবার মুক্তিযুদ্ধের পর প্রথম দেখছিলাম দুর্গার বউকে। কাকিমা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। হাসতে হাসতে তিনি বলেছিলেন, 'বউ, শুদ্ধ-দুর্গার বন্ধু। তোমার ভাসুর'। ছোটোখাটো সুন্দরী বউটি ঘোমটার আড়াল থেকে আঁড়চোখে দেখেছিল ওর ভাসুরকে। হাঁ...হাঁ... হাঁ...হো...হো...হো...

– জানিস টুম্পা , ওই যে গ্রাম, যার আঁতুড় ঘরে আমার জন্ম, ওর জন্য আমার কী যে টান, তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না । ছুটিতে বাড়ি গেলে আর ঢাকা আসতে চাইতাম না । বাবা-মাকে অনেক বলে-কয়ে এই নগরীর রঙিন জীবনের মেলারকম আয়োজনের প্রলোভন দেখিয়ে তবে ঢাকা নিয়ে আসতে হতো তাদের এই পুত্রধনকে। ঢাকা আসার পর ওই যে যাকে বলে নাড়িছেঁড়া টান, পেছন থেকে কেবলই টানত! যে টান বোধ করি আজও। – কিরে, তুই যে একেবারে চুপসে গেলি ! ব্যাপার কী?

– আচ্ছা টুম্পা, আমি যে লিখতে পারতাম, তোর মনে পড়ে ? ইচ্ছে করে আবার লিখতে লেগে যাই। অনেক কবিতা । অনেক গল্প। তারচেয়েও বড়ো উপন্যাস। অথচ বেশ জানি, আমাকে দিয়ে সেসব কিছুই হবার না।

– হেরে যাওয়া, মার খাওয়া মানুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখব আমি! কিন্তু কী করে! দেখছিস না, দুই হাতের আঙুলগুলো কেমন সিটিয়ে আছে। দুটো হাতই ভীষণ কাপে। তুই-ই বল, হাত এমন কাঁপলে কি লেখা যায়?

জানিস টুম্পা, স্নিগ্ধা যখন বুঝতে পারল, আমার শরীরে একটা জার্ম কাজ করছে, ও আমাকে এড়িয়ে চলতে থাকল এবং একদিন সরাসরি বলেই ফেলল, একটি জীবনের জন্য দুটি জীবন নষ্ট হতে দিতে ও পারে না । বড্ড ব্যথা পেয়েছিলাম। সেতারের প্রধান তারটাই ঝনাৎ করে ছিঁড়ে গেছিল, সেদিন থেকেই একটা যন্ত্রণা আমাকে কুরেকুরে খাচ্ছে!

– কে? ওঃ, সিস্টার ! সিস্টার তুমি এসে গেছ? আচ্ছা, টুম্পাকে হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি না কেন? ও কি চলে গেছে ?

– কী বলব ! টুম্পা নামের কেউ আসেনি! কেউই আসে না আমাকে দেখতে! আমার যে আপনজন আছে তা-ও এদের জানা নেই! আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম টুম্পা এসেছে । স্নিগ্ধাকে নিয়ে ওর অভিযোগের অন্ত নেই।

– না ওষুধ আমি খাচ্ছি না! কিছুতেই খাচ্ছি না ! বেশ বুঝতে পারছি।

আমাকে সারিয়ে তুলতে চাইছ ? কিন্তু আমার মস্তিষ্কের যে যন্ত্রণা, মনের অসুখ, হৃদয়ের ঘা– তার কী হবে সিস্টার! সিস্টার, তুমি বরং চলেই যাও। আজ আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে না। আমি চুপ করছি। আর কথা কইব না। জেগেও আর থাকব না। দারুণভাবে চুপ হয়ে যাব! শুধুই ঘুম আসছে ! কত গভীর হয়ে... ■

শান্তি ও মানবতায় ইসলাম

ম. মীজানুর রহমান

ইসলাম শান্তির ধর্ম। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সত্য এবং মানব উপকারী, যা কিছু মানবজীবন ধারণের সহায়ক ও শান্তির রক্ষক বা যা মানবিক সুখ ও শান্তির নিশ্চয়তা দান করে তাই-ই ইসলাম। ইসলামে সর্বপ্রকার মানবজীবন হননজনিত নাশকতা, সন্ত্রাস কিংবা জঙ্গি আচরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মানুষকে বাঁচানো, মানুষকে ভালোবাসাই হচ্ছে ইসলাম। মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ-অবিচার সেই কারণে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। হজরত মোহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে মানুষের প্রতি যে সুবিচার করে ভালোবাসার নজির রেখে গেছেন তা আজও বিশ্বনন্দিত। তাই মহানবি হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রশস্তি গেয়ে কবি লিখেন–

বিশ্ব মানবের মহানায়ক আল্লাহর রাসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হে মহামানব আল্লাহর রাসুল,
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানব কল্যাণে আবির্ভাব তোমার ।
তুমি অনন্য মহামানব– একথা নির্ভুল,
তোমার মাধ্যমে আল্লাহ স্বয়ং
বিশ্ব মানবের জন্য পাঠালেন যত সরল সত্য বাণী তাঁর–
আল কোরান। বিশ্বের এক জাতি–মানবজাতির সম্মান।
হে মহামানব আল্লাহর রাসুল,
তুমি মানুষে মানুষে করোনি কখনো কোনো ভেদাভেদ-ব্যবধান।
নর-নারীকে দিয়েছ সমান অধিকার।
তোমার অমৃত জ্ঞান-অভেদ তত্ত্ব মানুষে মানুষে,
আল্লাহর কাছে সকল মানুষ এক সমান।
সেই বৈষম্যবিহীন জীবনব্যবস্থার প্রবর্তক হে মহানায়ক।
জগতের সকল মানুষের সম অধিকারের হে অগ্রদূত,
তোমাকে লাখো সালাম। হে শান্তির মহানায়ক,
তুমি সমগ্র বিশ্বে মানব হৃদয়ে জ্বালায়ে গেছ সূর্য-চন্দ্রালোক।
তোমার ধর্ম ইসলামে মানুষে মানুষে
নেই কোনো সংঘর্ষ-সংঘাত।
তাই যারা ভুলপথে গেছে তাদের তুমি ফিরায়েছ সুপথে;
আল্লাহর নামে দিয়েছ শান্তির দাওয়াত।
ইসলামে রয়েছে মানুষে-মানুষে মানুষের ভালোবাসা,
আর আছে আলো আর আশা–
নেই ঘৃণা, নেই সংঘাত।
ইসলামে তুমি শেখায়েছো, 'তোমরা মানুষকে
ভালোবাসতে শেখো, দিওনা দূরে ঠেলে ফেলে,
আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীবকে বুকে টেনে নাও, করো নাকো অবহেলা।
আর মানুষে মানুষে কর কোলাকুলি,
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব যাও সব ভুলি
জীবনের এই অমূল্য ধন
কোনোমতেই করা যাবে না হেলা-ফেলা'।

মহানবি হজরত মোহাম্মদ (সা.) আমাদের শিখিয়ে গেছেন মানুষকে ভালোবাসতে। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোনো ব্যক্তিই মানুষের প্রতি অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার করতে পারে না। ইসলাম ক্ষমার ধর্ম। মহানবি সা. ইসলামের ইতিহাসে তার বহু নজির রেখে গেছেন। ইসলামে মানুষকে ভালোবাসার সেই অমূল্য সারকথা যেন আমাদের জীবনাচরণে মজ্জাগত হয় আর সেই শিক্ষাতে আমরা সকল মানুষ যেন আশৈশব আলোকপ্রাপ্ত হয়ে উঠি।

যে মানুষের নৈতিক জ্ঞানে মনেপ্রাণে মানুষের প্রতি অনুরাগ এবং আত্মীয়তার বন্ধন চির জাগরুক থাকে তিনিই সাদা মনের মানুষ হয়ে ওঠেন। এখানে সেই মানুষকে সকল দুষ্ট শয়তান তথা মানবতাবিরোধী অপশক্তিকে প্রতিহত ও পরাভূত করতে হবে ইসলামের সদাচরণ ও সাম্যের নৈতিক শক্তির সহায়তায়।

পবিত্র মসজিদুন নববি

ব্যক্তির মহানুভবতার মধ্যে ইসলামের ঐশী জ্যোতি প্রতিফলিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনীন মৌলিক জীবনাচরণের সহায়ক সমানাধিকার ও সুযোগ-সুবিধাদানকারী মানব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী চিরন্তন জীবনব্যবস্থার প্রতিভূ হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের এই মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে মহান আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে তাঁর জীবনের প্রতি পদে নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়েছে, প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু কখনো তিনি ইসলামের সরল-সত্য পথ থেকে সরে দাঁড়াননি। ইসলামের সহজ-সত্য-সরল পথে আত্মমুক্তির আহ্বান জানিয়ে গেছেন তিনি সর্ব মানবজাতির কল্যাণে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়– 'শুধু মুসলমানের লাগিয়া আসে নাই ইসলাম... ইসলাম এসেছে বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তির লাগি'...। সমসাময়িক ইতিহাসে হজরত মোহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং এর যে মাহাত্ম্য বিশ্বমানবতাকে দেখিয়ে গেছেন তা নজিরবিহীন।

মাইকেল এইচ হার্ট তাঁর গ্রন্থ 'THE HUNDRED'-এ বিশ্ববিখ্যাত ১০০ ব্যক্তিত্বের তালিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন বিশ্বনবি হজরত মোহাম্মদ (সা.) কে। তাঁর মতে, বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ (সা.) এই কারণে যে, তিনি একই সঙ্গে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠায় স্থান লাভ করেছেন সবার উপরে (সুপ্রিমলি সাকসেসফুল অন বোথ দ্য রিলিজিয়ন অ্যান্ড সেক্যুলার লেভেল্স্)। হার্ট আরো লিখেছেন, 'সামান্য অবস্থা থেকে উদ্ভূত মোহাম্মদ বিশ্বের মহত্তম ধর্মের প্রবর্তক এবং সর্বকুলব্যাপী সফল সক্রিয় শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা। আজ...তাঁর মৃত্যুর এতকাল পরেও তাঁর প্রভাব বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত।

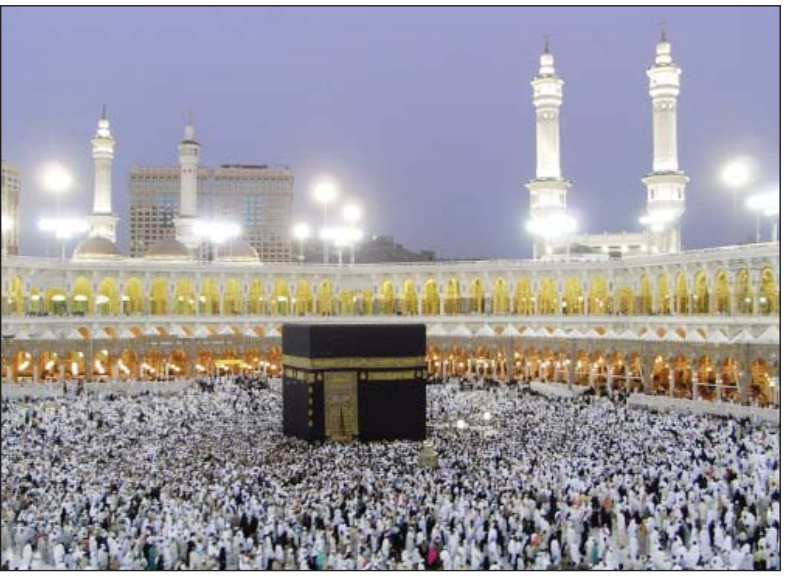

পবিত্র মসজিদুল হারাম

রাসুলুল্লাহ সা.-এর চরিত্রে অভিভূত হার্ট সংক্ষিপ্তাকারে রাসুলের জীবনী এবং ইসলামের সমসাময়িক বিজয়গাথা এতদ্‌সঙ্গে পরিবেশন করে নিজ বক্তব্যকে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

দক্ষিণ আরবের অনুন্নত এলাকা মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা তখন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা, শিক্ষা-সাহিত্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে অনুন্নত। মাত্র ছয় বছর বয়সে মোহাম্মদ (সা.) মাতৃপিতৃহীন অনাথ হন। অতি সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। তাঁর আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটে যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে ধনবতী খাদিজা (রা.)-কে বিয়ে করেন। ঐসময় অধিকাংশ আরবরা ছিল পৌত্তলিক। তারা বহু দেবদেবীর পূজারি ছিল। মক্কায় তখন অতি অল্পসংখ্যক ইহুদি এবং খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীর বসবাস ছিল। ছোটোবেলা থেকে মোহাম্মদ (সা.) উপলব্ধি করেন এক আল্লাহকে, যিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। চল্লিশ বছর বয়সকালে সেই এক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে সত্যধর্ম আল্লাহর একত্ববাদ (ইসলাম) প্রচারের ও প্রসারের নিমিত্ত নির্দেশ প্রাপ্ত হন। প্রথম তিন বছর তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্বজনদের মধ্যে এই নতুন ধর্ম প্রচার করলেন। অতঃপর প্রায় ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি জনসমক্ষে এই নতুন ধর্ম ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন। ধীরে ধীরে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করতে লাগল তখন মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁকে বিপজ্জনক উৎপাতকারী হিসেবে অভিহিত করল। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ (সা.) আত্মরক্ষার্থে মক্কা থেকে ২০০ মাইল দূরে উত্তরে মদিনা শহরে হিজরত করলেন। এখানে মদিনাবাসীরা আতিথেয়তার সঙ্গে তাঁকে দিলেন তাদের দেখভালের প্রভূত ক্ষমতা। তাঁর এই মদিনা আগমনকে 'হিজরত' অভিহিত করা হলেও এটাই ছিল নবি (সা.)-এর জীবনে রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরির মহাসুযোগ। মক্কায় তাঁর বেশ কিছু অনুসারী ছিলেন আর মদিনায় পেলেন আরো অনেক অনুসারী। তিনি হলেন সেখানকার সর্বময় কর্তা। পরবর্তী কয়েক বছরব্যাপী তাঁর অনুসারীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। এরমধ্যে বেশ কিছু যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে গেল মক্কা-মদিনার সঙ্গে। মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটল। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় আগমন করলেন নবি বিজয়ীর বেশে। নবি (সা.) জীবনের পরবর্তী আড়াই বছরকাল মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে নবধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেল। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসুল (সা.) ছিলেন আরবের দক্ষিণাঞ্চলের সর্বময় কর্তা।

মোহাম্মদ (সা.) সত্যধর্ম ইসলামে ঐসকল উপজাতীয় গোত্র একতাবদ্ধ করলেন আর এরাই একের পর এক যুদ্ধে জয়ী হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে বড়ো দুর্লভ ঘটনা।

আরবের উত্তর-পূর্বে ছিল বিশাল নব্য-পারসিক সাসানিদ সাম্রাজ্য আর উত্তর-পূর্বে বাইজান্টাইন বা কনস্টান্টিনোপল যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য। তাদের বিশাল সেনাবাহিনীর তুলনায় আরবদের কোনো তুলনা হয় না, তবু ইসলামের অনুপ্রেরণায় ক্ষুদ্র আরব বাহিনী অতি দ্রুত সমগ্র মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং পালেস্টাইন দখল করে নিল। তখন মিশর ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর এখানেই ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মূল কাদেশিয়া যুদ্ধে এবং ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে নেহাবন্দ যুদ্ধে পারস্য সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয় আরব মুসলিম বাহিনীর কাছে। আরবরা এত যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তাদের অগ্রাভিযান ক্ষান্ত হয়নি, আর এই সাফল্যের পেছনে ছিল নবি মোহাম্মদ (সা.)-এর নিকটতম বন্ধুস্বজন ও উত্তরসূরি আবু বকর (রা.) এবং উমর আল খাত্তাব (রা.)-এর সুযোগ্য নেতৃত্ব। তাই ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মুসলিম সেনাবাহিনী উত্তর আফ্রিকা হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর অবধি পৌঁছে যায়। এবার তারা দৃষ্টি ফেরায় উত্তরের দিকে এবং জিব্রাল্টার প্রণালি পাড়ি দিয়ে স্পেনের ভিজিগথিক সাম্রাজ্য অধিকার করে নেয়। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম সেনাবাহিনী সমগ্র খ্রিষ্টান ইউরোপ আয়ত্বে আনতে সমর্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে অবশেষে মুসলিমগণ বিখ্যাত 'টুওরস্'-এর যুদ্ধে ফরাসিদের হাতে পরাজিত হয়।

এতদসত্ত্বেও শতাব্দী ক্রম উত্তরণের বহু পূর্বেই আরব বেদুইন উপজাতীয় দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী কেবল এক মোহাম্মদ (সা.)-এর সত্য ঐশী বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একদিকে ভারতের সীমান্তবধি অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত সুদীর্ঘ এক রেখা টেনে নিয়ে গড়ে তোলে বিশালতম সাম্রাজ্য যা বিশ্ব ইতিপূর্বে আর দেখেনি। এসব অধিকৃত অঞ্চলের মানুষেরা দলে দলে নব্যধর্ম ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হতে লাগল। বিজিত রাষ্ট্রসমূহ ইসলামের আলোকে আলোকিত হলো। ইসলামের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যে ও মানবিক উদারতায় আকর্ষিত হলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। ভয়ভীতিহীন উদার এই ধর্মের আকর্ষণ এতই প্রবল যে মানুষ নির্দ্বিধায় ধর্মান্তরিত হতে লাগল। অধিকন্তু ইসলামে মানবিক মূল্যবোধ, সাম্য, দ্রুত ন্যায়বিচার, দ্রুত সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন, যুদ্ধবন্দির প্রতি দ্রুত ক্ষমা প্রদর্শন, মহানবি (সা.) এমন অবাধ মহানুভবতা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিরঙ্কুশ আকর্ষণে সমর্থ হয়। ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলাম হচ্ছে অবাধ গণতান্ত্রিক জীবনাচরণ ও জীবনব্যবস্থা। এখানে কোনো জাত বিদ্বেষের স্থান নেই।

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এখানে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ ইসলামে নিষিদ্ধ। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সামাজিক সম্প্রীতি, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং আপনজন করে নেওয়ার আত্মীয় বন্ধন– এ সবই ইসলামের মাহাত্ম্য। সত্য-সুন্দর ভালোবাসাই ইসলামের মূলমন্ত্র। এই কারণে ইসলামে সর্বপ্রকার মানবজীবন নাশকতামূলক কর্ম ও জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ইসলাম মানেই শান্তি। আর সে শান্তি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সাম্য, সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় সর্বজনীন।

লেখক: কবি, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক

আহসান হাবীবের কবিতায় মধ্যবিত্তের চালচিত্র

আজাদ এহতেশাম

ত্রিশোত্তর বাংলা কাব্যের উত্তরণ পরিক্রমায় আধুনিক কাব্য মনস্কতায় চিন্তাশৈলী ও ভাব-ভাষায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) সমকালীন সাহিত্যবোদ্ধাগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে যুদ্ধের ভয়াবহ অভিঘাতে সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিবর্তন আসে কবিদের চিন্তা-চেতনা, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের প্রবহমানতার দিক নির্দেশনাতে। কেবল ত্রিশোত্তর কাব্যধারার একজন বিশিষ্ট কবি আহসান হাবীব নন; সমকালীন কাব্যধারায় আত্মস্থ ও লীন হয়ে মধ্যবিত্তের গভীর জীবনবোধ ও সত্তার সংকটময় পরিস্থিতি তাঁর কাব্যভূমে প্রকটিত হয়েছে যা তাঁকে স্বতন্ত্র কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

টি.এস. এলিয়ট (১৮৬৫-১৯৩৯)-এর *ওয়েস্ট ল্যান্ড* (১৯২২) এবং ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারের (১৮২১-১৮৬৭) *প্যারিশ স্প্যালেন* (১৮৬৯), *দি ফ্লাওয়ার অব ইভিল* (১৮৫৭), *রিভিউ অব টু ওয়ার্ডস* (১৮৫৫) এবং *মিরর অব আর্ট* (১৮৫৫), কাব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যাঙ্গনে যে আধুনিকতার সূত্রপাত সূচিত হয়েছিল, ত্রিশের কবিরা সে ভাবধারায় কাব্য রচনায় ব্যাপকভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠে। কবিতার বিষয় ও প্রকরণে চিন্তা-চেতনার অনুধ্যানে আধুনিক বাংলা কবিতা বাঁক বদলে নতুনত্বের পথে অগ্রসর হতে থাকে। কবি আহসান হাবীব প্রবর্তিত নতুন ধারার অন্যতম একজন আধুনিক কবি। ড. হুমায়ুন আজাদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তিনি প্রথম প্রকৃত আধুনিক কবি।... আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* বের হয় ১৯৪৭-এ এবং এ কাব্যেই সর্বপ্রথম একজন মুসলমান কবি ব্যাপক বিশ-শতকি চেতনাসহ আত্মপ্রকাশ করেন'।

আহসান হাবীবের কাব্যের বিষয়বস্তুতে বর্ণিল বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হলেও একটি বড়ো অংশ বিস্তৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নানা সংকট ও টানাপড়েনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের চালচিত্র। তাঁর সংবেদনশীল কবি চিত্তের সংশ্লিষ্টায় সমকালীন যুগযন্ত্রণা, সামাজিক অস্থিরতা, মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, শ্রেণি বৈষম্য ও রাজনৈতিক অস্থিরতা, পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় মানুষে মানুষে অসাম্য ও অসংগতি তাঁর নিখুঁত তুলির আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো তাঁর কাব্যে তীর্যক ব্যাঙ্গাত্মক বাক্যাবরণে সমাজের অন্যায় ও অসংগতির চিত্র প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর কবিতার ভাষাশৈলী শান্ত, নিটোল, স্নিগ্ধ, কোমল ও অন্তরজাত নীরব রুদ্রতাহীন মায়াময় এক সুস্থিতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৈশ্বিক পরিবর্তনে এ দেশে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে মধ্যবিত্তের জীবনে নানা টানাপড়েন ও সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। এই শ্রেণির মানুষের জীবনসংগ্রাম, স্বপ্ন ও সম্ভাবনাময় জীবনের তীব্র আশাবাদের প্রতিচ্ছবি তাঁর কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে সহানুভূতিশীল চিত্তের প্রাখর্যে। মানুষের জীবন নিয়ত সংগ্রামশীল। প্রাপ্তির আশা ও প্রত্যাশাই গন্তব্যে পৌঁছানোর অনুঘটক। আশাই জীবন, জীবনের শ্রী, বেঁচে থাকার প্রেরণা ও কর্মোদ্দীপনার মূলমন্ত্র। মূলত আহসান হাবীবের কাব্যে মধ্যবিত্তের জীবন ও সংকটে নতুনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা এবং তীব্র আশাবাদের যে প্রতিফলন হয়েছে সে দিকটাই প্রবন্ধে দিকপাত হয়েছে।

জীবনের অশেষ স্বপ্ন ও সম্ভাবনা কখনোই পূর্ণতা পায় না; অপূর্ণতার ক্লান্তিবোধে ক্ষণিক বিরতি হলেও আবারও মানুষ নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। এভাবেই প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার দ্বৈরথে অস্থির মানবচিত্ত অনন্তকালাবধি কেবল অতৃপ্তই থেকে যায়। সম্ভাবনাময় স্বপ্নের প্রাপ্তিতে অস্থির মানব মন আবার উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আশা কখনো কখনো দুঃসহ বেদনা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অক্লান্ত যন্ত্রণাময় অনুভূতির দীর্ঘশ্বাস। কবির একান্ত উপলব্ধিতে তাই ব্যক্ত হয়েছে :

অশেষ আশার দিন পলাতক, আজও মিলায়নি ছায়া,

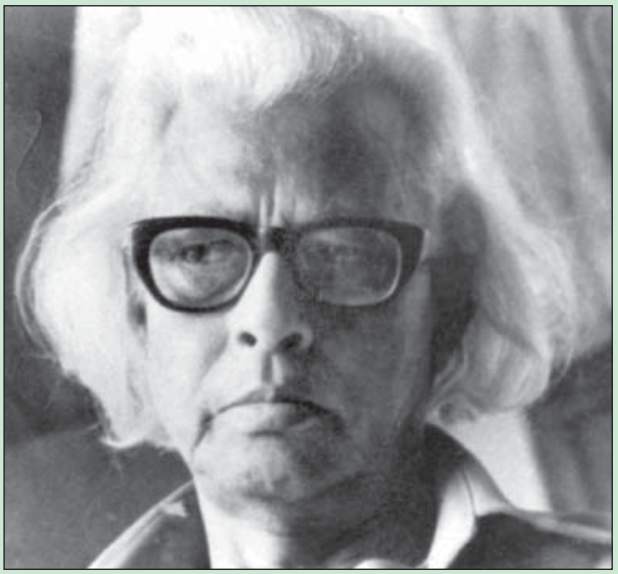

আহসান হাবীব

আজও দিগন্তে স্বপ্নের মতো তারই অপরূপ কায়া
স্মরণের তীরে তীর্যক হয়ে ক্লান্ত নয়নে কাঁপে
আজও এ হৃদয় দিনের আশাতে দুঃসহ দিন যাপে।
['এই মন- এ মৃত্তিকা', *রাত্রিশেষ*]

সময়ের পরিবর্তনে ভেঙে পড়ে মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্ন ও সম্ভাবনাময় কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ। নীতি-নৈতিকতার বিসর্জনে মানবিক মূল্যবোধহীন বিশ্বাসঘাতক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে সমাজের সর্বস্তরে। অর্থবিত্ত ও রাষ্ট্রক্ষমতার দৌরাত্ম্যে প্রতারক শোষক শ্রেণি গোটা সমাজব্যবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তোলে। তাদের অন্যায় ও অবিচারে অসহায় নিরীহ মানুষের আর্তনাদে আকাশ ভারী হয়ে ওঠে। সেখানে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, প্রেম-ভালোবাসা নেই, বেঁচে থাকার আশা ও আশ্বাস নেই, কেবল আছে নিরীহ দুর্বল কল্যাণকামী আত্মত্যাগী নীতিবান মানুষের পদে পদে লাঞ্ছিত হওয়ার শঙ্কা ও সম্ভাবনা। মানুষের এ নৈতিক স্খলনে মানুষ বর্তমানে ইতর প্রাণীর পর্যায়ভুক্ত উপলব্ধি করে কবির কাব্য পঙ্‌ক্তিতে হতাশার চিত্র ফুটে উঠেছে:

প্রত্যয়ের দিন নাই, প্রতিশ্রুতি বিদ্রুপ-বিক্ষত
আশা ও আশ্বাস নাই, প্রেম হেথা স্বভাব বণিক;
নির্মাংশ অস্থির পাশে ভীড় করি কুকুরের মত,
দীর্ঘদিন বাঁচি মোরা জীবনের নিত্য দিয়া ধিক!
['দ্বীপান্তর', *রাত্রিশেষ*]

প্রকট সামাজিক অবক্ষয়ে দিকভ্রান্ত মানুষ কয়েদির মতো বন্দি এ পৃথিবীর নির্মম কারাগারে। মানুষ হতাশা ও ব্যর্থতায় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো ডানা ঝাপটাতে থাকে। মুক্তির আশা সুদূর পরাহত, স্বাধীনতা যেন অপূর্ণ স্বপ্নের হাতছানির মতো মায়াময় মরীচিকা। বাঙালির অমিত শক্তি ও সাহসের অতীত ঐতিহ্য আছে– তারা সকল অন্যায়, অসংগতি ও পঙ্কিলতা মুক্ত করে নতুন দিনের সূর্য জাতির সামনে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ হবেই হবে। জাতির ভাগ্য ললাটের কলঙ্কময় অমানিশা ভেদ করে একদিন না একদিন রঙিন স্বপ্নময় নতুন সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদয় হবে। কবির সে বিশ্বাস ও প্রতীক্ষার চিত্র ফুটে উঠেছে :

আছে শুধু হাতের মশাল
আছে এই নগ্ন শির বিবর্ণ উলঙ্গ এই ভাল!
আমাদের রক্তে আছে পাদপিষ্ট রক্তের ছোঁয়াচ!
আমাদের অস্থি ঘিরে আছে এক নতুনের ছাঁচ।
আছে সেই অনাগত দিন
হাতে আছে সেই সূর্য-পরিক্রমা স্বপ্ন রঙিন।
['কয়েদী', *রাত্রিশেষ*]

কবিচিত্তের অনুধ্যানে কেবলই পরিদৃষ্ট হয় শান্তি সহযোগে মুখরিত কল্যাণময় এক স্বর্গীয় পৃথিবীর। কিন্তু সে প্রত্যাশার অপূর্ণতায় কবি কখনো হতাশায় উচ্চকিত নন। Margaret Mitchell-এর ভাষায় 'Life's under no obligation to give us what we expect.' অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতায় কবি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন সমাজ বিনির্মাণে

তাঁর চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। কবির বিশ্বাস রাতের অন্ধকার যতই গাঢ় হোক একদিন না একদিন তা ভেদ করে নতুন সূর্য পূর্ব আকাশে উদিত হবে। কবির গভীর আশ্বাস ফুটে উঠেছে :

রাত্রির আকাশ ঘিরে জেগে থাকে চাঁদ;
আশা জাগে ভাষা পাই মনে পাই গভীর আশ্বাস।
লিখি ইতিহাস
আগামী দিনের এক পৃথিবীর প্রাচুর্যের গান।
অনাগত মানুষের প্রাণ
পৃথিবীর পথে পথে দিয়ে যাই সহজে জাগিয়া
মনের মাধুর্য আর হাতের সবল মুঠি দিয়ে।
['জীবন', *ছায়াহরিণ*]

পরিবেশ ও পারিপার্শ্ব বিবেচনায় কবি অবক্ষয়িত সমাজের সহিষ্ণু সন্তান। নিত্য সংগঠিত মানবতার বিপর্যয়ে ও অপমানে তাঁর ব্যথিত কবিচিত্ত কখনো হতাশ হয়নি। সকল বিপর্যয় ও অসংগতি দূরীভূত হয়ে আগামীতে এ পৃথিবী পঙ্কিলতা মুক্ত হবে। শান্তি স্বস্তির স্পর্শে এ পৃথিবী আবার নতুন সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠবে। কবি এই দিনের প্রতীক্ষায় গভীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে আছেন। কবির কাঙ্ক্ষিত সে দিনের আগমনে স্বীয় জীবনাবসানেও ধন্য মনে করবেন এমনটিই তাঁর অন্তস্তলের কামনা:

আশৈশব পিপাসার প্রতিমায় এই অবক্ষয়,
এই নিত্য শেষ হওয়া মুছে যাওয়া এই অপমান
একদা সার্থক হবে পৃথিবীতে।
আসন্ন আগামীকাল
জন্ম দেবে সে অমর্ত্য অটল মহৎ প্রতিভার
আর
নতুন সূর্যের তাপে উষ্ণ হবে পৃথিবীর বুক
এবং আমার
মৃত্যুও মহৎ হবে।
['শুক্লপক্ষেয় গান', *ছায়া হরিণ*]

জীবন সব সময়ই সংগ্রামশীল; সংগ্রামের বন্ধুর পথ অতিক্রমেই সাফল্য এসে ধরা দেয় জীবনে। সংগ্রামবিহীন জীবন স্রোতহীন নদীর মতোই নিরানন্দময় ও বৈচিত্র্যহীনতায় স্থবির। পরিশ্রম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের সঞ্চয় সংগ্রহ করতে হবে। জীবন বৃথা নয়, জীবনকে ভালোবেসে পৃথিবীকে গড়তে হবে সুস্থ-সুন্দর জীবনের প্রত্যয়ে। Albent Einestein-এর ভাষায় 'The man who regards life as meaningless is not merely unfortunates but almost disqualified for life' কবিও জীবনকে ভালোবেসে পৃথিবীর অরণ্যের ছায়ার আশ্রয়ে নীড় বেঁধে স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন:

এতদিনে মনে হলো এখানেই বাঁধতে হবে নীড়,
মাটি থেকে তুলতে হবে অশেষ সঞ্চয়
অনায়াস জীবনের; পৃথিবীকে ভালবাসতে হবে
অনেক গভীর করে, সুন্দর সহজ করে
গড়ে নিতে হবে জীবনকে।
['পুনর্বাসন', *ছায়াহরিণ*]

জন্মভূমির প্রতি কবির প্রগাঢ় ভালোবাসা তাঁর অজস্র কাব্য পঙ্‌ক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জন্মভূমি কবির আশা ও বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল। তাইতো কবি হৃদয়ে লালন করেন গভীর ভক্তি ও ভালোবাসায় দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যের অতুলৈশ্বর্যতা। জন্মভূমি ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব বিপন্ন ও অকল্পনীয়। তাই কবির কাছে জন্মভূমি আত্মার চেয়েও অধিক গুরুত্ববহ।

'*তোমাতেই আশা রাখি আমার অবিনশ্বর জন্মভূমির*
অমথিত অটল রূপের
আর অবিনশ্বর ঐতিহ্যের।
আমার অমর আত্মা তোমাতেই বাঁচে
তাই তুমি বড়ো আমার আত্মার চেয়েও।
['আশা রাখি কেননা', *সারা দুপুর*]

মুক্ত দিনের নতুন আলোয় এ দেশ হবে একদিন শান্তি-সুখের শান্ত নিবাস। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঝড়ের অবসানে সুনির্মল আকাশে উদিত হবে নতুন সূর্য। মাঠে মাঠে ফলবে ফসল, ফুলে-ফলে শোভিত হবে দেশমাতৃকার অপরিমেয় স্নিগ্ধতার ঐশ্বর্য। মানুষের চোখেমুখে ফুটে উঠবে বেঁচে থাকার নতুন আশা ও সম্ভাবনা। কবি প্রিয়জনের জন্য নতুন দিনের আলোয় শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তুলে নতুন জীবনের আশ্বাস দিতে চেয়েছেন অকৃত্রিম ভালোবাসার হৃদবন্ধনে।

দেখে যাবো তোমার শীর্ণ চোখের কোলে
আলোর বন্যা
নতুন দিনের আলোয় নেয়ে
শীর্ণ দেহ জাগবে আবার
নতুন জীবন
নতুন প্রেমে,
এই আশাতে–।
['তোমার জন্য', *সারা দুপুর*]

আশাই জীবন, আশাহীন জীবন মৃত্যুর শামিল। তাই যতক্ষণ মানুষের জীবন থাকে ততক্ষণ আশাও থাকে। আশাই কর্মের প্রেরণা-জীবন সংগ্রামে বিজয়ের অনুপ্রেরণা। সংসারের অবিরত ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত মানুষ আশাতেই বেঁচে থাকে। আশার কখনো নিবৃত্তি ঘটে না অনন্তকালাবধি তার নিরন্তর প্রবহমানতা। Emily Dickinson-এর ভাষায় :

Hope is the thing with feathers
That perches in the soul
And sings the tune without the words
And never stops at all.'

শত বাধা-বিপত্তি চড়াই-উতরাইয়ে কোনোকিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষ কখনো বিরত হয় না। নতুন আলোর শিখায় একদিন না একদিন সে পৌঁছে যায় প্রত্যাশিত গন্তব্যের প্রান্তসীমায়। আহসান হাবীবের কবিতায় সে চিত্রই ফুটে ওঠে :

বিজন নদীর ঘাটে অন্ধকার!
আলোর পথে বিছায় কাঁটা কোন দুরাচার!
তবু আশার আলোর শিক্ষা নেভে না কার।
তার দু'চোখের আশার আলো উঠোন ভাঙে,
আলোর পথে যায় এগিয়ে ঘাটের গাঙে
ঘাটের পথে রোজ সে আলো উঠোন ভাঙে!
['কাহিনী নিরন্তর' *আশায় বসতি*]

আহসান হাবীব অনুভূতির তীর্যকতায় অনুভব করেছেন দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি। ধনী-নির্ধন সবাইকে হৃদয়ের বন্ধনে একত্র করে এ দেশটিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সবার সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় তিনি নতুন নতুন শহর ও গ্রাম বানাতে আগ্রহী। সেখানে মানুষে মানুষে থাকবে না কোনো বিভেদ ও বিভক্তি; থাকবে অনাবিল সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির অনায়াস ভালোবাসা। কবির অন্তরজাত সে উপলব্ধির আভাস :

সবাই মিলে
নতুন নতুন শহর গড়ব
নতুন নতুন গ্রাম বানাব
সবই নতুন
নতুন পথ আর নতুন বাহন
চলাফেলার এক ব্যবস্থা।
['আমার আমার', *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*]

ঈষৎ রোমান্টিকতার আবহ কখনো কখনো আহসান হাবীবের কবিতায় পরিদৃষ্ট। জীবনের স্বপ্ন-সাধ পূরণে প্রিয়জনের সান্নিধ্য ও ভালোবাসা সংগ্রামমুখর জীবনে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা স্বরূপ। তাই স্মৃতির অনুভবে প্রিয়জনকে দিতে চেয়েছেন কখনো ফুল, কখনো গজমতির হার আবার কখনো জীবন সঙ্গিনীকে রানি বানানোর ইচ্ছেও ব্যক্ত করেছেন:

তোমাকে আমার রানী করে নেবো এই সাধ ছিলো
তোমাকে আমার ঘরণী বানাবো এই সাধ ছিলো
মনে সাধ ছিলো সঙ্গিনী হবে সখের মেলায়
তুমি মেতে গেলে কালো অঞ্চলে
ভাত কুড়োবার মরণ খেলায়।
['প্রিয়তমাসু' *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*]

আহসান হাবীব জীবন ও কাল সচেতন একজন আধুনিক কবি। আধুনিক নাগরিক জীবনের নৈরাশ্য, হতাশা, ব্যর্থতা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংকটাপূর্ণ জীবনের চালচিত্র তাঁর লেখনির স্পর্শে অপূর্ব বাণীমূর্তি রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সংকট উত্তরণে বেঁচে থাকার নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা তাঁর কাব্যে পরিব্যাপ্ত। 'আশাই জীবন, জীবনের শ্রী' এই মূলমন্ত্রেই ঘুণেধরা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেঁচে থাকার স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে তিনি উচ্চকিত রেখেছেন গভীর মমতায়, আন্তরিকতায় ও ভালোবাসায়।

লেখক: কবি ও সমালোচক

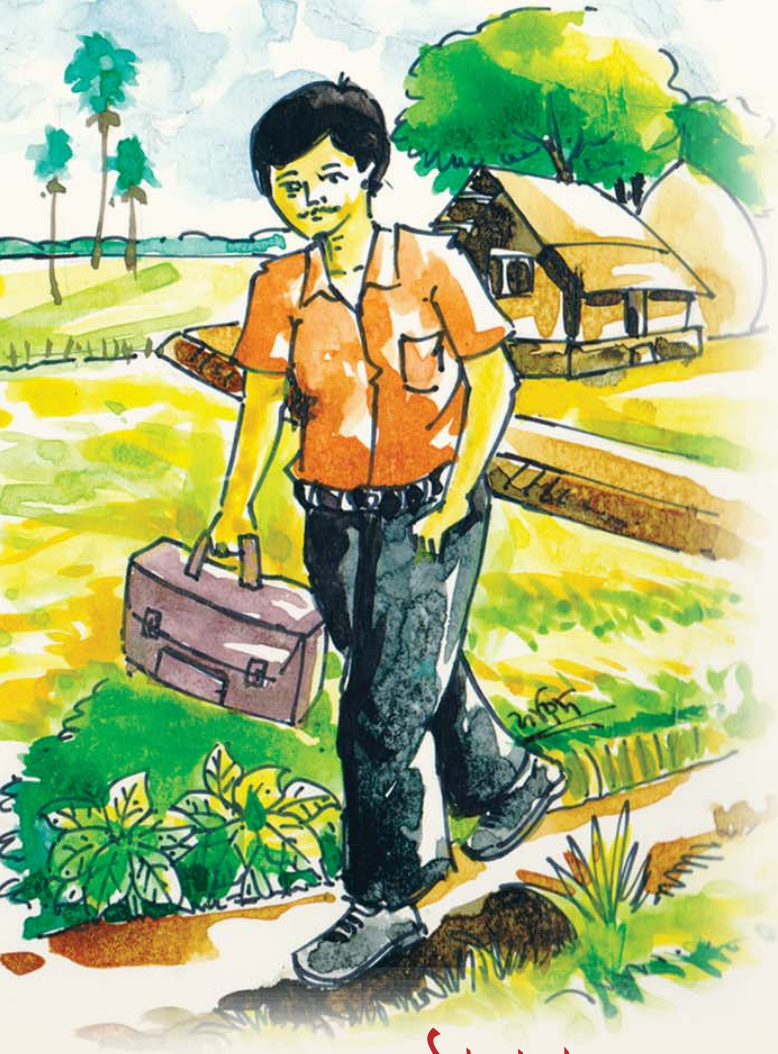

মেঠোপথ

সাদিকুল ইসলাম

আর কয়েক মিনিট, তারপর গাড়ি পৌঁছে যাবে মিঠাপুর। আমার প্রাণ, আমার গ্রামে। পিচঢালা পথের বাঁকে বাস যখন নীরব গতিতে চলছে আর ঠিক সে সময় এই সবই ভাবছিল পলাশ । সারি সারি গাছপালা, অদূরে মেঠোপথ, তার পাশে নানারকম লতাগুল্ম। আর আবাদি শস্যের সমারোহ। ঠিক এরই পাশে প্রবাহিত রামদিঘির বিল। যতদূর চোখ যায় প্রকৃতির মাঝে চোখ পেতে রাখে পলাশ। সে সময় কাকে যেন মুক্তমাঠের ভেতর দৌড়াতে দেখে। কে যেন অনাবৃত গায়ে হাতে ডাউস ঘুড়ি নিয়ে খাপছাড়া পাখির মতো ছুটছে। চেতনা ফিরতেই পলাশ বুঝতে পারে ওইটা ছিল তার হারানো শৈশব। যেটা অজান্তেই ভেসে উঠেছিল মনের পর্দায়।

বিকাল পাঁচটা । বাস ভূঁইয়া মোড়ে থামে। বাস থেকে নামার পর চেনা মুখগুলো দেখতেই আবেগে আপ্লুত হয় পলাশ। ছোটো অনেকের সাথে দেখা হয় তার। বড়োদের সালাম জানায়, কুশল বিনিময় করে অনেকের সাথে। তখন সবাই তার সম্বোধনের জবাব দেয় হাসিমুখে। সে হাসি বেহেশতি হাসি। পলাশকে দেখে খাঁন সাহেব এগিয়ে আসেন।

–কী ব্যাপার পলাশ। বহুদিন পর গ্রামের কথা মনে পড়ল বুঝি?

–হুম...।

–তা মিয়া বালা আছিলা?

–জি চাচা আপনাদের দোয়ায়।

–যাও বাবা এখন তাড়াতাড়ি বাড়িত যাও।

তাদের কথার ফাঁকে ফারু ও সজিব এসে হাজির। পলাশ আগেই অবশ্য ওদেরকে আসতে বলেছিল। তাকে দেখে তো ওরা দুজন খুশিতে আটখানা। যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। ফারু দৌড়ে গিয়ে পলাশের বুকে মুখ লুকাল। তারপর পলাশের মুখের দিকে কেমন যেন অভিমানী চোখ নিয়ে তাকাল।

–কিরে ফারু কী হয়েছে তোর ?

–আগে বাড়ি চল তারপর সব শুনবি, ফারু বলল।

ফারু পলাশের খুব নিকটতম বন্ধু। গ্রামে থাকতে একটা মুহূর্তও একজন আরেক জনকে ছাড়া চলতে পারত না। আজ ফারুর ঐরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলো পলাশ! তাহলে কি ফারুর সাথে কোনো অন্যায় কিছু হয়েছে তার! না, তা হবে কেন, তাহলে কি অন্য কেউ...। পলাশ শহরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তো সবকিছু ঠিক ছিল, যাওয়ার পর সবকিছু কেমন যেন বদলে গেছে। ফারু এখন আর আগের মতো হাসিখুশি থাকে না।

ফারু খুবই ভালো একজন বন্ধু পলাশের । গ্রামের মেঠোপথের মতো নরম হৃদয় তার। তাদের দুই বন্ধুর কথার ফাঁকে সজিব পলাশের ব্যাগপত্র সাইকেলে তুলে নিয়েছ। কী ব্যাপার সজিব?- হ্যাঁ ভাইয়া ভালো, পলাশের ছোটোবেলার ছাত্র সজিব। এখন আর তেমনটি নেই, অনেক বড়ো হয়েছে। তাই ভাইয়াকে দেখে এখনো লজ্জা পায় । পলাশ পিঠে হাত রেখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেয়। তারপর গাঁয়ের মেঠোপথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকে ওরা। মেঠোপথ দিয়ে যেতে যেতে চারপাশে তাকাল পলাশ। এই কয়েক বছরে মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতিও যেন বদলে গেছে। কী রূপ ছিল তার! এখন কী রূপ। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই পলাশ অবাক হয় গ্রামের মেঠোপথ ধুলিধূসর আর শুষ্ক মাটির পথ যেমন ছিল তেমনই আছে। তবে তার বাড়ির কাছাকাছি কিছু ইট রাখা হয়েছে। সামনেই রাস্তার কাজ শুরু হবে। এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল পলাশ। সময়ের সাথে কতই না পরিবর্তন হয়েছে, সব কিছুর তাই না ফারু। হুম, আর একটু যেতেই চোখ পড়ল খালের উপর মসজিদ। পাশেই খাল। তার পাশে ব্রিজ আর সারি সারি খেজুর গাছ। জ্যৈষ্ঠের তীব্র খরায় সব শুকিয়ে গেলেও শুকায়নি পাশের খালটি। প্রচণ্ড গরম পড়ায় এই বিকালে অনেকেই এসেছে বিলের ধারে। সবাই গোসল করে তাতে। ছেলে-বুড়ো সবাই। ওদের মধ্যে রকি, মাহবুব পলাশকে দেখে খাল থেকে মাছের মতো লাফিয়ে উঠে দৌড়ে ছুটে আসে। ভাইয়া কেমন আছেন? এক সঙ্গে বলতে লাগল তারা। চোখেমুখে তখন তাদের খুশির জোয়ার। গোসল করা বাদ রেখে পলাশের পিছু পিছু ছুটল। এভাবে যেতে যেতে এক একজন করে অনেকের সাথে দেখা হলো । হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো গ্রামের সব ছেলেমেয়ে পলাশের পিছু নিল। ওরা সবাই যেন তাদের হারানো ধন ফিরে পেয়েছে এমন। সত্যি পলাশ গ্রামে থাকতে এভাবে সবাইকে নিয়ে চলাফেরা করেছে।

দলবেঁধে ঘুড়ি ওড়ানো, পুকুরে সাঁতার কাটা, ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, বউচি, লুকোচুরি আরো কত কী। তাই তারা এখনো ভুলেনি তাকে। অদূরে মা শিমের পালায় কী যেন করছে। পলাশ পেছন দিক থেকে গিয়ে মায়ের চোখ চেপে ধরল। কিরে পলাশ মায়ের সাথে দুষ্টুমি করা হচ্ছে বুঝি? পলাশ অবাক হয়ে মুখ খোলে– মা, তুমি বুঝলে কী করে? ও তুই বুঝবি না। না মা, তোমাকে আজ বলতেই হবে? তাহলে বল দেখি, কারও দেহে প্রাণ ফিরে আসলে সেটা কে আগে বুঝবে? ক্যান যার প্রাণ সে! ওরে পাগল ছেলে তুই তো আমার প্রাণ। তুই কাছে আসতেই তো আমি বুঝে গেছি। তুই দূরে থাকলে যে এটাও আমার কাছে থাকে না। মায়ের কথা শুনে পলাশের চোখে পানি আসে। মাকে জড়িয়ে ধরে। তখন তার মনে পড়ে যায়, বাবা যখন ছোট্টবেলায় তাকে স্কুলে দিয়ে এসেছিল, তখন মাকে ছাড়া ভালো লাগেনি বলে কেমন দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরেছিল সেই দিনটির কথা।

এক সপ্তাহ গ্রামে থাকল পলাশ। ঘুরল গ্রামের সব মেঠোপথ। ও একা নয়, ওরা সবাই। এর মাঝে বন্ধু ফারুর একটা দোকানও করে দিল। পড়াশোনা ছেড়ে অলসভাবে বসে ছিল ফারু। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তাই শেষমেষ স্বল্প পুঁজির একটা দোকান দিয়ে শুরু করল সে। এবার ফিরে যাওয়ার পালা। শহরের ব্যস্তময় জীবন ছেড়ে এইটুকু শান্তির পরশ পেতে ছুটে এসেছিল গ্রামে। মন না চাইলেও আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। মা-বাবা, বন্ধুদেরকে বিদায় দিয়ে প্রধান সড়কে পা রাখে সে। যাবার সময় বার বার ফিরে তাকাল তাদের দিকে। একে একে সবাইকে ছাড়িয়ে সেই মেঠোপথ পাকা সড়কে পা দেওয়ার আগে বার কয়েক তাকাল। এই মেঠোপথেই তার সারাবেলা কাটত সাইকেল চালিয়ে। হয়ত আরেকবার এসে দেখবে সেটাও পরিবর্তন হয়েছে। তার বাবা এসেছিলেন এগিয়ে দিতে। বাবাকে সালাম জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে পলাশ। গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে মনে করতে থাকে কদিনের আনন্দের মুহূর্তগুলো। ■

ভ্রমণ কাহিনী

মীর সাহেব থেকে আমঝুপি

হুমায়ুন মুজিব

সেদিন শিলাইদহ থেকে ফেরার পথে একবার ঘুরে এলাম বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী ঔপন্যাসিক মীর মোশাররফ হোসেনের বাড়ি। কুমারখালীতে তাঁর বাড়ি। প্রধান সড়কের পাশেই সাইনবোর্ডে তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে মীর মোশাররফ হোসেনের বাড়ি। তীর চিহ্ন অনুযায়ী আমরা এক ভ্যানে করে সরু একটি রাস্তা দিয়ে বেশ অনেকখানি ভেতরে গেলাম। লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে ঢুকলাম বিষাদসিন্ধুর স্রষ্টা কালজয়ী এই লেখকের বাড়িতে। বাড়ি বলতে তাঁর সেই ভিটেয় এখন একটি প্রাইমারি স্কুল আছে। স্কুলটির নাম মীর মোশাররফ হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর আছে মীর মোশাররফ হোসেন জাদুঘর। আমরা অনুমতি নিয়ে জাদুঘরে ঢুকলাম। সম্ভবত লেখকের চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্মের একজন উত্তম পুরুষ বর্তমান জাদুঘরটির কেয়ারটেকারের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করে ঘুরে ঘুরে জাদুঘরটি দেখলাম। মীর সাহেবের প্রতিকৃতিসহ তাঁর ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসপত্র সেখানে সংরক্ষিত আছে। আছে তাঁর সহধর্মিণীর ছবি। সেখানে আরো আছে তাঁর জমিদারিতে ব্যবহার্য ঢাল-সড়কিসহ আরো বিভিন্ন জিনিসপত্র। তাঁর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিও সেখানে সংরক্ষিত আছে। সেখানে ঘুরে দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল বিষাদসিন্ধুর সেই কালজয়ী

নীলকুঠি, আমঝুপি

কাহিনির কথা। কারবালা প্রান্তরের কথা– যেখানে ইমাম হোসেন (রা.) ও তাঁর পরিবার এক ফোঁটা পানির জন্য কী হাহাকার করেছিল। ইয়াজিদের নিষ্ঠুর বাহিনী যাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। মাসুম বাচ্চা ও নারীদের জন্য এক ফোঁটা পানি দিতে তারা অস্বীকার করেছিল। শেষে নিরুপায় হয়ে বীর হোসেন (রা.) যখন তাঁর ঘোড়া ছুটিয়ে কুফার ময়দানে একাই তরবারি চালিয়ে ইয়াজিদ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফাঁকা ময়দানের পাশে ফোরাত নদীতে নেমে আজলা ভরে পানি তুলেও তা পান না করে ফেলে দিলেন। কারণ তাঁর শিশুপুত্র আসগর পানির অভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে এই কুফা প্রান্তরেই মৃত্যুবরণ করেছে। পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে আচানক একটি তীর এসে হোসেন (রা.)-এর কণ্ঠে বিদ্ধ হয়। তিনি লুটিয়ে পড়েন। তারপর নিষ্ঠুর সীমারের দ্বারা ইমাম হোসেনের শির কর্তন ও তাঁর শৈল্পিক বর্ণনা এবং লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে শহিদ হোসেন (রা.)-এর ছিন্ন মস্তক নিয়ে সীমারের যাত্রা, পথিমধ্যে তার জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের বর্ণনা– এসবই মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল। আর বাংলা সাহিত্যের সেই ক্রমাগত পরিপক্ক হয়ে উঠার কালে মীর সাহেবের প্রতিভাধর স্মৃতিময় অবদানের কথা স্মরণ করে সেই সময়টাও কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠল। সেসব ভাবতে ভাবতে এবং দেখতে দেখতে আমাদের যাওয়ার সময় হলো। জাদুঘরের কেয়ারটেকারকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

কুমারখালীর আর এক কৃতী সন্তান কাঙাল হরিনাথ। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ শাসিত ও জমিদার নিপীড়িত সেই সময়ে সাহসী সাংবাদিক যিনি মফস্বল সাংবাদিকতার অগ্রপথিক। মুদ্রণ সংকটের সেই সময়ে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে তিনি অসীম সাহস ও সাধনার বলে *গ্রামবার্তা* পত্রিকা প্রকাশ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। গ্রামবার্তা পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সমাজের অসংগতি ও অত্যাচারী জমিদারদের কুকীর্তি নির্ভীক প্রকাশ করতেন। তখনকার প্রেক্ষাপটে এ এক বিরল কর্ম। আমরা একটা ভ্যানে চড়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে নিভৃত এক গ্রাম্য পথের পাশে পেয়ে গেলাম কাঙাল কুটির। ছোটো একটা মরিচা ধরা সাইনবোর্ডে লেখা আছে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। পলেস্তারা খসে পড়া বহু পুরোনো জীর্ণ একটা দালান। দালানের বারান্দায় বেশ কয়েকটি ছাগল বাঁধা রয়েছে। তাদের মলমূত্রের গন্ধে জায়গাটায় দাঁড়ানো মুশকিল। কর্দমাক্ত সেই পথ পেরিয়ে বাড়ির সামনে গিয়ে একটু উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলাম–বাড়িতে কেউ আছে কি-না। কিছুক্ষণ ডাকার পর এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি গীতা মজুমদার–কাঙাল হরিনাথের প্রপৌত্র অশোক কুমার মজুমদারের স্ত্রী। আমাদের পরিচয় পেয়ে কাঙাল হরিনাথের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে আসার কথা শুনে সেই জীর্ণ কুটিরের তালা খুলে ভেতরে নিয়ে গেলেন। বহু পুরোনো, অব্যবহৃত, মরিচা ধরা সেই মুদ্রণ যন্ত্রটি সেখানে রাখা আছে। এই প্রেস থেকে ছাপা হতো সেকালের জমিদার ও কিছু কিছু ইংরেজ কর্মকর্তাদের পিলে কাঁপানো মফস্বল পত্রিকা *গ্রামবার্তা*। প্রেসটির নাম এম এন প্রেস। হরিনাথ তাঁর অকাল প্রয়াত বাল্যবন্ধু মথুরানাথ– এর স্মৃতি ধারণ করে তাঁর প্রেসটির নামকরণ করেন এমএন প্রেস। প্রেসটি এবং কাঙাল কুটির–এর অযত্ন–অবহেলা দেখে বিস্মিত হতে হয়। যেসব মনীষী সমাজকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করার জন্য জীবনপাত করে গেছেন, যারা বিরূপ সময়কে গণমানুষের অনুকূলে প্রবাহিত করার জন্য আজীবন সাধনা করে গেছেন– লড়াই করেছেন অসুরবিনাশী পণে তাদেরকে যদি আমরা বিস্মৃত হই এবং যথাযোগ্য সম্মানে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হই তবে এই সমাজ, এই জাতি কিসের ওপর দাঁড়িয়ে মহান ভবিষ্যতের দেখা পাবে। কাঙাল কুটির–এর পরিত্যক্ত প্রায় অবস্থা দেখে স্বভাবতই এসব প্রশ্ন জাগে। কাঙাল একদিন এই বাড়িতেই বাস করতেন। এখানেই জীবনসন্ধ্যা এসেছিল তাঁর। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি ছবিতে ইন্দির ঠাকরুলের শেষ যাত্রার সেই গানের কথা মনে পড়ে গেল– 'হরি দিনতো গেল– সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে'। গানটি কাঙাল হরিনাথের। গানটির চিত্রকল্প মনের মধ্যে রেখে কেমন যেন এক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে কাঙাল হরিনাথের প্রপৌত্র বধূ গীতা রানী মজুমদারের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম কাঙাল কুটিরের আঙিনা থেকে।

সেই বিকেলে রিকশা করে আমরা পৌঁছলাম ইনসান ভাইয়ের বাসায়। বিশ্রাম নিয়ে একটু রাত হলে আমরা বের হলাম হোটেলের উদ্দেশে।

হোটেলে খাওয়ার পর ইনসান ভাইকে বললাম– চলেন একটু শ্মশান থেকে ঘুরে আসি। বেশ অন্ধকার শ্মশান এলাকা। প্রচুর গাছপালার কারণে আরো গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে শ্মশান পাড়ের পথ দিয়ে চললাম আমরা তিনজন। শ্মশানের পাশেই গড়াই নদী। শ্মশানঘাট থেকে কিছুটা পূর্ব দিকে যেতে হয়। গড়াই এখন পলি জমে জমে অনেক ছোটো হয়ে গেছে। অনুমান করি দূর অতীতে এই শ্মশানঘাট হয়ত নদীর পাড়েই ছিল। শ্মশানঘাটেই হয়ত ঢেউ এসে আছড়ে পড়ত। সেই নদী এখন দূরে সরে গেছে। শ্মশান তার জায়গাতেই রয়ে গেছে। আমরা নদীর পাড়ে বাঁধের ওপর গিয়ে বসলাম। বাঁধ থেকেও নদী কিছুটা দূরে সরে গেছে। আকাশে তারা আছে চাঁদ নেই। জনমানব শূন্য। একটু দূরে নদীর চরে কিছু গাছ যেন ঘুম ঘুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদ আর আশপাশে গাছপালা না থাকায় ওপাশে প্রশস্ত–শান্ত নদীর জলের ওপর যেন অন্ধকার ফিকে হয়ে ঝুলে আছে। দৃষ্টি অনেক দূরে যায় কিন্তু অস্পষ্ট। নদীর ওপারে দূর গ্রামের দিকে শুধু কালো একটা রেখা দেখা যায়। শ্মশানঘাটের এই ভূতুড়ে পরিবেশে এই সময় যদি একা আসতাম তবে নিশ্চিত আমি ভয়ে অসাড় হয়ে যেতাম। দূরে দেখলাম চরের দিক থেকে একটা শিয়াল অথবা কুকুর দৌড়ে আসছে। আবছা আলো–আধারিতে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। দেখে মনে হয়, অতিপ্রাকৃত কোনো অশরীরী আত্মা দৌড়ে আসছে এদিকে। আমি খুব সতর্কভাবে কাউকে কিছু না বলে সেদিকে চেয়ে রইলাম। সে কিন্তু বেশিদূর এগোল না। সামনের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ আরেক দিকে গিয়ে কোনদিকে যেন উধাও হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের কথা মনে পড়ল। কিন্তু আমি তো আর শ্রীকান্ত নই। শরৎ বাবু তো নই–ই। ইনসান ভাইকে বললাম, চলেন যাওয়া যাক। রাত অনেক হয়েছে। কাল আবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। সকাল সকাল রওনা দিতে হবে। মনের ভেতর যা তা মনেই রইল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে লালন আখড়ার সামনের মাঠের ভেতর দিয়ে এগোলাম। আখড়ার সামনের রাস্তা দিয়ে গেলে কিছুটা বেশি হাঁটতে হয়। আমরা মাঠের পেছন দিকের দেয়াল টপকিয়ে সোজাসাপটা পথে ইনসান ভাইয়ের বাসায় পৌঁছলাম। বাসার ছাদে খোলা হাওয়ায় তিনজন বসে গল্পগুজব করলাম বেশ কিছুক্ষণ। ইনসান ভাই নানাবিধ কাজ এবং গবেষণা করেন। চন্দন গাছসহ নানান ঔষধি গাছের ছোটোখাটো নার্সারি রয়েছে তার বাসার বারান্দায়। তিনি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। বিদ্যুৎ উৎপাদন কীভাবে সহজে কম খরচে বেশি পরিমাণে করা যায়– সে আইডিয়া নিয়েও তার কিছু লেখা আছে। ধর্ম ও দর্শন বিষয়েও পঠনপাঠন এবং লেখালেখি আছে। এ বিষয়ে তার একটি প্রকাশিত পুস্তিকাও আছে– তাহলো *আল কুরআনে ইব্‌রাহিম*। তিনি একজন ভাস্কর্য শিল্পীও। আরো কয়েকজন ভাস্কর বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি লালন শাহের একটি ভাস্কর্য তৈরি করেছেন এবং সেটা বিক্রির চেষ্টা করছেন। এসব নানান বিষয়ে তার সাথে আলাপ হলো। রাত ক্রমেই গভীর হচ্ছে। রাতের তারার দিকে চোখ রেখে আঁধার মেশানো আলোর আতিথ্য গ্রহণ করে ঘুমাতে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যথারীতি একটি ঘরোয়া হোটেলে নাস্তা। চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া। টেবিলের পাশে বেঞ্চ পাতা। মাটির গন্ধ পাওয়া যায় এসব জায়গায়। কোনো কৃত্রিমতা নেই। একজন আর একজনকে দেখে কোনো পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিষয়ের উল্লেখ করে ঠাট্টা করছে। সেও তেমনি। সবাই সবার কাছাকাছি। আমরা সেখানে নাস্তা সেরে উঠলাম। আমরা রিকশায় করে গেলাম কুষ্টিয়া বাসস্ট্যান্ডে। আমাদের গন্তব্য মেহেরপুর মুজিবনগর। একটা বাসে চড়ে বসলাম। গ্রামবাংলা এত সুন্দর। সবুজের বুক চিরে চলে যাওয়া রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সবুজের সমুদ্রের অবগাহন করতে করতে এক সময় মেহেরপুর পৌঁছলাম। সেখান থেকে একটা অটোরিকশা ভাড়া করে একেবারে মুজিবনগর। বৈদ্যনাথ তলা। এই সেই আম বাগান। এখানেই ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন হয়, যাদের নেতৃত্বে পরবর্তীতে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মলাভ করে। সাজানো সারিবদ্ধ অসংখ্য আমগাছ বেষ্টিত শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়াপথে হেঁটে হেঁটে আমরা সেই স্থানে পৌঁছলাম যেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল। দৃষ্টিনন্দন সেই মনুমেন্ট আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মনে হতে লাগল– একটা জাতির একটা স্বাধীন ভূখণ্ড সৃষ্টির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল যে স্থানে, সেই স্থানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কবিগুরুর সেই– 'ও আমার দেশের মাটি/তোমার পরে ঠেকাই মাথা' মনে হতে লাগল। সত্যিই যেন মাথা ঠেকাতে ইচ্ছা করছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান স্থানের অনতিদূরে আরেকটা বিরাট স্থাপনা তৈরি করা আছে বাংলাদেশের মানচিত্রের আদলে। সেখানে আবহমান বাংলার প্রকৃতির পরিচয় সংবলিত স্থাপনার দৃশ্য মন কাড়ে। স্থাপনা দেখার জন্য ঘুরানো সিঁড়ি তৈরি করা আছে বেশ উঁচু পর্যন্ত। সেই সিঁড়িতেও আমরা চড়লাম। একেবারে কাছেই ভারতের বহরামপুর। কী সুন্দর এই দেশ– এই বাংলা। এই স্থাপনার পাশেই আর একটি স্থাপনা। এখানে সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের নেতৃবৃন্দসহ অনুষ্ঠানের ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে। মনে হচ্ছে এই এখনই তারা শপথ গ্রহণ করেছেন। আমরা সেসব দেখে বৈদ্যনাথ তলার এই নিভৃত নিকুঞ্জ ত্যাগ করলাম। ফেরার পথে ফিরে ফিরে তাকালাম। মনে হচ্ছে আবার আসব এখানে, একটু বেশি সময় নিয়ে যেন প্রাণভরে এই ঐতিহাসিক স্থাপনার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে গেছে। আমরাও ক্ষুধার্ত। একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম। রোদে-গরমে আমরা কিছুটা পরিশ্রান্ত। সেখানে হাতে-মুখে পানি দিয়ে খেয়ে একটু তরতাজা হয়ে বের হলাম। এবার আমাদের গন্তব্য– আমঝুপি। এখানে নীলকুঠি আছে। একটা অটোরিকশা ভাড়া করলাম। আমঝুপি যেন সত্যিই নামকরণের সাথে মিল রয়েছে। অনেক আমগাছ এখানে। এখানে এসে দেখলাম সেই নীলকুঠি। নীলকরেরা এখানে বসেই প্রজাদের নিপীড়ন চালাত। কথিত আছে, এখানে বসেই লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে মীরজাফরের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে। সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই সিরাজ-উদ-দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির প্রান্তরে সিরাজ-উদ-দৌলার তথা বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। মুর্শিদাবাদ এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার শাসনভার কার্যত ইংরেজদের করায়ত্ত হওয়ার পর এই নীলকুঠি প্রজা নিপীড়নের কুঠিতে পরিণত হয়। নীলকুঠির বারান্দায় সেই কামানটিও রাখা আছে, যা পলাশির যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। নীলকুঠির আশপাশে আরো কিছু বাসভবন আছে– যেগুলোয় ইংরেজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা থাকত। আছে গোশালা, ঘোড়াশালা। আমরা সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নীলকুঠির পেছন দিকে আছে কাজলা নদী। কুঠি থেকে একটা বড়ো পাকা সিঁড়ি চলে গেছে নদীতে। সেখানে বসেও নদীর এবং সবুজের সৌন্দর্য বেশ উপভোগ করা যায়। আমরা সেসব দেখলাম। প্রদর্শনীর জন্য প্রতীক হিসেবে কুঠির পাশেই দেয়ালের ভেতরের দিকে কিছু নীলগাছ এখনো আছে। সেখান থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে চটকিয়ে দেখলাম সেটা কেমন। আমাদের সময়ও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তের শেষ প্রান্তে চলে গেছে। বাংলার অস্তমিত সূর্যের সেই অন্ধকার কালের এক অত্যাচারের কুঠি পেছনে ফেলে আমঝুপির অঙ্গন পরিত্যাগকালে বার বার মনে হতে লাগল–এভাবেই এক একটা স্থান কখনো কখনো সাদা-কালো অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

জলবায়ু পরিবর্তন শঙ্কিত পৃথিবী

আমিরুল হক

সমগ্র পৃথিবী এখন
জলবায়ু পরিবর্তনে শঙ্কিত।
এর ভয়াবহতা আতঙ্কে আজ আতঙ্কিত।
বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতায়
পৃথিবীর তাবৎ বরফ গলে আসে সাগরে।
উপচে পড়া জলরাশির
বাড়তি চাপের ধৃষ্টতায় সৃষ্টি হয় দুর্যোগ।
সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায়
সুনামির তোড়ে ভেসে যাচ্ছে সভ্যতার সকল নিদর্শন।
ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন, হারিকেন জলোচ্ছ্বাস অথবা শক্তিশালী
টর্নোডোর মতো বড়ো বড়ো
প্রাকৃতিক তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য।
কোথাও দাবানলের লেলিহান শিখায় ছারখার বনাঞ্চল,
কোথাও অনাবৃষ্টিতে সৃষ্ট খরায় পুড়িয়ে মারছে ক্ষেতের ফসল,
অতীষ্ট করে তুলেছে জনজীবন।
আবার কখনো অতিবৃষ্টি আর অকাল বন্যায়
প্লাবিত হচ্ছে ফসলের মাঠ, ঘাট, ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।
জানমালসহ সভ্যতার ঐতিহ্য একে একে ধ্বংসস্তূপে
চাপা পড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে অহরহ।
জলন্ত আগ্নেয়গিরির উদগীরণের গলিত লাভা
গড়িয়ে পড়ছে সমতলের বুকে।
তাই পৃথিবী এখন উত্তপ্ত।
জলবায়ুর এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী কে?
মানবসৃষ্ট অনিয়মের জের আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে
একবার কি ভাবতে পেরেছি আমরা?
বড়ো বড়ো উন্নত দেশের খামখেয়ালিপনার ভারে
নুয়ে পড়েছে অনুন্নত দেশগুলো।
আবহাওয়া আর জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব মেলাতে
ব্যস্ত পৃথিবীর ছোটো-বড়ো সব দেশ।
আজ আর ক্ষমতার দম্ভ নয় পরাশক্তির মহড়া নয়
শোষণ আর শাসন নয় পরিবেশ বিপর্যয় রোধে
হতে হবে সচেতন।
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে একযোগে
কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে
এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে।
মনে রাখতে হবে সমাধানে এর কোনো বিকল্প নেই।

বৃক্ষ মানুষ

বাতেন বাহার

তাবৎ মৌলিক সমস্যার সমাধান কিংবা
ভালোবাসার সাহসী প্রত্যয় থাকলেও
বৃক্ষের মতো গন্ধ ছড়ানোর ভাবময় কীর্তি
বা ফলবত ছায়ার আয়োজন
মনুষ্য জীবনের বন্ধুর সিঁড়ি পথে যথেষ্ট নয়!
কারণ– প্রাণ থাকলেও বৃক্ষ মানুষ নয়
স্থবির হয়ে থাকলেও মানুষ বৃক্ষ নয়।
তবে– বৃক্ষ মানুষ সমাজে সংসারে
চারিত্রিক গুণ ও বিশ্বাসের সুবাতাস ছড়িয়ে
ধন্য করে সমাজ সংসার।
তাই, বিধির বিধানে মানুষ মরলেও
বৃক্ষ মানুষ বেঁচে থাকে স্বীয় কীর্তির মাঝে
মন থেকে মনান্তরে অবিনশ্বর হয়
এ দেশে এ মাটির মহান স্থপতি
কীর্তিমান অমর কবির মতো।

ঋতু বদল

নাহার আহমেদ

হৃদয়ের খোলা অলিন্দে
তার যাতায়াত ছিল অবাধ।
কিন্তু ভালোবাসার চড়ুইটা
বাসাবাঁধতে পারল না সেখানে
মিথ্যে কিছু সন্দেহের কালো কাঁটার জন্য
সেখানে সকালে রোদ এখনো
স্নিগ্ধ আলো ছায়া ফেলে
মসলিন বাতাসের ঝিরিঝিরি পদচারণা
এখনো সেখানে দখিনার পরশ বুলায়
জীবনের ধারাপাতে ধীরে ধীরে
পরিবর্তন আসে, স্বাভাবিকতা মিছিলে
সহজে সেটা আত্মস্থ করাটা ছিল
নিঃসন্দেহে কষ্টকর।
বাস্তবতার পেন্ডুলামটা বড়ো বেরসিক
কঠিন প্রলেপ বুলাতে খানিকটা
সময় লেগেছিল বৈকি।
এখন মনে হয় কারোর জন্য
প্রহর গোনা নিছক ছেলেমানুষি বা
নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু না।

চাই পরিবেশ সুরক্ষায় অরণ্যানী

আবুল হোসেন আজাদ

আমার শৈশবে জলপাই জারুল নাটা
শিয়ালকাঁটার ছিল সবুজ অরণ্যানী
ছিল বিস্তৃত মখমলের সবুজ শস্যক্ষেত
ঘন বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া; গ্রামের সম্মুখ দিয়ে
বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনী কুমড়াখালী নদীতে গুরুপদ পাটনির
খেয়া পারাপার। অজস্র পাখির কলকাকলিতে
মুখর ছিল বৃক্ষের মগডাল সকাল-সন্ধ্যের আলোছায়ায়।

কালের খেয়ায় সবুজ পত্রপল্লব বৃক্ষের এখন দারুণ দুঃসময়
বন্যা-খরা-জলোচ্ছ্বাস-সাইক্লোন ছুটে আসে দৈত্যের মতো
আমরা অসহায় নির্বাক আমাদের কৃতকর্মে
বৈরী পরিবেশ ঠেলে দেয় অন্ধকার গহ্বরে
নেই বন্যপ্রাণী পক্ষিকুলের নীড় বাঁধার আবাসন
নেই ভোরে ঘুম ভাঙানো পাখির সেই মোহনীয় সুর।

আমাদের পরিবেশ আবার ভরে তুলি সবুজ অরণ্যানীতে
বৃক্ষাদির নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্যে গড়ে তুলি দেশ
শস্যক্ষেত ভরে যাক আবার ফসলে ফসলে
উঠোন কোণের শিউলির ডালে শিস দিয়ে যাক ভোরের দোয়েল
বাতাসে কেঁপে কেঁপে যাক বৃক্ষের সবুজ পত্রপল্লবেরা।

আবার সূর্য উঠুক নতুন আলো বিছিয়ে বৃক্ষের বিছানায়
পরিবেশ বিপর্যয় মাড়িয়ে নতুন আলোর ঠিকানায়
আমাদের ভুলে অভিশাপ আবার আশির্বাদের বরপুত্র হয়ে
ধরিত্রী সাজুক আবার সেই সবুজ মোহনীয় রূপে
তোমার আমার পশুপাখি জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষার জন্য
চাই পরিবেশ সুরক্ষায় অরণ্যানী।

একজন হুমায়ূন আহমেদ

লিটন ঘোষ জয়

মনের ভাবকে কথা, সুর ও তালের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করাই হলো গান। গান গণমানুষের কথা বলে। দেশ, মাটি ও প্রকৃতির কথা বলে। মানুষ মাটি থেকে উদ্ভূত সংগীত কণ্ঠে ধারণ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। সংগীতকলার তিনটি গীত, বাদ্য ও নৃত্য–এর অন্যতম হলো গীত বা গান।

পল্লিসংগীত, রাগসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, রামপ্রসাদী গান, অতুলপ্রসাদের গান, রজনীকান্তের গান, দ্বিজেন্দ্র গীতি ও আধুনিক বাংলা গান। গান সম্পর্কে অধ্যাপক আবুল হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'জন্ম, বিবাহ, আনন্দ, বেদনা এমনকি মৃত্যু– সবখানেই গানের আবেদন অপরিসীম।'

সত্যি তাই! সংগীত আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। গান আমাদের মনে অন্যরকম একটা প্রভাব ফেলে। যা অন্য কিছু থেকে আলাদা। গান মানুষের মনে সহজে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং গানের আবেদন মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

মোবারক হোসেন খান তার *সঙ্গীত দর্পন* বইটিতে লিখেছেন, সংগীতের মধ্যে একটা অগ্নি- শক্তিও নিহিত রয়েছে। সেই শক্তিতে নির্ভর করে চারণ কবি মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানেও সেই অগ্নি-শক্তির রূপ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁদের রচিত গান হতাশ জাতির মনে জাগ্রত করেছে আশার বাণী। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও সংগীত সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। মানব

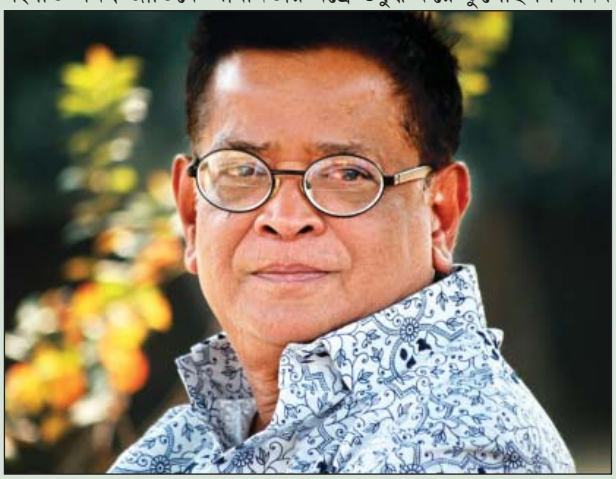

হুমায়ূন আহমেদ

জীবনে তাই সংগীতের ভূমিকা এবং প্রভাব সর্বকালেই বিদ্যমান।'

লালন শাহ ও হাসন রাজা বাউল গানের দুই অমর দিশারি। তাঁদের গানের আধ্যাত্মবাদের পরশ হৃদয়কে মথিত করে। আমাদের মনকে নিয়ে যায় গভীর চিন্তার সমুদ্রে। তাঁদের গানের আবেদন কোনোদিন শেষ হবে না! কেননা, ওইসব গানগুলো মিশে আছে মানুষের অন্তরে অন্তরে। প্রকৃতির শিকড়ে শিকড়ে। একই গান সময়, স্থান ভেদের পার্থক্যে এক এক সময় এক এক রকম লাগে। আপনি নিজেই তা বুঝতে পারবেন। যদি লক্ষ করেন। যে গান আপনি দুপুরে শুনছেন, সে গান যদি গভীর রাতে শোনেন তাহলে বুঝবেন তার তারতম্য কতখানি।

এবার আসা যাক, আরেকজন গান রচয়িতার কথায়। যাঁকে আমরা সাম্প্রতিককালে হারিয়েছি। যিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন সংগীতেও। নাটক, শিশু সাহিত্য, চলচ্চিত্র, গল্প, উপন্যাস, ছোটোগল্পসহ অনেক চরিত্র তাঁর সৃষ্টি। মিসির আলী এবং হিমু তার মধ্যে অন্যতম। লেখালেখির সব সীমানা ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। যার লেখনি জাদুর পরশে আমরা পেয়েছি *শঙ্খনীল কারাগার*, *নন্দিত নরকে*, *তুই রাজাকার*, *এইসব দিনরাত্রিসহ* অজস্র সৃষ্টি।

এই কলম জাদুকর শ্রদ্ধেয় হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর সাহিত্যের চৌম্বক টানের মতোই গানেও আমরা খুঁজে পাই জীবনের আবেদন। খুঁজে পাই বাউল মনের পরিচয়। আর সেই বাউল মনই হুমায়ূন আহমেদকে এনে দাঁড় করিয়েছে সংগীতে। হুমায়ূন আহমেদের গান প্রচলিত অন্য সব গান থেকে বেশ আলাদা– এ কথা বলতেই হবে। তাঁর গান বেশিরভাগ প্রকৃতিনির্ভর। প্রতিটি গানের উপমায় উঠে এসেছে ফুল, পাখি, পাহাড়, নদী, অরণ্য, মাটি, চাঁদ, তাঁরা–এমনকি আকাশের নীলও বাদ পড়েনি। যদিও তাঁর গানগুলোর জন্ম বর্তমান সময়ে। কিন্তু সৃষ্টি কখনো সময়ের মাপকাঠিতে বাঁধা পড়ে থাকে না। তাঁর গানের প্রতিটি শব্দ এত শক্তিশালী, এত মনোমুগ্ধকর– যা সময়ের প্রচলিত ধারাকে ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম উপমা অলঙ্করণ ভাবধারা।

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোনা মহকুমার কেন্দুয়ার কুতুবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়শা ফয়েজ। তাঁর পিতা একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পিরোজপুর মহকুমার এসডিপিও (SDPO– Sub-Divisional Police Officer) হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় শহিদ হন। তাঁর বাবা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করতেন। বগুড়ায় থাকার সময় তিনি একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থের নাম– *দ্বীপ নেভা যার ঘরে*। তাঁর মা'র লেখালেখির অভ্যাস না থাকলেও একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম– *জীবন যে রকম*। তাঁর অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবাল দেশের একজন বিজ্ঞান শিক্ষক এবং কথাসাহিত্যিক; সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আহসান হাবীব রম্য সাহিত্যিক এবং কার্টুনিস্ট। তাঁর রচিত উপন্যাস থেকে জানা যায় যে, ছোটোকালে হুমায়ূন আহমেদের নাম রাখা হয়েছিল শামসুর রহমান; ডাকনাম কাজল। তাঁর পিতা ফয়জুর রহমান নিজের নামের সাথে মিল রেখে ছেলের নাম রাখেন শামসুর রহমান। পরবর্তীতে আবার তিনি নিজেই ছেলের নাম পরিবর্তন করে হুমায়ূন আহমেদ রাখেন। হুমায়ূন আহমেদের ভাষায়, তাঁর পিতা ছেলে-মেয়েদের নাম পরিবর্তন করতে পছন্দ করতেন। তাঁর ছোটো ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবালের নাম আগে ছিল বাবুল এবং ছোটো বোন সুফিয়ার নাম ছিল শেফালি। ১৯৬২-৬৪ সালে চট্টগ্রামে থাকাকালে হুমায়ূন আহমেদের নাম ছিল বাচ্চু।

তাঁর বাবা চাকরি সূত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন বিধায় হুমায়ূন আহমেদ দেশের বিভিন্ন স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বগুড়া জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন এবং রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি পরে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন এবং প্রথম শ্রেণিতে বিএসসি (সম্মান) ও এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মুহসীন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন এবং ৫৬৪ নং কক্ষে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পলিমার রসায়ন বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি– *তোমাদের জন্য ভালোবাসা* রচনা করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। লেখালেখিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়

একসময় তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দেন। শিক্ষক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এই অধ্যাপক হুমায়ূন আহমেদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে একটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য জীবনের শুরু। যে উপন্যাসটির নাম ছিল– *নন্দিত নরকে*। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উপন্যাসটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭২-এ কবি-সাহিত্যিক আহমদ ছফার উদ্যোগে উপন্যাসটি খান ব্রাদার্স কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত বাংলা ভাষাশাস্ত্র পণ্ডিত আহমদ শরীফ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিলে বাংলাদেশের সাহিত্যামোদী মহলে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। *শঙ্খনীল কারাগার* ছিল তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। তাঁর রচনার প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো গল্প-সমৃদ্ধি। এছাড়া তিনি অনায়াসে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে অতিবাস্তব ঘটনাবলির অবতারণা করেন যাকে একরূপ জাদু বাস্তবতা হিসেবে গণ্য করা যায়। তাঁর গল্প ও উপন্যাস সংলাপ প্রধান। তাঁর বর্ণনা পরিমিত এবং সামান্য পরিসরে কয়েকটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে চরিত্র চিত্রণের অদৃষ্টপূর্ব প্রতিভা তাঁর ছিল। সকল রচনাতেই একটি প্রগাঢ় শুভবোধ ক্রিয়াশীল থাকে; ফলে নেতিবাচক চরিত্রও তাঁর লেখনিতে লাভ করে দরদি রূপায়ণ। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস মধ্যাহ্ন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে পরিগণিত। এছাড়া *জোছনা ও জননীর গল্প* আরেকটি বড়ো মাপের রচনা, যা কি-না ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বন করে রচিত।

তাঁর কথামালাতেই নতুন করে মাত্রা পেয়েছে বাংলার চিরচেনা সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ, ফুল, পাখি, পাহাড়, নদী, বৃষ্টি ও জোছনা। নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের গানেও আমরা খুঁজে পাই সেইসব উপমার ছোঁয়া। খুঁজে পাই তাঁর বাউল মনের পরিচয়। এই মানুষটি পরম আনন্দে এঁকে গেছেন চিত্রকর্মও। হুমায়ূন আহমেদের আঁকা ছবিতে বাংলার নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তেমনই তাঁর আঁকা চিত্রকর্মের নামকরণেও রয়েছে বাংলার প্রকৃতি, মাটি, জল ও মানুষের আবেগ। সবুজের ছড়াছড়ি, মেঘের ধূসর, কৃষ্ণচূড়া ও প্রজাপতির বর্ণিল রূপ। সবই যেন স্থান পেয়েছে তাঁর আঁকা চিত্রকর্মে। আর তারই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় প্রতিটি চিত্রকর্মের শিরোনামে। যেমন– মেঘের খেলা দেখে কত খেলা মনে পড়ে, এমন দিনে তারে বলা যায়, পুরানো সেই দিনের কথা, বৃক্ষের তন্দ্রা, ফাগুনেরও নবীন আনন্দে, দিনের শেষে, মেঘ বালিকা, কৃষ্ণচূড়ার কান্না, সুন্দরবন, ঝরঝর মুখর বাদল দিন, বন বালা, জলে কার ছায়া গো ? কার ছায়া জলে?, পুষ্প কথা, বাড়ি ফেরা, মধ্য দুপুর চিত্রকর্মই তার প্রমাণ। হুমায়ূন আহমেদ মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছেন সত্যি তা বিরল! কজনের ভাগ্যে জোটে এমন ভালোবাসা ? তিনি অজস্র কোটি মানুষের মন জয় করেছেন তাঁর সৃষ্টি দিয়ে। এখানেই একজন মানুষের সার্থকতা। মানুষের মন জয় করার মতো কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর আছে কি? আর সেই কাজটাই করলেন হুমায়ূন আহমেদ। তাই তো তিনি শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে দিয়ে হলেন একজন শিল্পস্রষ্টা, একজন নন্দিত কলম জাদুকর।

সাধারণত হুমায়ুন আহমেদ গান লিখতেন তাঁর নাটক কিংবা চলচ্চিত্রের জন্য। যদিও তাঁর নাটক প্রায় ১০০, গল্প, উপন্যাস ও ছোটোগল্পের বই ৩৬২, চলচ্চিত্র ৭টি। গানের সংখ্যা একেবারে সামান্য। তাতে কী ? এই কয়েকটা গানই ভাবিয়ে তোলে আমাদেরকে। পুলকিত করে আমাদের মন-প্রাণকে। এমনই নন্দনতত্ত্বের মিশেল রয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের কালজয়ী গানের সম্ভারে। হুমায়ূন আহমেদের লেখা গানগুলো এক নজরে পড়া যাক।

অডিও অ্যালবামের গান : না মানুষি বনে, কণ্ঠ : মেহের আফরোজ শাওন, 'না মানুষি বনে, অবাক জোছনা, সাতটা পাখি, কন্যা নাচিলরে, মেঘ মেদুর ছায়ায়, ওপেনটি বায়োস্কোপ'।

অ্যালবাম : যে থাকে আঁখি পল্লবে; 'চান্নি পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয় (কণ্ঠ : এস আই টুটুল), যদি মন কাঁদে চলে এসো এক বরষায় (কণ্ঠ : মেহের আফরোজ শাওন), চল না যাই (কণ্ঠ : এস আই টুটুল/মেহের আফরোজ শাওন), বৃষ্টিবন্দি (কণ্ঠ : এস আই টুটুল/মেহের আফরোজ শাওন), আমি আজ ভেজাবো চোখ সমুদ্র জলে (কণ্ঠ : এস আই টুটুল), তোমার ঘরের সামনে (কণ্ঠ : এস আই টুটুল/মেহের আফরোজ শাওন), রসিক বন্ধু (কণ্ঠ : মেহের আফরোজ শাওন), আমি অকৃত অধম (কণ্ঠ : মেহের আফরোজ শাওন), লাইলি মজনু (কণ্ঠ : মেহের আফরোজ শাওন)'।

চলচ্চিত্রের গানসমূহ হলো : 'বরষার প্রথম দিনে (কণ্ঠ : সাবিনা ইয়াসমিন/মোখলেসুল ইসলাম মিলু, চলচ্চিত্র : দুই দুয়ারী), সোহাগপুর গ্রামে (কণ্ঠ : সেলিম চৌধুরী, চলচ্চিত্র : দুই দুয়ারী), মাথায় পড়েছি সাদা ক্যাপ (কণ্ঠ : আগুন, চলচ্চিত্র : দুই দুয়ারী), কন্যা নাচিলরে (কণ্ঠ: মেহের আফরোজ শাওন, চলচ্চিত্র : দুই দুয়ারী), ও আমার উড়াল পঙ্খী রে (কণ্ঠ : সুবীর নন্দি, চলচ্চিত্র : চন্দ্রকথা), চাঁদনী পসরে কে আমারে স্মরণ করে (কণ্ঠ : সেলিম চৌধুরী, চলচ্চিত্র : চন্দ্রকথা), গরুর গাড়ির দুই চাকা (কণ্ঠ : এন্ড্রু কিশোর, চলচ্চিত্র : চন্দ্রকথা), কত না রঙে কত না ঢঙে (কণ্ঠ : রুনা লায়লা, চলচ্চিত্র : চন্দ্রকথা), মন্দলক্ষ্য নদীর তীরে সন্ধ্যাখালী গ্রামে (চন্দ্রকথা চলচ্চিত্রের অডিও অ্যালবামে বোনাস ট্র্যাক হিসাবে গানটি রয়েছে), একটা ছিল সোনার কন্যা (কণ্ঠ : সুবীর নন্দি, চলচ্চিত্র : শ্রাবণ মেঘের দিন), আমার ভাঙা ঘরে ভাঙা চালা (কণ্ঠ: সাবিনা ইয়াসমিন/মেহের আফরোজ শাওন, চলচ্চিত্র : শ্রাবণ মেঘের দিন), আইজ আমরার কুসুম রানির বিবাহ হইব (কণ্ঠ : আকলিমা বেগম, চলচ্চিত্র : শ্রাবণ মেঘের দিন), ওগো ভাবিজান (কণ্ঠ : বারী সিদ্দিকী, চলচ্চিত্র : শ্রাবণ মেঘের দিন), বাজে বংশী (কণ্ঠ : ফজলুর রহমান বাবু/শফি মণ্ডল, চলচ্চিত্র : ঘেটুপুত্র কমলা)'। আমার আছে জল (কণ্ঠ : মেহের আফরোজ শাওন/ সুমনা বর্ধন, চলচ্চিত্র : আমার আছে জল), বাদলা দিনে মনে পড়ে (কণ্ঠ : সাবিনা ইয়াসমিন/ হাবিব/কণা, চলচ্চিত্র : আমার আছে জল), লিলুয়া বাতাসে (কণ্ঠ : কুমার বিশ্বজিৎ/ এন্ড্রু কিশোর/আঁখি আলমগীর/কণা, চলচ্চিত্র : এক কাপ চা)'।

নাটক ও টেলিফিল্মের গানগুলো হলো : ঝুমঝুম ঝুমঝুম করে মেগা (কণ্ঠ : সুবীর নন্দি, ধারাবাহিক : উড়ে যায় বকপক্ষী), ঢোল বাজে, দোতরা বাজে, (কণ্ঠ : মমতাজ, ধারাবাহিক : উড়ে যায় বকপক্ষী), হাবলংয়ের বাজারে (কণ্ঠ : সুবীর নন্দি, নাটক : হাবলংয়ের বাজারে), যাই যাই সমুদ্রে যাই (কণ্ঠ : সেলিম চৌধুরী, নাটক : সমুদ্র বিলাস), চিকা মারো রে (কণ্ঠ : সেলিম চৌধুরী, নাটক : চিকা মারো রে)।

অন্যান্য গানগুলো হলো : এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে (কণ্ঠ ও সুর : কুদ্দুস বয়াতি), ঠিকানা আমার নোটবুকে আছে নোটবুক নেই কাছে (কণ্ঠ: কোনাল ও কিশোর, সুর ও সংগীত : ইমন সাহা, টেলিফিল্ম : যদি ভালো না লাগে তো মন দিও না), বাজলো বাজলো রুপার ঘণ্টা (কণ্ঠ : কুদ্দুস বয়াতি, সুর : ফেরদৌস হাসান, কুদ্দুস বয়াতির শিষ্য) ধারাবাহিক : রুপার ঘণ্টা'।

হুমায়ূন আহমেদের এই যে সৃষ্টি, এই যে অতুলনীয় গানগুলো আমাদের নিয়ে যায় গভীর থেকে হৃদয়ের গভীরতরে। হুমায়ূন আহমেদ আসলে লেখার হ্যামিলিয়নের সেই বাঁশিওয়ালা জাদুকর! লেখার প্রতিটি স্তরে স্তরে আপন মনে ছড়িয়ে গেছেন তাঁর জাদুর মহিমা। তাঁর গান যে শুধু শোনার বিষয়ই না বরং তা পড়ারও বিষয়। এক একটা গান যেন এক একটা শক্তিশালী গল্প। একটু ভালো করে লক্ষ করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। চোখের মণি কোঠায় হৃদয়ের গহীনে ভেসে উঠবে সেইসব গানের গল্প। নিত্য নতুন দৃশ্য ধারণ করে গান সাধারণত আমরা শুনেই থাকি! তা পাঠ করার মতো লোকের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি সংখ্যাও সামান্য। আমরা কজনই বা খবর রাখি কোন গানটা কে লিখেছে? কালজয়ী সব গানের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে এমনটা হওয়া আদৌ ঠিক নয়। একটা গানের সর্বপ্রথম শিল্পী সেই গানের লেখক বা গীতিকার। তারপর সুরকার, তারপর শিল্পী।

মহান এই শিল্পস্রষ্টা মানুষটিকে নিয়ে কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক এস আই টুটুল বলেন, 'শ্রদ্ধা নিবেদন করি প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদ স্যারের প্রতি। চিরদিন বেঁচে থাকুক আমাদের এই প্রিয় মানুষটি বরষার প্রথম দিন হয়ে, রুপালি জোছনা হয়ে'। তাঁর লেখা গানের কথায় বলতে চাই– 'যে থাকে আঁখি পল্লবে, তার সাথে কেনো দেখা হবে, নয়নের জলে যার বাস, সে তো রবে নয়নে নয়নে, তার সাথে কেনো দেখা হবে'। ২০১২ সালের ১৯শে জুলাই হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন না ফেরার দেশে। শিল্পস্রষ্টা হুমায়ূন আহমেদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গীতিকার

দুঃস্বপ্ন

সাহস রতন

গ্রীষ্মের দুপুর। সারা শহর সূর্যের তাপে জ্বলন্ত চুল্লির মতো হয়ে আছে। রাস্তার পিচ গলে গাড়ির চাকার সাথে লেপটে যাচ্ছে। একটু ছায়ার জন্য, একটু বাতাসের জন্য মানুষের সেকি আহাজারি! ওহ আল্লাহ এটা কী সূর্য না আগুনের কুণ্ডুলি!

দিন শেষে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরছিলাম। অভ্যাস বশত রেডিও অন করে পরচিত একটা এফএম স্টেশন টিউন করলাম। আমি শুনলাম, বাংলাদেশের বর্ডার ঘেঁষা লালমনিরহাটের দহগ্রাম এলাকায় তিনজন মানুষ কোনো এক অজ্ঞাত অসুখে মারা গেছেন। এবং কৌতুহল বশত তাদের মরদেহগুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য জেলা শহরের বড়ো হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিনই প্রায় দুই ডজনের বেশি মানুষ মরছে। ফলে তিনজনের মৃত্যুর খবরটা আমাকে তেমন নাড়া দিল না। কিন্তু পরদিন শুক্রবারেই ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। এলাকার মসজিদে জুমার নামাজ শেষে বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খাচ্ছি। টিভি অন করা। ঠিক তখনই একটা স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেলে আগের দিনের মৃত্যু বিষয়ে আরো একটা খবর শুনলাম। তারা শুধু এটুকুই বলল যে, মৃতের সংখ্যা তিনজন না। তিস্তার অপর পাড়ে ত্রিশ হাজার গ্রামবাসী অজ্ঞাত রোগে মারা গেছে! এই খবরটা শুনে আমি আঁতকে উঠলাম! এরপর স্থানীয় সবকটা নিউজ চ্যানেল চষে বেড়ালাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই বিস্তারিত কিছু জানাতে পারছে না। তবে এই রোগের কারণে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে এলাকা ছেড়ে যাচ্ছে এরকম খবর 'ব্রেকিং নিউজ' হিসেবে স্ক্রল করে দেখানো হচ্ছে বারবার।

পরের দিন যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম ততক্ষণে এই খবরটা সব পত্রপত্রিকা এবং নিউজ চ্যানেলের লিড স্টোরি বনে গেছে। কারণ এই রোগটি শুধু বাংলাদেশ না, পাশের মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এসব দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী সবাই এটাকে 'রহস্যজনক ফ্লু' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন, আমি এবং আমরা সবাই প্রার্থনা করছি, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আশা করি শীঘ্রই ওখানে মানুষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে। কিন্তু সবাই হতাশাগ্রস্ত, কীভাবে এই অজানা অসুখ আমরা মোকাবিলা করব! ঠিক এই সময়ই চীনের প্রেসিডেন্টের একটা মন্তব্য পুরো এশিয়াকে স্তম্ভিত করে দিল। চীন তাদের বর্ডার সিল করে দিয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, নেপালসহ অন্যান্য যেসব দেশে এই

অজানা ফ্লু দেখা দিয়েছে সেসব দেশ থেকে কোনো ফ্লাইট চীনে ল্যান্ড করতে দেওয়া হবে না। রাতে বিছানায় যাবার আগে আমি সিএনএন টিউন করলাম। একটু ঝিমুনি এসে আমার থুতনি যখন প্রায়ই বুক স্পর্শ করছিল ঠিক তখনই একটা নিউজ ক্লিপস দেখে সোজা হয়ে বসলাম। আমসত্ত্ব টাইপের চিমষে যাওয়া একজন মহিলা ফরাসি ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে একটা নিউজ দেখাচ্ছিল। অজ্ঞাত ফ্লু আক্রান্ত মাঝবয়সি একজন মানুষের মৃতদেহ ফ্রান্সের একটা হাসপাতালের বেডে পড়ে আছে। তার মানে এটা ইউরোপেও চলে এসেছে। এই খবরে গোটা ইউরোপ জুড়ে ভীষণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কান্না চেপে মৃতের স্ত্রী যেটুকু বলতে পারল তার মর্ম হলো– 'সপ্তাখানেক আগে হঠাৎ আমার স্বামী অসুস্থ হলো। প্রথম চারদিন অবিশ্বাস্য সব উপসর্গ দেখা দিল এবং আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে....' এটুকু বলেই সদ্য বিধবা মহিলা দুহাতে মুখ ঢেকে কান্না চাপলেন।

যুক্তরাজ্যও তাদের বর্ডার বন্ধ করতে চাইল কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সাউথ হ্যাম্পটন, লিভারপুল, নর্থ হ্যাম্পটন এরই মাঝে আক্রান্ত। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো আঘাত এল যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিলেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমেরিকার সব এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে যাওয়া কিংবা আসার সব ধরনের ফ্লাইট বাতিল করা হলো। যদি আপনার ভালোবাসার কেউ এই মুহূর্তে দেশের বাইরে থাকেন তবে আমি দুঃখিত। আমেরিকা এবং কানাডায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

যারা বিদেশে আছেন তারা কবে নাগাদ দেশে ফিরে আসার অনুমতি পাবেন– উপস্থিত সাংবাদিকরা এই প্রশ্ন করার পর হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র জানালেন, যতদিন পর্যন্ত না এই অসুখের সঠিক প্রতিষেধক আমরা খুঁজে পাচ্ছি। চারদিন ধরে আমাদের জাতি অবিশ্বাস্য ভয়ের গর্তে ডুবে আছে। সবাই বলাবলি করছে, এই ফ্লু যদি আমাদের দেশে ঢুকে পড়ে তবে আমাদের কী হবে? আর চার্চে ধর্মযাজকগণ বলছেন, 'এটা ঈশ্বরের তরফ থেকে একধরনের গজব।

পরের বুধবার রাতে আমাদের মহল্লার মসজিদে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হলো। আমি মসজিদ থেকে বেরিয়ে বাসায় ফেরার পথেই দেখলাম কয়েকজন দৌড়ে যেতে যেতে বলছে, রেডিও ধরেন, রেডিও ধরেন। মুসুল্লিদের মধ্যে কয়েকজন পাশের একটা চায়ের দোকানে এগিয়ে গেল। দোকানদার রেডিও অন করে একটা সাউন্ডবক্সের সাথে সংযোগ করে দিল যাতে আশপাশের সবাই মনোযোগ দিয়ে ঘোষণাটা শুনতে পারে।

দুইজন মহিলার মৃতদেহ পড়ে আছে এপোলো হাসপাতালের বেডে। এরা দুজনেই সেই অজ্ঞাত ফ্লু-এর আক্রমণে মারা গেছেন।

একঘণ্টার মধ্যে এটা জানা গেল যে, এই অজ্ঞাত ফ্লু ইতোমধ্যেই সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি বাসায় ফিরে টিভি অন করে সিএনএন ধরলাম। ইউএস রয়েল একাডেমি অফ সায়েন্স'র পরিচালকের বরাত দিয়ে স্ক্রলে ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে, পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করতে আমাদের ভ্যাকসিন দরকার, এখনই এবং অতিদ্রুত। নিরাপত্তা বাহিনীর পোষাক পরা একজন বলছেন, মানুষ দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে এই অজ্ঞাত ফ্লু-এর একটা প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না, কিছুই কাজে আসছে না।

নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, অরিগন, আরিজোনা, ফ্লোরিডা, ম্যাসাচ্যুসেটসসহ বিভিন্ন জায়গায় আতঙ্কগ্রস্ত মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ডার এলাকা থেকেও মানুষ গ্রেফতার করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ভীষণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কীভাবে এটা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে!

ঠিক এমন সময় আবার ব্রেকিং নিউজ, 'অজ্ঞাত ফ্লু'র কোড ভাঙা সম্ভব হয়েছে। প্রতিষেধক পাওয়া যেতে পারে। ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হবে। তবে এটা করার জন্য যেখান থেকে এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে সেখানে এমন একজন মানুষকে দরকার যে এখনো এই রোগে আক্রান্ত হয়নি। কাজেই আক্রান্ত দেশগুলোর সব প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জরুরিভাবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে বলা হলো। সবাইকে আহ্বান করতে হবে এই বলে যে, আপনার নিকটস্থ হাসপাতালে গিয়ে আপনার রক্তের নমুনা জমা দিন। যখন আপনার আশপাশে সাইরেনের শব্দ শুনবেন, সাথে সাথেই নিকটস্থ হাসপাতালে চলে যাবেন। সেখানে ডাক্তারকে আপনার রক্তের নমুনা নিতে বলুন। আর আপনি যখন যাবেন তখন শিউর হয়ে নিন যে আপনার প্রতিবেশীও সেখানে গেছেন। কেউ যেন বাদ না যায়।

বৃহস্পতিবার সকালে নাস্তা সেরে আমি খুব কড়া একটা কফিতে চুমুক দিচ্ছিলাম। একটু রিলাক্স দরকার ছিল। গত কদিন থেকেই একটা আতঙ্কের মধ্যে আছি। আজ বউয়ের সাথেও তেমন একটা কথা হয়নি। কিন্তু মাত্রই একটা চ্যানেলে এই অ্যানাউন্সমেন্টটা শুনে খুব চিন্তিত হলাম। পাশাপাশি একটু আশাবাদীও হলাম। আমেরিকা থেকে একদল বিজ্ঞানী বাংলাদেশে আসছেন। কারণ তারা বলেছেন, এই ফ্লু প্রথম যে দেশ থেকে ছড়িয়েছে সেখান থেকেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু রক্তটা হতে হবে তার যে এখনো এই অজ্ঞাত ফ্লু দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। আমি মনে মনে ভাবলাম, আশা করি এটা আমি, আমার স্ত্রী কিংবা সন্তান হবে না। তবুও আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করছিলাম আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য। আমি সারারাত ঘুমাতে পারিনি। মসজিদে আরো অনেকের সাথে রাতভর প্রার্থনা করেছি, হে প্রভু রক্ষা করো আমাদের, রক্ষা করো। এই গজব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাড়া-মহল্লায় সম্মিলিতভাবে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। আমি প্রার্থনা এবং নামাজ শেষে সূর্যোদয়ের সময় বাসায় ফিরলাম। কোনো কিছুই ভালো লাগছিল না। অফিস যাওয়ার কথা একবার মাথায় এল। কিন্তু পরপরই মনে হলো, গোল্লায় যাক অফিস। সবার আগে পরিবারের নিরাপত্তা, তারপর অন্যকিছু।

পরদিন সকাল সকাল আমি দ্রুত বউ-বাচ্চাকে রেডি হতে বলে নিজেই কাপড় পরে বাসা থেকে বেরুলাম। আমার বউ আর একমাত্র ছেলেটা খামোখা দেরি করছিল। বাড়ির কয়েকশ গজের মধ্যেই হাসপাতাল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। শত শত নারী-পুরুষ-শিশু লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আজ শুক্রবার। এলাকার সবাই চলে এসেছে হাসপাতালে। ডাক্তার-নার্স- ভলেন্টিয়ারদের ছোটাছুটি। একজনের কাছে যাচ্ছে। আঙ্গুলের মাথায় স্পিরিট লাগিয়ে সুঁই ফুটিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ছুটে ভেতরে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় বলে যাচ্ছে, এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আর একটু পর আপনার নাম ডাকা হলে বুঝবেন আপনার কাজ শেষ। আপনি বাড়ি চলে যাবেন। আমাদের এখানে আমেরিকা থেকে বড়ো ডাক্তাররা আসছেন। কাজেই চিন্তার কিছু নাই। ওরা এই অজানা ফ্লু'র একটা প্রতিষেধক আবিষ্কার করেই ফেলবে, ইনশাল্লাহ।

আমেরিকার ডাক্তার! উপস্থিত জনতা কিছুটা আশার আলো দেখে, তবে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না।

আমি আমার প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। উনি একটু আগেই রক্ত পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়েছেন। এখন পরবর্তী ডাকের জন্য অপেক্ষায় আছেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছেন। একসময় বললেন, কী যে দিনকাল পড়ছে। আরো কত গজব যে দেখতে হবে। কে জানে, এই উছিলায়ই হয়তো দুনিয়ার সব শেষ হয়ে যাবে!

এসব কথার প্রতিউত্তর দেওয়াটা এই মুহূর্তে আমার জরুরি মনে হলো না।

হঠাৎ হাসপাতালের ভিড়ের ভেতর থেকে একজন যুবক দৌড়ে বেরিয়ে এল। হাতে কাগজের একটা বোর্ড এবং সেখানে একটা নাম লেখা। বোর্ডটা এদিক ওদিকে ঘোরাচ্ছে আর সবাইকে দেখাচ্ছে। ঠিক তখনই ছেলেটা আমার কুনুইয়ে গুঁতা দিল।

– আমি বললাম, কী?

– ওদিকে দেখ? আমি বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক তাকালাম।

পুত্র এবার আমার শার্টের হাতা টানতে টানতে বলল, আব্বু, ওখানে আমার নাম লেখা।

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা আমার দিকে ছুটে এল এবং ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল।

– আরে আস্তে আস্তে। এক মিনিট। কী সমস্যা!

এর মধ্যে আরো দুজন ডাক্তার বেরিয়ে এসেছে।

– না কোনো সমস্যা নাই। সব ঠিক আছে। ওর রক্ত পরিষ্কার। ওর রক্ত বিশুদ্ধ। তবু আমরা আরো নিশ্চিত হতে চাই যে, অজানা ফ্লু'টা ওর শরীরে এখনো বাসা বাঁধতে পারেনি। তবে আমাদের ধারণা ও-ই সঠিক স্প্যাসিম্যান।

ভীষণ উদ্বেগের পাঁচ মিনিট কাটার পর ডাক্তার এবং নার্সরা বেরিয়ে এল। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করছে। কেউ কেউ খুশিতে চোখের পানি মুছছে। কেউ কেউ হাসছে। গত এক সপ্তায় এই প্রথম আমি কাউকে হাসতে দেখলাম।

আমেরিকা থেকে আগত একজন বয়স্ক সাদাচুলো ডাক্তার, আমার দিকে এগিয়ে এসে দোভাষীর মাধ্যমে বলল, ধন্যবাদ স্যার। প্রতিষেধক তৈরির জন্য আমরা যে ধরনের নমুনা খুঁজছিলাম আপনার সন্তানের রক্তের নমুনাটা তার সাথে পারফেক্টলি মিলে গেছে। এটা পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ। এবং এই রক্ত ব্যবহার করে আমরা অজানা ফ্লু'র ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারব।

মুহূর্তেই এই খবর আশপাশে ছড়িয়ে পড়ল যে, সঠিক মানের রক্ত খুঁজে পাওয়া গেছে। এবার প্রতিষেধক বানানো যাবে। এবং এই অজানা অসুখ থেকে পৃথিবীর মানুষ বেঁচে যাবে। শুনে মানুষ খুশিতে প্রার্থনা করল, হাসল এবং কাঁদলও। এরমধ্যে সাদাচুলো ডাক্তার আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

– আমাকে হাত ধরে টেনে তুলে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কি তোমাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি?

– জি অবশ্যই, বলেন

– না এখানে নয়, চলুন ভেতরে গিয়ে বলি

– ঠিক আছে, চলেন

ভেতরে ঢুকেই ডাক্তার বলল, না মানে ইয়ে, আমি আসলে ধারণাই করতে পারি নাই যে, রক্তদাতা হবে একজন শিশু। আপনাকে একটা অঙ্গীকারনামা সই করতে হবে।

– মানে?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। এরই মাঝে আমাদেরকে ঘিরে একটা জটলা তৈরি হয়েছে। আমার প্রতিবেশীদের কারো কারো নিশ্বাস আমি আমার ঘাড়ের উপর অনুভব করছিলাম। কথা না বাড়িয়ে অঙ্গীকারনামা সই করার সময় দেখলাম ওখানে, কত ব্যাগ রক্ত লাগবে এই অংশটি ফাঁকা রয়েছে।

– আচ্ছা ডাক্তার, কত ব্যাগ রক্ত লাগতে পারে?

সত্যি কথা বলতে, আমরা আসলে কখনো ভাবতে পারি নাই যে, রক্তদাতা হবে ছোট্ট একটা শিশু। এরজন্য আমাদের প্রস্তুতি ছিল না। ওর শরীরের সবটুকু রক্তই আমাদের লাগবে।

– কী! কী বলছেন আপনি! আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। ও আমার একমাত্র সন্তান!

কিন্তু আমরা এখানে কথা বলছি পুরো পৃথিবী নিয়ে। সারা পৃথিবীর মানুষ এই ভ্যাকসিনের জন্য অপেক্ষা করছে। অঙ্গীকারনামা সই করুন প্লিজ। আমাদের সবটুকু রক্তই লাগবে।

সেক্ষেত্রে আপনারা ওর জন্য আবার রক্তের ব্যবস্থা করতে পারবেন না?

তা হয়ত পারা যাবে, যদি আমরা আবার পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ রক্তের নমুনা পাই। আপনি কি দয়া করে সই করবেন!

কবরের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি অঙ্গীকারনামায় সই করলাম।

– ডাক্তার বলল, আমরা রক্ত নেওয়া শুরু করার আগে আপনি কি আপনার সন্তানের সাথে কিছু সময় কাটাতে চান?

– আমি বজ্রাহতের মতো আমার স্ত্রীসহ সেই রুমে ঢুকলাম যেখানে আমাদের একমাত্র সন্তান একটা স্ট্রেচারে বসে আছে। আমাদেরকে দেখে ছেলেটি বলল, আব্বু, আম্মু, কী হচ্ছে এখানে?

কেউ একজন মনে হয় আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ওর দুহাত তোমার হাতে নিয়ে বলো, আমি এবং তোমার মা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। আমরা কেউ কোনোদিন তোমার কোনো ক্ষতি হয় এমন কিছু হতে দেব না। তুমি বুঝতে পারছ?

কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। এমন সময় একজন ডাক্তার ছুটে এসে আমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে বলল, স্যরি স্যার। আমাদের এক্ষুনি শুরু করতে হবে। সারা পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। উই আর ইন সিরিয়াস হারি।

– আমি এখন কী করব? আমার সন্তান বার বার ডাকছে, আব্বু, আম্মু, কেন? কেন তোমরা আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ?

পরের সপ্তায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমার সন্তানের সম্মানে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ ভদ্রতার খাতিরে এল। যারা এল তাদের অনেকেই সান্ত্বনা দেওয়ার ভান করল। আবার অনেকে আসার প্রয়োজনই বোধ করল না। কারণ এরচেয়েও জরুরি কাজ তাদের জীবনে উপস্থিত হয়েছে।

আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। কিন্তু উপস্থিত মানুষদের ভাবভঙ্গি দেখে কিছুতেই আমার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। আমি রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে ফেটে পড়লাম।

এক্সকিউজ মি! আমার সন্তান আপনাদের জন্য জীবন দিয়েছে। আমার একমাত্র পুত্র। কিন্তু আপনাদের হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে এতে আপনাদের কারোরই কিছু যায় আসে না। এটা আপনাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না মনে হচ্ছে। আমি খুবই মর্মাহত। এটা দেখার জন্যই কি আপনারা আমাদেরকে ডেকে এনেছেন?

– একটু বলেই আমি জোরে জোরে কাঁদতে লাগলাম।

– একসময় বুঝলাম কেউ একজন আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আমি একটা কণ্ঠও শুনতে পেলাম। একজন নারীর গলা।

– এই কী হয়েছে? কী, কাঁদছ কেন? তুমি কি খারাপ কোনো স্বপ্ন দেখছ?'

– আমি আতঙ্কে ঘুম ভেঙে উঠে বললাম, মোহাইমেন কই? আমার ছেলে কই?

– এই তো এখানে। আমার স্ত্রী বলল।

আমি দেখলাম, আমাদের দুজনের মাঝে ছোট্ট তুলতুলে শরীর নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমে ডুবে আছে আমাদের সন্তান। আমি বিছানায় ঝিম মেরে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। শরীর কিছুটা কাঁপছে। ■

কবি নির্মলেন্দু গুণ

স্বাপ্নিক ধ্যানমগ্ন মনীষী

শাফিকুর রাহী

মধ্য জানুয়ারি ২০০৭, শৈত্যপ্রবাহের নিদারুণ দাপটে গ্রামবাংলার অসংখ্য হতদরিদ্র মানুষ জীবনধারণের দুঃসহ সংগ্রামে ব্যর্থতার বিলাপে মত্ত। তখনো কিন্তু আমি জেগে আছি মধ্যরাতে নাগরিক জীবনের জটিল যন্ত্রণা বুকে নিয়ে। মাথা আমার প্রচণ্ড ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে। ঘুম আসে না, রাত কাটে না। সীমাহীন যন্ত্রণার দাহে স্তব্ধ রাতের নীরবতা ভেঙে গ্রামীণ ফোনে উড়-গর-ঝড় মিউজিক বেজে উঠল হঠাৎ। আমার সহধর্মিণী মধ্যরাতের টেলিফোনের শব্দে ঘুম ঘুম চোখে কেঁপে ওঠে কোনো অশুভ খবরের ভয়ে। ফোনটা রিসিভ করে হাসিমুখে আমাকে আচমকা জানান দেয়, গুণদা, গুণদা! কবি নির্মলেন্দু গুণের কথা শুনে মুহূর্তেই আমি লাফিয়ে উঠে দাদার সাথে কথা বলতে থাকি। প্রথমে আমার শারীরিক দুরবস্থার খবর জানতে চাইলেন কবি। আমিও তখন কী বলতে কী বলব ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না। কারণ গুণদার কথা শুনে আমিও আবেগের অগ্নিতে বাকরুদ্ধপ্রায়। আমার তপ্ত চোখের জমিনে বয় শ্রাবণধারা। আমার মতো এমন অনাথ ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা কিংবা নিদারুণ অসহায়ত্বের নির্মম মনোযাতনার কথা ভেবে গুণদা বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে SMS করেছেন শুনে আমার দুঃসহ অসুখের ৯৯ ভাগই ভালো হয়ে গেছে– এমনই মনে হলো আমার। গুণদা'র অসীম উদারতা আর মানবিক কল্যাণের যে বীজ বপন করেছেন নিরহংকার মানসপটে তা আমাদের এই ক্ষয়িষ্ণু মানবতল্লাটে বড়োই বিরল।

যেসব গুণিজন এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অমর গর্বগাথা কিংবা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রেম তথা মানবপ্রেমের অমর অসীম গর্বিত সব ইতিহাসের গাথা তাদের মুক্তমননে, ধ্যানে-জ্ঞানে সর্বময় সর্বক্ষণ উচ্চারণ করে চলেছেন তাদের মধ্যে কবি নির্মলেন্দু গুণ অন্যতম।

নির্মলেন্দু গুণ সমকালীন কাব্যভুবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপরাজেয় কবি মনীষী। ভালোবাসার আলো-আঁধারে মনোমুগ্ধ কাব্যদেবী বার বার উপস্থিত হয়েছেন তাঁর কবিতার মনকাড়া শব্দালংকারে। কখনো বিরহ-বিচ্ছেদ, কখনো আবেগিত পঙ্‌ক্তি, কোমল প্রতিবাদী উচ্চারণে এই পোড়-খাওয়া

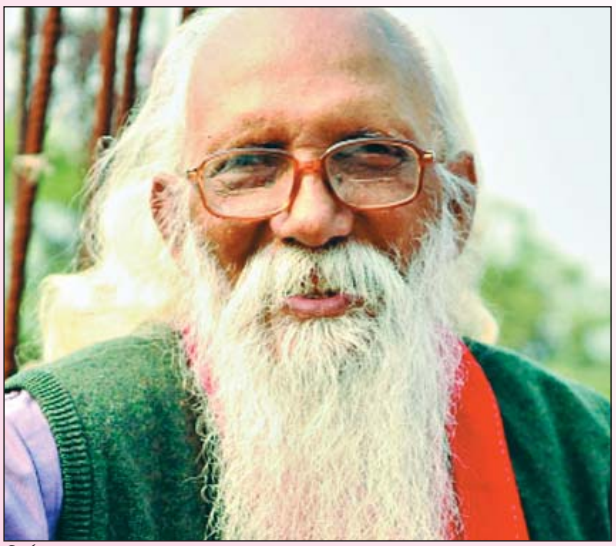

নির্মলেন্দু গুণ

সন্ন্যাসের হৃদয় তারে বেদনার বারি ঝরে, কখনো আনন্দে নেচে উঠে মন।

জাতির কাছে রয়েছে লেখকদের কিছু দায়বদ্ধতা। তাইতো তারা তাদের সৃজন সাধনায় মাটি ও মানুষের কান্না-হাসি, সুখ-দুঃখের অমর আখ্যান রচনা করে চলেন আপন মহিমায়। জীবন-জীবিকার তাগিদে মানুষ কত রকম ফন্দিফিকির করে থাকে– কী রাজনৈতিক, কী ব্যবসায়িক। কিন্তু প্রকৃত কবিরা এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা যা করেন তা পুরোপুরি নিঃস্বার্থভাবে করে থাকেন। মনোসুখে কিংবা দুঃখে জীবনের ছবি আঁকেন অসামান্য সৃজনধারায়।

আবার কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ দারুণ কাব্যিক সুর আন্দোলিত ও আলোড়িত হয় গুণমুগ্ধ পাঠকহৃদয়। আকাঙ্ক্ষার তপ্তদাহে আত্মার আয়নায় ভেসে ওঠে সর্বকর্মে ব্যর্থ এক নগরবাউলের জীবন আখ্যান।

গুণদা আজও স্বপ্ন দেখেন বৈষম্যহীন সমঅধিকারের, শোষণমুক্ত সাম্য আর সম্প্রীতির দেশ হবে বাংলাদেশ। আমাদের আকাশ-মাটি থেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তির অবসান হবে একদিন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আবার উজ্জীবিত হবে আপন মহিমায়। বিশ্বের সমগ্র বাঙালি উচ্চকিত কণ্ঠে গেয়ে উঠবে সফলতা ও সম্ভাবনার গান।

পঁচাত্তর পরবর্তী সময় যে বিষবৃক্ষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বাংলার ভাগ্যাকাশে, সে অশুভ দানবীয় অপশক্তি গুপ্তঘাতক আজও অব্যাহত রেখেছে তাদের সে ঘৃণিত অপকর্ম; নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। বাঙালি আবার জেগে উঠবে, কবি নির্মলেন্দু গুণের আলোকিত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বীরদর্পে বলবে 'দূর হ দুঃশাসন' কিংবা 'আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি কোমল বিদ্রোহী'। তাঁর এমন অসংখ্য কবিতার পরতে পরতে বীর বাঙালির শ্রমে-ঘামে–অশ্রুতে–রক্তে অর্জিত প্রিয় স্বদেশ-জন্মভূমি জননীর আত্মগরিমায় গর্বিত শব্দকলায় উদ্ভাসিত করেছেন বিদগ্ধ বিজ্ঞজনের মনোলোক।

গুণদার কবিতায় নারীপ্রেম, দেশপ্রেম, মানব-মানবীর প্রেমের বন্দনা সব বয়সি পাঠককে মুগ্ধ করে। নির্মলেন্দু গুণ মুজিবপ্রেমী কবি, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মগ্ন মনীষী। কারণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর অনেক জনপ্রিয় কবিতা রয়েছে। তার মধ্যে 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি', 'স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো', 'আগস্ট, শোকের মাস', 'কাঁদো'সহ অসংখ্য কবিতা রয়েছে যেগুলো মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। তাঁর 'হুলিয়া কবিতা' ও 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যা দেশজুড়ে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। গুণদার অনেক জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ দেশের তরুণ-তরুণীরা প্রবল আগ্রহের সাথে সংগ্রহ করে থাকে যেমন: *নেই কেন সেই পাখি*, *অনন্ত বরফবিথী*, *ধাবমান হরিণের দ্যুতি*, *শিয়রে বাংলাদেশ*, *পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ*, *আনন্দ উদ্যান*, *কামকানন*, *পায়ে পায়ে পাথর*, *রাজনৈতিক কবিতাসহ* আরো অনেক কাব্যগ্রন্থ আছে যা এ মুহূর্তে মনে আসছে না। দেশের অন্যতম প্রধান কবি নির্মলেন্দু গুণের গদ্য গ্রন্থগুলোও অসাধারণ যেমন: *আমার কণ্ঠস্বর*, *নির্গুণের জার্নাল* ১৯৯৬, *আত্মকথা* ১৯৭১ ও অন্যান্য গদ্য গ্রন্থগুলোও কবি নির্মলেন্দু গুণের সৃষ্টির সেরা সৃজনকলা হিসেবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যিনি বাধার আঁধারকে ভেঙে চলেন কোনো রমণীয় কমিনীয় শব্দশৈলীর মন্ত্রমুগ্ধ আবাহনে। নাগরিক কোলাহলের এই মানবউদ্যানে একাকী পথ হাঁটেন– যেন এক উদার উদাসীন মহৎপ্রাণ মনীষী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস কিংবা হোমারের ট্র্যাজেডির অমর শিল্পীর গন্তব্যহীন পথচলা।

যিনি আজও ভাবেন এ দেশ হবে সাম্য আর সম্প্রীতির আলোকোজ্জ্বল অরণ্য উদ্যান। যে পবিত্রভূমিতে থাকবে না কোনো যুদ্ধাপরাধীর নষ্ট আস্ফালন, জঙ্গিবাদের অপতৎপরতা কিংবা দেশদ্রোহী ঘাতকদের বীভৎস উল্লাস। যে দেশ হবে তাঁর কবিতার চিত্রকল্পের মতো মায়াবী ছবি, যে ছবির শব্দেরা আনন্দে গেয়ে উঠবে 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' হবে, হবে হবে, হবে নিশ্চয়। যে দেশের হাল ধরেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা, যিনি আঁধারের মাঝে আলোর দীপশিখা জ্বালিয়ে জানান দেন এদেশের গণমানুষের হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার। মহৎপ্রাণ মানুষ কবি নির্মলেন্দু গুণের শুভ জন্মদিনে শুভেচ্ছা। আরো দীর্ঘ হোক আপনার শৈল্পিক সৃজন সাধনা। কৃষক বধূর মধুর হাসিতে ভরে উঠুক অজ-অন্ধ পল্লির মায়াবী আঙিনা, সমগ্র বাংলা ও বাঙালির মনোমাঠ বেজে উঠুক– এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

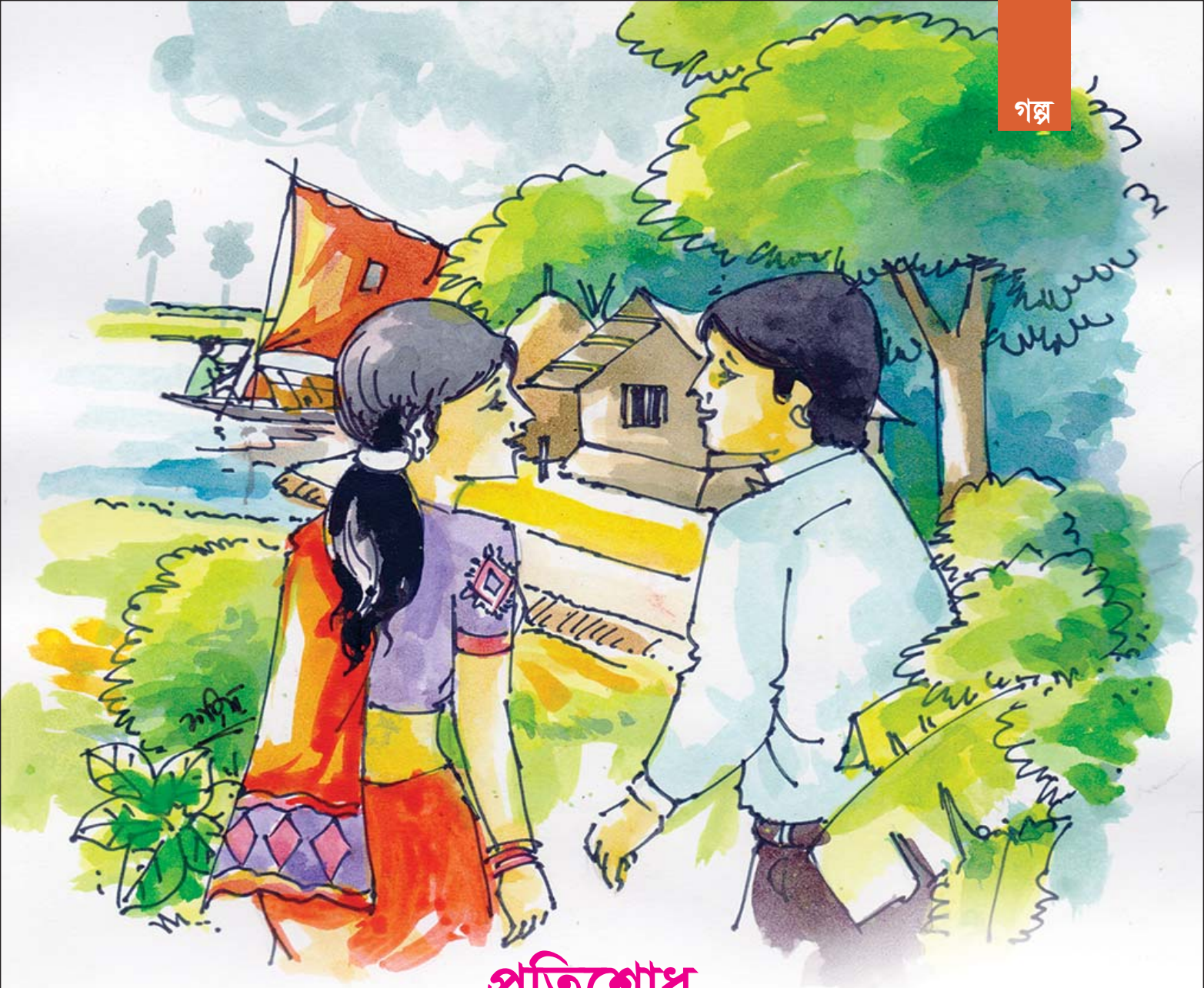

প্রতিশোধ

সালাম হাসেমী

তটিনী ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা মেঠোপথ ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে রূপডাঙ্গা কলেজের দিকে আসছে। এই পথটি কলেজের উত্তর পাশের রাস্তার সাথে মিলিত হয়েছে। রূপডাঙ্গা কলেজ রূপডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত। সারাদেশে ভালো কলেজ হিসেবে এই কলেজটির অনেক নামডাক। দেশে যদি নামকরা দশটি স্বনামধন্য কলেজ থাকে তার মধ্যে এই রূপডাঙ্গা অন্যতম। কলেজটির অবস্থান গ্রামে হলেও তার সুখ্যাতির জন্য দেশের ভিন্ন জেলা ছাত্রছাত্রীরা এই কলেজে ভর্তি হতে আসে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে এই কলেজে ভর্তি হয়। তটিনীও অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মতো ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে এই ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আজ কলেজে ভর্তি ফি জমা দিয়ে ভর্তি হওয়ার দিন। তাই তটিনী কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য কলেজে এসেছে। তটিনী কলেজের করিডোরে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে অনুমান করছে ভর্তি ফিস-এর টাকা কোন দিকে কোথায় গিয়ে জমা দিতে হবে।

সেই মুহূর্তে সেই করিডোরে দাঁড়িয়ে ছিল তমাল। সহসা করিডোরে সুদর্শনা তটিনীকে দর্শন মাত্র তার দুচোখের দৃষ্টি সদ্য আগত তরুণীর অপরূপ জ্যোতির আলোক রশ্মিতে আবদ্ধ হয়ে স্থির হয়ে গেল। সে দৃষ্টি আর অন্যদিকে সরাতে পারল না। সহসা সহপাঠীর ধাক্কা খেয়ে দৃষ্টি মায়াময় রূপের জগৎ থেকে অন্যদিকে সরে গেল। সে হঠাৎ দেখা সুদর্শনার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল। মনের অজান্তে মনের আকাশে সহসা পুঞ্জীভূত হলো সুদর্শনার রূপে মুগ্ধ বিন্দু বিন্দু প্রীতি মেঘমালা। সেই কালো মেঘমালার মাঝে চন্দ্রের মতো ঝলক দিয়ে ভেসে উঠল সদ্য দর্শনকৃত সুদর্শনার মায়াময় অপরূপ চন্দ্র মুখ। সে মুখ শুধু একদৃষ্টিতে দেখতে মন চায়, ধরণীর অন্য সকল সৌন্দর্যকে দর্শনের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে। ততক্ষণে তটিনী হাঁটতে হাঁটতে ক্যাশ কাউন্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তমাল তটিনীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে উপযাচক হয়ে বলল,

অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে, তুমি কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি ফিস জমা দিতে এসেছ।

: জি।

: সরি। অপরিচিত একটি লোককে 'তুমি' বলে ফেললাম।

: না। আমি কিছু মনে করিনি। সবে স্কুল পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হতে এসেছি। এমন কী মুরুব্বি হয়েছি যে, আমাকে আপনি বলতে হবে। তুমি বলাটাই উত্তম হয়েছে। 'তুমি' শব্দটা কাছের মনে হয়।

: আমি তমাল। এই কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বর্ষে অনার্স পড়ছি। তাছাড়া আমি একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং আমার ক্রিকেট খেলা শিক্ষা দেওয়ার একটি প্রতিষ্ঠান আছে, এই কলেজের পাশে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের ক্রিকেট খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়। আর তোমার পরিচয় ?

: আমি তটিনী।

: ভর্তি ফিস জমা দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি কি ?

: অবশ্যই।

তমাল তটিনীর কাছ থেকে ভর্তি ফিসের টাকা নিয়ে জমা দিয়ে ভর্তির যাবতীয় কার্জ করে দিল। যাবার সময় তটিনী সহায়তা করার জন্য একটু মৃদু হেসে তমালকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। তটিনীর সেই রাঙা ঠোঁটের মৃদু হাসির ঝলক তমালের অন্তর জুড়ে প্রীতির ঢেউ বইয়ে দিল। তমাল শুধু অবাক হয়ে তটিনীর গমন পথের পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, যতক্ষণ তার দৃষ্টিসীমার মাঝে রইল। কলেজে ভর্তির পর তটিনী নিয়মিত কলেজে ক্লাস করছে। তমাল সময়-অসময় তটিনীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গল্প-গুজব করছে। এভাবে পার হয়ে গেল কিছু সময়। উভয় উভয়কে জানতে পারল। কাছে থেকে আরো কাছে এল। তমাল তটিনীকে নিয়ে প্রীতি স্বপ্ন রচনা করতে শুরু করল। তটিনী ও তমালদের রূপডাঙ্গা কলেজের মাঠে ক্রিকেট খেলা প্রতিযোগিতা শুরু হলো। প্রত্যেক দিন তটিনী খেলা দেখে। একদিন ফাইনাল খেলা শেষ হলো। খেলায় রূপডাঙ্গা কলেজ চ্যাম্পিয়ন হলো। আর তমাল ম্যান অব দ্য ম্যাচ। তমাল শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হওয়াতে তটিনী তার নিজের তরফ থেকে তমালকে পুরস্কৃত করল।

তমালকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হতে দেখে তটিনীর মনেও ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়ার বাসনা উদয় হলো। সে গিয়ে তমালের ক্রিকেট খেলা শেখানোর প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলো। তমাল তাকে মনোযোগ সহকারে ক্রিকেট খেলা শিখাতে লাগল। তটিনীও সুদক্ষ ওস্তাদ পেয়ে যত্ন সহকারে খেলা শিখল। তটিনী খেলা শিখতে লাগল আর বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করতে লাগল। প্রতিটি খেলায় সে বিজয় লাভ করে সুনাম কুড়িয়ে আনছে। তটিনীর সুনামে তমাল মহা খুশি।

হঠাৎ একদিন তমাল পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারল যে, সরকার দেশের তৃর্ণমূল পর্যায় থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায় খেলার জন্য বিভিন্ন শাখায় খেলোয়াড় সংগ্রহ করবে। তমাল তটিনীকে দক্ষতার সাথে ক্রিকেট খেলার ট্রেনিং দিয়ে তাকে দক্ষ করে তুলল। তটিনী বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে থানা থেকে জেলা এবং জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ হলো। এখন থেকে তটিনীকে ঢাকায় থেকে বিদেশি কোচের মাধ্যমে ট্রেনিং গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য দুদিন পরেই তাকে ঢাকায় যেতে হবে। গ্রামের বাড়িতে তেমন একটা আসা যাবে না, তাই তমাল তটিনীকে তাদের রূপডাঙ্গা গ্রামে একটি পুরাতন জমিদার বাড়ি আছে, সেখানে ডাকল। তটিনী বিকেল বেলা সেই জমিদার বাড়ির বাগানে এল। তমাল তটিনীর হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে পুকুরের পাড়ে কামিনী ফুলের গাছের নিচে বসল। ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে। ফুলের সুবাসে চারদিকে মৌ মৌ করছে। তমাল তটিনীকে তার খেলোয়াড় জীবনে যাতে আরো উন্নতি করতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে তটিনীর চোখে তার চোখ রেখে বলল, তটিনী এতদিন তুমি আমি একসাথে থেকেছি, কলেজে ক্লাস করেছি, খেলা শিখিয়েছি, দুজনে কাছাকাছি থেকেছি বলে কেউ কারো অভাববোধ করিনি। দুজন দুজনার মনে করেছি। হঠাৎ তুমি দূরে চলে যাচ্ছ আর দেখা হবে কী হবে না, সে হলো ভবিষ্যতের কথা। আমি তো তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার হৃদয় মন্দিরে তোমাকে স্থান দিয়ে ভালোবেসে একাকার হয়ে গেছি। কখনো জানতে চাইনি তুমি আমাকে ভালোবাসো কি-না এবং যদি ভালোবাসো তাহলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যে পড়ে আমাকে ভুলে যাবে কি-না। তুমি আমাকে ভুলে গেলে আমি সে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে অবশ্যই আত্মহত্যা করব। তমালের আবেগময় কথা শুনে তটিনীর মুখখানা ক্ষণকালের জন্য ম্লান হয়ে গেল। ম্লান বদনে তমালের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে হা---হা---হা---হি---হি--- করে হাসল।

তখন তটিনীর ডান হাতের বাহু ধরে ঝাকুনি দিয়ে বলল, তটিনী তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাগলের মতো হাসছ কেন ? তটিনী হাসি থামিয়ে বলল ,

: হাসছি কেন শুনবে ? শুনবে তমাল ?

: হ্যাঁ। বলো। অবশ্যই শুনব।

: তুমি কি আরজিনা নামে ফজল চাষার মেয়েকে চিনতে ?

তটিনীর প্রশ্নে তমাল নীরব হয়ে গেল। অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। তটিনীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না দেখে আবার বলল,

জানি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না । আমি বলছি শোন। আরজিনা রূপডাঙ্গা কলেজের ইন্টার মিডিয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিল। সে তোমাকে ভালোবাসত। তুমি তাকে ভালোবাসতে কি-না তা জানি না কিন্তু উপরে উপরে দেখাতে ভালোবাসো। বিষয়টি সমাজে জানাজানি হয়ে গেলে আরজিনার বাবা তোমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। কিন্তু তোমার বাবা হলো এলাকার চেয়ারম্যান, তার শত বিঘার উপরে জমি আছে, বাড়িতে পাকা দালান, অগাধ টাকাপয়সার মালিক। তিনি সহায়-সম্বলহীন অভাগা চাষার মেয়েকে তার পুত্রবধূ করে নিতে চাইলেন না। বরং তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। আরজিনা তোমার বাবার এই নেতিবাচক কথা, অবহেলা এবং দুর্ব্যবহারের কথা শুনে তোমাকে না পাওয়ার বিরহ ব্যথায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, আমি সেই আরজিনার অতৃপ্ত আত্মা। তটিনী নামে ব্যর্থ প্রেমের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মানব জগতে এসেছি। আমি যেমন তোমাকে ভালোবেসে না পেয়ে আত্মহত্যা করেছিলাম। এখন তুমি আমাকে না পেয়ে আত্মহত্যা কর। হা---হা--- হি--- হি--- হি--- করে হাসতে হাসতে তটিনী তমালের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তমাল তটিনীকে উচ্চস্বরে ডাকতে ডাকতে বলল, তটিনী যেও না , যেও না, যেও না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। কিছুতেই আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। পরের দিন সকালে পুরাতন জমিদার বাড়ির পুকুর পাড়ে আম গাছের ডালের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় তমালের লাশ দেখা গেল। ■

সুন্দর পরিবেশে গড়ে তুলি সুন্দর পৃথিবী

মিজানুর রহমান মিথুন

প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও গুরুত্বসহকারে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষের বসবাসের স্থান সুন্দর ও উপযোগী রাখতে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন হয়।

বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো অতিরিক্ত আধুনিকায়নের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। বিগত কয়েক দশক ধরে পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। এতে বাংলাদেশের পরিবেশও আক্রান্ত হচ্ছে। ধীরে ধীরে প্রকৃতির আচরণ বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে চিরচেনা ঋতুবৈচিত্র্য। বিশেষ করে চলতি বছর পরিবেশ দূষণের কারণে পরিবেশের বিরূপ প্রভাব দেখা দিয়েছে। জলবায়ুর নানা ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবার আগাম অতিবৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়ার এমন খামখেয়ালিপনা আগামীদিনে আরো বাড়বে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

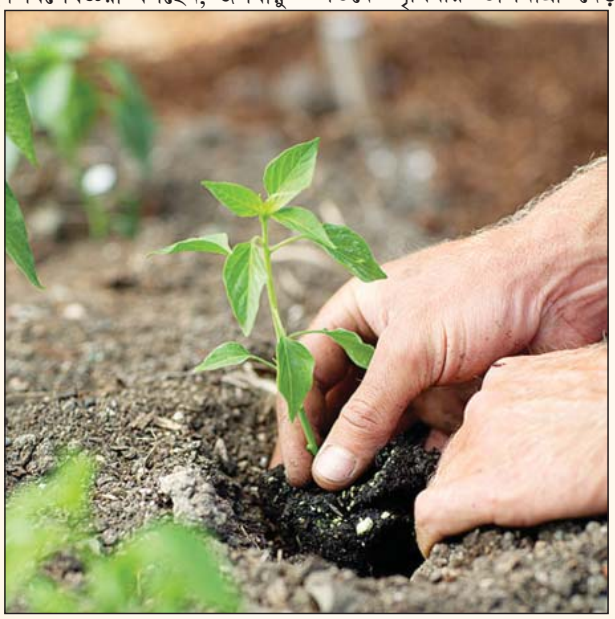

বৃক্ষরোপন

জানা গেছে, লবণাক্ত পানি আগে উঠে আসত সুন্দরবনসহ সাতক্ষীরার নদনদী পর্যন্ত। এখন সেই লবণাক্ততা গোপালগঞ্জের মধুমতী নদীতে এসে ঠেকেছে। ফলে পুরো দক্ষিণাঞ্চলে এখন সুপেয় পানির সংকট চলছে। এই সংবাদ পরিবেশবাদীদের ভাবিয়ে তুলেছে।

অন্যদিকে চলতি বছরের চৈত্র মাসে দেখা মেলেনি চিরচেনা সেই কাঠফাটা রোদের। শোনা যায়নি চৈত্রের রোদে পিপাসাকাতর কাকের গগনবিদারী আর্তনাদ। এমনকি মাঠ-ঘাট, খাল-বিল-প্রান্তর ফেটে চৌচির হওয়ার ঘটনাও ঘটেনি।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, শীতের স্থায়িত্বও এবার খুব কম ছিল। তেমন শৈত্যপ্রবাহও কাঁপিয়ে তোলেনি দেশের গ্রাম, শহর, নগর, বন্দর। বাংলাদেশের মানুষ দেখেনি শীতের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব। আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এ বছর মার্চে স্বাভাবিকের তুলনায় ১৫২ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে সারাদেশে। এছাড়া দিনের তাপমাত্রাও ছিল গত বছরের চেয়ে অনেক কম। এসময় শিলাবৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি।

এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আশা থাকবে বিশ্বকে সবুজ করে তোলা। যেখানে যেখানে গাছ লাগানো জরুরি, সেখানে গাছ লাগানো দরকার। যত বেশি করে সম্ভব বনায়ন করা উচিত। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রত্যেককে কিছু না কিছু করা জরুরি। সেটা হতে পারে পাখির বাসস্থান নিশ্চিত করা, প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার কমাতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা, পানির দূষণ রোধ করা, রাস্তা থেকে বর্জ্য সরিয়ে যথাযথ স্থানে রাখা, পরিবহণ দূষণ কমানো ইত্যাদি যে-কোন কাজ।'

জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে আবহাওয়ার যে নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সেটি ভেঙে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যশোরের অভয়নগর, কেশবপুর ও মণিরামপুরে জলাবদ্ধতা হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ফসল ও মৎস্য সম্পদের ভবিষ্যৎ হুমকিতে পড়ছে। কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রাজিল, ভারত, রাশিয়া তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্বন নিঃসরণ কমাচ্ছে না, বরং বাড়াচ্ছে। তাদের ভোগ-বিলাসের বলি হচ্ছে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিনিয়তই বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে। এ কারণে দুই মেরুতে জমাট বরফ গলতে থাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। এর প্রভাবে আগে যেসব জায়গায় জোয়ারের পানি উঠত না, সেসব অঞ্চল এখন প্লাবিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নাম সবার শীর্ষে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যবহার করে দেখানো হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কী কী পরিবর্তন ঘটছে। এখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো জরুরি। মানুষকে বোঝাতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ রকম আগাম বন্যা আরো হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেক কিছু পড়ানো হচ্ছে। তবে নীতিনির্ধারক ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলাটাও জরুরি।

প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা আগামী শতকে পৃথিবীর তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ধরে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে এটা কার্যকর করা কঠিন হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বকে জোর দিতে হবে কার্বন নিঃসরণ কমানোর ওপর। গুরুত্ব দিতে হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর। এছাড়া বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। নদী দখল ও দূষণ কমানোর ওপর জোর দিতে বলেছেন তারা।

উন্নয়নের নামে এখন প্রতিনিয়তই বন দখল হচ্ছে। একটি দেশে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশে আছে মাত্র ১৭ শতাংশের মতো। বনভূমি দখল হওয়ার কারণে হারিয়ে যাচ্ছে হাতিসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী। পাহাড়-টিলা কেটে ফেলা হচ্ছে নির্বিচারে।

এ বছর আবহাওয়ায় কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যখন প্রচণ্ড রোদ থাকার কথা, তখন বৃষ্টি হচ্ছে। আবার যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা তখন উঠছে গা-জ্বালা করা রোদ। এবার সুনামগঞ্জ ও অন্যান্য হাওর অঞ্চলে আগাম বন্যার মূলেও রয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন। আবহাওয়ার এমন পরিবর্তন বিষয়ে মানুষ ততটা সচেতন নয়। এমন অবস্থা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশসহ দেশগুলোর জন্য এক ভয়াবহ অশুভ সময় অপেক্ষা করছে।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত পরিবেশ দূষণের বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করা। 'লাগলে আগুন জ্বলবি সবে ছাই হবে সাধের জীবন, বেলা থাকতে হও সচেতন'-পরিবেশের করুণ অবস্থা দেখে এই গানটি বার বার মনে পড়ছে। পরিবেশকে যেভাবে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে ফিরে আশা জরুরি। পরিবেশকে সুন্দর সুনিবিড় ছায়া সুশীতল রাখতে হলে বেশি করে বৃক্ষরোপণ করে সবুজে সবুজে ভরে ফেলতে হবে বাংলাদেশকে। সবুজে সবুজে সাজাতে হবে পৃথিবীকে, তবেই সফল হবে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সব আয়োজন।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

সাক্ষাৎকার

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্বনামে খ্যাত লেখক-লেখিকাদের মধ্যে সেলিনা হোসেন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কথাসাহিত্যিক। লিখেছেন ৩৫টির বেশি উপন্যাস, ১৩টি গল্পগ্রন্থ, ২২টি শিশু-কিশোর সাহিত্য, ১০টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১টি কাব্যগ্রন্থ, ১৩টি সম্পাদনা সাহিত্যসহ অসংখ্য বই, এখনো লিখছেন। ক্লান্তিহীন লিখে যাচ্ছেন। প্রধান উপজীব্য মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, দেশ-মাটি-মানুষ। পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার। কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন-এর জন্ম ১৯৪৩ সালের ১৪ই জুন রাজশাহীতে। পৈতৃক নিবাস তৎকালীন নোয়াখালী জেলা বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। পিতার কর্মসূত্রে ১৯৫৪ সালে বগুড়ার লতিফপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে রাজশাহীর নাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপর রাজশাহী মহিলা কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা এবং বসবাস। ১৯৬৮ সালে বাংলা সাহিত্যে এম.এ পাস করেন। ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৭ সালে একাডেমির প্রথম নারী পরিচালক হন। ২০০৪ সালে অবসর নেন। বর্তমানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। লেখালেখির পাশাপাশি প্রয়াত কন্যা বৈমানিক ফারিয়া লারার স্মৃতি বিজড়িত 'লারা ফাউন্ডেশন'-এর কাজে সময় দেন। দীর্ঘ ২০ বছরের বেশি *ধান শালিকের দেশ* পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন; এছাড়া একাধিক অভিধান রচনা ও সম্পাদনার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। পেয়েছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, শহীদ মুনীর চৌধুরী, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন-এর মতো গুণিজনদের সান্নিধ্য। তাঁর উপন্যাস *হাঙ্গর নদী গ্রেনেড*, *পোকা মাকড়ের ঘরবসতি* চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর সাহিত্য একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দেশ-বিদেশে রয়েছে তাঁর অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রইল জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হলো এবারের ঈদ সংখ্যায়।

প্রশ্ন : আপনার ছোটোবেলার ঈদ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

উত্তর : আমার ছোটোবেলায় দারুণ আনন্দের ছিল ঈদের দিন। নতুন জামা পরে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, সেমাই-জরদা-পোলাও-কোর্মা খাওয়া ইত্যাদি নানা কিছু ঈদের আনন্দ মাতিয়ে তুলত। তবে বেশি আনন্দ পেতাম বারুয়া মাঝি ও বাগদি বুড়ির জন্য কলাপাতায় মুড়ে সেমাই-জরদা নিয়ে যেতে। বারুয়া মাঝি ঈদের দিন পেট পুরে সেমাই-জরদা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করত। দৌড়াতে দৌড়াতে খেয়াঘাটে গিয়ে পৌঁছালে বারুয়া মাঝি হেসে বলত, এসেছিস তোরা? বলতাম, কাকু সেমাই-জরদা এনেছি। উজ্জ্বল হয়ে উঠত কাকুর কুচকানো চেহারা। কলাপাতা খুলে খেয়ে বলত, অনেক খুশি হয়েছি। এখন মনে করি ছোটোবেলার এই আনন্দই সার্বজনীন উৎসবের আনন্দ। কাজাদি মামিও এভাবে খুশির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন।

প্রশ্ন : আজকের ঈদ এবং ছোটোবেলার ঈদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন কি-না?

উত্তর : সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পার্থক্যের ব্যবধানতো তৈরি হবেই। হওয়াই স্বাভাবিক। না হলেই মনে হতো সময় এগোয়নি। এখনকার ছেলেমেয়েরা উৎসবকে অনেক বেশি প্রাণমুখর করেছে।

প্রশ্ন : নতুন পোশাক কেনা বা পাওয়ার অনুভূতি তখন কেমন ছিল ?

উত্তর : নতুন পোশাক পাওয়া এই বয়সেও আমার কাছে আনন্দের। উপহার আমার কাছে খুবই আন্তরিক সম্পর্কের জায়গা মনে হয়। আনন্দ বাড়ায়। ভালো লাগে।

সেলিনা হোসেন

প্রশ্ন : ঈদি বা সালামি প্রসঙ্গে কিছু বলুন।

উত্তর : ঈদের সালামি আমাদের ছোটোবেলায় ছিল না। তবে এখন সালামি দিতে ভালো লাগে। ছোটোদের উজ্জ্বল চেহারা দেখা খুবই আনন্দের।

প্রশ্ন : ছোটোবেলায় ঈদ জামাত বা মেলায় যেতেন কি-না ?

উত্তর : ছোটোবেলায় সব জায়গাতেই গিয়েছি। বাবার সঙ্গে ঈদগাহে তো যেতেই হতো। ছোটোদের সঙ্গে একছুটে চলে যাওয়া। ঈদগাহ মাঠে নামাজ শুরু হলে আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মোনাজাত করতাম।

প্রশ্ন : ঈদের প্রস্তুতি কীভাবে নেন ?

উত্তর : আমার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈমানিক ফারিয়া লারা ১৯৯৮ সালে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়। ছেলে কানাডায় আর আরেক মেয়ে ব্যাংককে থাকে। বাড়িতে এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন থাকি।

ঈদের কোনো আলাদা প্রস্তুতি নেই। রোজার সারা মাস যেভাবে চলে, সেভাবে একদিন শেষ হয়। ঈদ এসে যায়। ঈদের দিন আত্মীয়স্বজন আসে। খাওয়াদাওয়া হয়। এ পর্যন্তই।

প্রশ্ন : ঈদের খাবার সেকালে কেমন ছিল ?

উত্তর : ছোটোবেলায় সেমাই-জরদা-পোলাও-কোর্মা খাওয়া হতো। হাতে তৈরি সেমাই ও পিঠা তৈরি হতো। এখন ঐতিহ্যবাহী পায়েস, সেমাই, ফিরনি, পোলাও, মুরগির সাথে নতুন নতুন খাবার যোগ হয়েছে।

প্রশ্ন : আগে দলবেঁধে প্রতিবেশীর বাসায় যেতেন কি-না ?

উত্তর : আগে প্রতিবেশীদের বাসায় যাওয়া হতো। এখন হয় না। এখন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুলোতে পারি না। কিন্তু প্রতিবেশীর সঙ্গে সবসময় হৃদ্যতার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তাদের বাসায় যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন : ঈদ একটি সার্বজনীন উৎসব– এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : ঈদ একটি ধর্মীয় উৎসব। ইসলাম ধর্মের মানুষেরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করেন। ঈদ উৎসব দুটি– ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এক মাস রোজা রাখার পরে ঈদুল ফিতর পালিত হয়। ঈদুল আযহার প্রধান দিক আল্লাহর নামে পশু কোরবান দেওয়া। ধর্মীয় বিষয় পালন করে মুসলমানেরা ঈদ উৎসব উদযাপন করেন।

এই দুই উৎসবকে মুসলমানেরা সার্বজনীন করতে পারেন যদি অন্য ধর্মের মানুষদের উৎসবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বাংলাদেশে এটা হয়। সার্বজনীন অবশ্যই বলা যাবে কারণ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সব ধর্মের মানুষ আমন্ত্রিত হন। মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরি হয়। আন্তরিক উষ্ণতায় মুখর হয় উৎসবের পরিবেশ।

প্রশ্ন : আপনার সাহিত্যে ঈদ কীভাবে এসেছে ?

উত্তর : সাহিত্যে আলাদাভাবে ঈদ নিয়ে কোনো গল্প আসেনি। উপন্যাসও না। জনজীবনের বর্ণনায় কাহিনির প্রয়োজনে ঈদ উৎসব হিসেবে এসেছে। সার্বজনীন উৎসবের আনন্দ নিয়ে এসেছে। একদম ঈদকে কেন্দ্র করে কোনো লেখা হয়নি।

প্রশ্ন : অতীত ও বর্তমান ঈদ সাহিত্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন কি-না ?

উত্তর : শুধু ঈদ নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে এমনটি আমার মনে হয় না। ঈদ একটি সার্বজনীন উৎসব। অতীত বা বর্তমানের আলাদা সাহিত্য আছে বলে আমার মনে হয় না। যদি থাকে তবে এর সার্বজনীন প্রেক্ষাপটই লেখকের কলমে উঠে আসবে।

প্রশ্ন : এপার বাংলা-ওপার বাংলার সাহিত্যচর্চার মধ্যে কোনটিকে এগিয়ে রাখবেন ?

উত্তর : অবশ্যই বাংলাদেশের সাহিত্যকে এগিয়ে রাখব। পুরো বাংলা ভাষার সাহিত্য আমাদের মাতৃভাষার অস্তিত্বের অংশ। কিন্তু জনজীবনের গল্প রূপায়িত হলে সেটা আমাদের জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। '৪৭ পরবর্তী সময় থেকে সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে আলাদা হয়ে আমরা একটি ভিন্ন সাহিত্য ধারা রচনা করেছি। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনে যে ধরনের টানাপড়েন ঘটেছে তা অন্য কোনো এলাকার বাঙালির জীবনে ঘটেনি। আর যে-কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনের এসব উপাদান সাহিত্যের উপাদান। আমাদের ভাষা আন্দোলন আছে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আছে। এসব পটভূমিতে আমাদের সাহিত্যের মাত্রা ভিন্ন পরিসর লাভ করেছে। '৪৭ পরবর্তী সময় থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আমরা ভিন্ন সাহিত্য স্রোত তৈরি করতে পেরেছি। দেশ স্বাধীন না হলে আমরা ঐ সুযোগ পেতাম না।

প্রশ্ন : ঈদ নিয়ে কোনো স্মরণীয় ঘটনা আছে কী ?

উত্তর : ঈদের দিন অন্য ধর্মের মানুষদের কাছে খাবার নিয়ে যাওয়া আমার স্মরণীয় স্মৃতি। আমি তাদের উজ্জ্বল চেহারাও ভুলিনি। এখনো এমন কোনো দরিদ্র মানুষকে সামনে পেলে সেই স্মৃতি জেগে ওঠে। ১৯৭১-এর ঈদটি ছিল আত্মীয় পরিচিতিবিহীন, নিরানন্দ।

প্রশ্ন : বর্তমানে ভাষা ও উচ্চারণের বিকৃতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী ?

উত্তর : মাতৃভাষার জন্য জীবনদান করার পর ভাষার ভুল ব্যবহার ও উচ্চারণ বিকৃতি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা ভাষার জন্য প্রাণ উজাড় করি। বাকি এগারো মাস আমরা চৈতন্যরহিত থাকি। রাস্তাঘাটের ভুল সাইনবোর্ডগুলো ঠিক করার ব্যাপারেও আমরা নীরব থাকি। কারো কোনো উদ্যোগ দেখি না। ভাষাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা এফ.এম. রেডিওতে দেখা যায়। মালিকদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি মাতৃভাষাকে করুণা করে মাত্র। ভাবা যায় না, এই বাঙালি বায়ান্ন সালে কি করে জীবন উৎসর্গ করল। নিজেদের মুখ লুকানোর জায়গা নেই।

প্রশ্ন : আপনার সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি সম্পর্কে কিছু বলুন ?

উত্তর : সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ আমি অনেক পুরস্কার পেয়েছি। সবচেয়ে বেশি পেয়েছি পাঠকদের ভালোবাসা। সর্বপ্রথম ১৯৬৯ সালে ড. মুহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক পাই। এরপর ১৯৮০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছি। ১৯৮১ সালে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৪ সালে ফিলিপস্ সাহিত্য পুরস্কার এবং অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার, ২০১০ সালে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছি। রাষ্ট্রীয়ভাবে একুশে পদক ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি।

প্রশ্ন : *সচিত্র বাংলাদেশ* নিয়মিত পড়েন কি-না ?

উত্তর : নিয়মিত পড়া হয় না। তবে হাতে পেলে পড়ে ফেলি। পত্রিকার বিষয় এবং প্রকাশনার নান্দনিকতা সুন্দর। বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে সম্পাদনা করা হয়।

প্রশ্ন : *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর জন্য আপনার কোনো পরামর্শ আছে কী ?

উত্তর : *সচিত্র বাংলাদেশ* যথেষ্ট পাঠকবান্ধব বলে মনে করি। ভারী ভারী বিষয়ের পরামর্শ দিলে পত্রিকা পাঠকের সহজে পড়ার বাইরে চলে যাবে। যেভাবে সম্পাদিত হচ্ছে হতে থাকুক। ভবিষ্যতে অন্য কিছুর সংযোজন ভাবা যেতে পারে।

প্রশ্ন : নতুন প্রজন্মের জন্য কোনো পরামর্শ দেবেন কী ?

উত্তর : তারা যেন নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও দেশপ্রেম বিষয়ে সচেতন থাকে। বিশ্বের যে-কোনো জায়গায় যাবে তারা ৩/৪ টা ভাষা শিখবে, কিন্তু নিজের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে নয়। আমাদের জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা কোথাও যেন অপমানিত না হয়, সে জায়গায় সচেতন থাকতে হবে।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে আপনাকে জন্মদিনের অগ্রিম শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক শুভ কামনা।

---

*[৩১শে মে শিশু একাডেমিতে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন সচিত্র বাংলাদেশ-এর সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, সাথে ছিলেন কবি জাকির হোসেন চৌধুরী, ফটোগ্রাফার মো. নাজিম উদ্দিন ও প্রতিবেদক **নাহিদা সুলতানা**]*

বড়ো গল্প

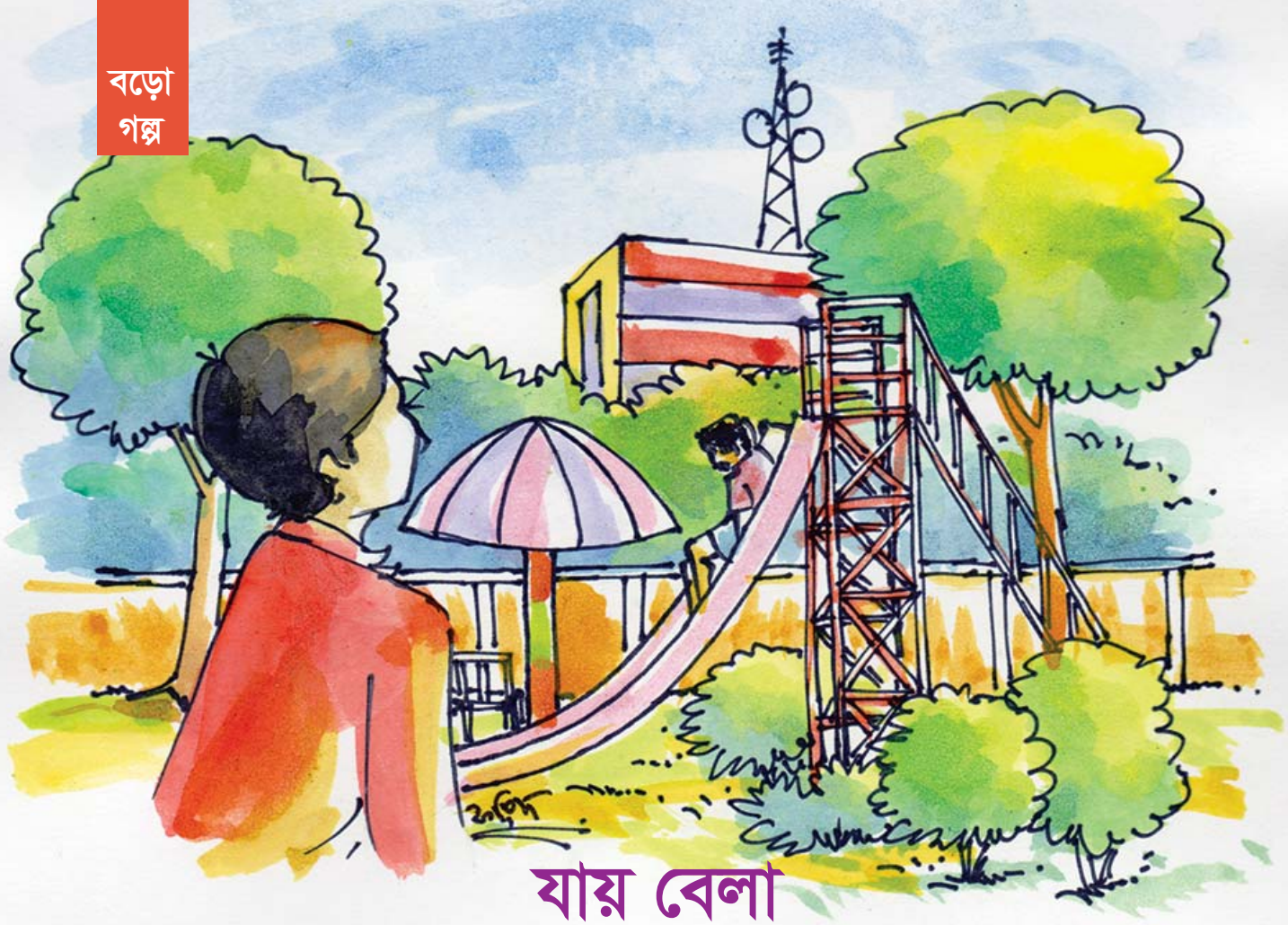

যায় বেলা

আরেফা চৌধুরী

নাহ! আজ আর লেখা হবে না দেখছি, প্রচণ্ড রকম গরম, তার কথা খুব মনে পড়ছে। কী যেন নাম বলেছিল... নিশা। নিশা রহমান। সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। শুধু একবার যদি তার সাথে দেখা হতো! মুরাদের ভাবনাগুলো ভাবনাতেই মিলিয়ে যেতে চাইল। পারেনি সে এই অবুঝ সময়গুলো দূর করে দিতে। সময়গুলো বড়োই কঠিন মনে হতে লাগল তার কাছে। নিশা যখন ছোটো, ছয় কী সাত হবে, সেই সময়ে প্রথম দেখা হয়েছিল একটি পার্কে– চড়ুই পাখির মতো শুধুই উড়ছিল নিশা। পার্কের নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশ তারই জন্য প্রায় ফিরে পেত।

– এ পাখি কী নাম তোমার?

– নিশা

– তোমার সাথে কে আছে?

– একাই আসি আমি, এইতো পাশেই আমার বাসা।

– আচ্ছা! তুমি প্রতিদিন আস?

– আসি, প্রজাপতি খুঁজতে ভালো লাগে তাই।

তারপর অনেকদিন আর পার্কে যায়নি মুরাদ। মুরাদের আজ কিছুতেই লেখা আসছে না। শুধুই নিশার কথা মনে পড়ছে।

ছোট্ট নিশা একদিন তাকে জানায় তারা বাসা ছেড়ে দিয়ে রংপুর চলে যাচ্ছে, কবে দেখা হবে ঠিক নেই। তবে শিকদার বাড়ি গিয়ে তার খোঁজ নিলেই তাকে পাওয়া যেতে পারে। এরকম একটা বক্তব্য দিয়ে নিশা বিদায় নিল মুরাদের কাছ থেকে।

মুরাদ সেই সময় কোনো ব্যথা অনুভব করেনি। কিন্তু সপ্তাহ দুই পরে পার্কে গেলে কেমন যেন ভালো লাগছিল না। নিশার জন্য খারাপ লাগছিল– কেন এতটা মায়া ধরে গিয়েছিল তার কথায়? মুরাদের বিয়েতে একবার দাওয়াত দেবে বলে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আর যাওয়া হয়নি শিকদার বাড়ি। কে, কী মনে করে হয়ত তাই ভেবে।

একদিন পুরোনো ঢাকার পথ ধরে হাঁটছিল মুরাদ। মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে আসার সময় চোখ আটকে যায় লাল-কালো জামা পরা মেয়েটার দিকে। মুরাদ রিকশা করে বাসায় যাবে ভেবেছিল। আবার গেল না, পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল।

মেয়েটাকে পরিচিত লাগছে কেন?

বেলির মালা নেন না ভাইজান, (একটি ছোট্ট মেয়ে এসে পথ আগলে ধরল মুরাদের)।

কী সুগন্ধ তাই না! একটা নিয়ে দাওনা আমায়, (লাল-কালো জামা পরা মেয়েটির মিষ্টি কণ্ঠ বেজে উঠল পেছন থেকে)

মুরাদ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

– তোমার সাথে কেউ নেই!

– আছে, ঐতো চাচ্চু মিষ্টি নিচ্ছে।

– তোমার নাম কী?

– নিশা, এত কথা বলতে হলে চলে যাব।

যেন প্রাণ ফিরে পেল মুরাদ, নিশাতো পরিচিত নাম, পাঁচ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই নামটি। যার জন্য বুকের ছোট্ট জায়গাটায় এখনো কষ্টটা চিনচিন করে উঠে।

– দাঁড়াও নিশা, আমি মুরাদ, তোমার সেই পার্কে দেখা হওয়া হতভাগ্য ভাই।

– কী! আমাকে আপনি চেনেন?

– শিকদার বাড়ির মেয়ে না তুমি!

– জি।

– সেই ছোট্ট বয়সে পার্কে যেতে তুমি প্রজাপতি ধরতে মনে আছে?

– আচ্ছা, তুমি মুরাদ ভাই, কেমন বুড়িয়ে গেছ, চুলগুলো পেকে গেছে, চেনাই যাচ্ছে না, আমিতো বেড়াতে এসেছি চাচ্চুর বাসায়, সপ্তাহ খানেক থেকে চলে যাব। ক্লাস শুরু হবেতো তাই।

– কোন ক্লাসে এখন তুমি? সিক্সে।

– নিশা তুমি সেই পার্কে গিয়ে আমার সাথে দেখা করো। অনেক কথা জমে আছে।

– নিশা আয়, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেতো (চাচ্চু ডাকেন)

চাচ্চুর সাথে নিশা চলে যাবার সময় কেমন আন্তরিকভাবে হাতটা নেড়েছিল, মুরাদ আরো মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

আশ্চর্য! একটি কিশোরীর মধ্যে সে কী খুঁজে পেয়েছে? যা পৃথিবীর অন্য কিছুর মধ্যে নেই! এতটা বছর হন্যে হয়ে ঘুরেছে সেই হৃদয় নিংড়ানো পবিত্র ভালোবাসার খোঁজে। কিন্তু পায়নি কোথাও। সকলে স্বার্থের জন্য ভালোবাসা চায়– টাকা, সম্পদ, ঐশ্বর্য, প্রেম, বিলাস-এগুলোর কী মায়া! এখন নিখাদ প্রেম নাই।

পরদিন পার্কে যাওয়ার জন্য আর তর সইছে না মুরাদের। রাত্রিতে ঘুম হলো না, সকালে তাড়াতাড়ি উঠেই নাস্তা সেরে রওনা হলো পার্কে। বেঞ্চে বসে থাকল অনেকক্ষণ। কোনো খবর নেই, দুপুর গড়িয়ে গেল। মুরাদ বাসায় ফেরার সময় কানে এল, মুরাদ ভাইয়া।

– এসো নিশা, তোমার নাম যেমন নিশা, তেমনি নেশাই লাগিয়ে দিয়েছ দেখছি।

– সরি, ম্যানেজ করে আসতে দেরি হলো। (নিশা আবারো সেই রিনঝিনিয়ে বলা শুরু করল)। এতদিন রংপুরেই ছিলাম, স্কুলে যাই, তবে ওখানে কেমন ভয় ভয় লাগে। সহজ হতে পারি না কারো সাথে। একদিন এক মাস্তান মায়ের হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিল।

– তোমার মা এখন কী করেন?

– স্কুল মাস্টার, পত্রিকায় লেখালেখি করেন। মা বলেছিল, ঐ ছেলেটা নাকি এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেছে। মেয়ে, মদ– এগুলো নিয়ে আস্তানা গেড়েছে। ফেনসিডিল ব্যবসা আর আদম পাচারের সাথেও সম্পৃক্ত আছে সে। মা রিপোর্ট করাতেই, হুমকি দিয়েছে সে। আমি কাল চলে যাচ্ছি ভাইয়া, আপনি আমার খোঁজ নিতে চাইলে বাবার অফিসে খবর নিতে পারেন।

– তোমাকে আমার নম্বরটা দিলে তুমি ফোন করতে পারবে না?

– অবশ্যই পারব। তাহলে আজ চলি, চাচ্চু তাড়াতাড়ি করে যেতে বলেছেন।

– ঠিক আছে, আর আটকাব না। (মুরাদ আটকাবে না বলেছে ঠিকই কিন্তু এখনতো মনে হচ্ছে আটকানোটাই দরকার, কী মূল্যবান সম্পদই যেন সে হারিয়ে ফেলেছে এক মুহূর্তেই, এমন ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে যেন এই কষ্ট আর যাবে না)

তারপর অনেকদিন কেটে গেল। একদিন হঠাৎ রিং বাজল তার মোবাইলে, অপরিচিত নাকি নিশার? অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল কচি কণ্ঠ, মুরাদ ভাইয়া, আপনি ভালো আছেনতো? কাল মায়ের বিয়ে বার্ষিকীতে আপনাকে আসতে হবে, আসছেন তো?

– হ্যাঁ, আসব ইনশাল্লাহ।

২

– তোর কাজটা এখনো শেষ হয়নি? নিশার কাপড়টা সেলাই করার কথা ছিল। এখনই না করলে কাল স্কুলে যেতে পারবে না।

– এইতো করে দিচ্ছি।

– রান্নাঘরে দেখতো কে?– আপামনি আমি।

– ও, মতিনের মা! খালা বাসন বেশি হয়নি আজ। তাই কিছু জামাকাপড় বালতিতে রেখেছি। আমি একটু বেরুচ্ছি। তুমি কিন্তু সবগুলো না ধুয়ে যাবে না। আর রাহেলাকে নিয়ে কাচের জিনিসগুলো মুছিয়ে নিও।

– আফা, আপনের ফিরতি দেরি হইবো?

– না, তেমন দেরি হবে না, একটা কনফারেন্সে যাব।

জেরিনা খানম সভা, মিটিং, মিছিল নিয়ে ইদানীং বেশি সময় কাটাচ্ছেন। জীবন ঘড়ির ছুটে চলা যেমন থামছে না, তার প্রতিটি কাজও তেমনি থামছে না। একটু এদিক-ওদিক হলেই সবকিছু এলোমেলো, রাত করে আসতে গিয়ে সেদিন একদল মাতাল পথরোধ করেছিল। অনেক কষ্টে গাড়ি ঘুরিয়ে অন্যপথে আসতে হয়েছে। হত্যা, গুম, হেরোইন, মাদকের কবলে দেশ ছেয়ে গেছে। গাড়িতে বোমা পড়বে বলে ভয় সর্বক্ষণ। রাজারবাগ দিয়ে আসার সময় তার ব্যাগ নিতে চেয়েছিল যে সন্ত্রাসী, সে তার দলবল নিয়ে জেরিনা খানমের গাড়ির গতিরোধ করে দাঁড়ায়।

– ভাবি আপনি সংবাদ লেখেন, মহৎ কাজ করেন, কোনো লেখাতেই কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু আমার ব্যাপারে আপনি আর বাড়াবাড়ি করবেন না।

– নইলে পরে, সমস্যা হইবো! (দাঁত বের করে হাসে সে)

জেরিনার গা ঘিনঘিন করে উঠে। ভয় আর পুঞ্জীভূত ঘৃণা তাকে কোন আবর্তে যেন ঢেকে দেয়। নিজেকে সহজ করতে সময় লাগে। এরপর থেকেই তিনি রাত করে কোথাও সময় দিতে চান না। সাথে সাহসী কোনো গার্ড থাকলে ভালো হতো।

– মতিনের মা, আমি যাই। খোকা আর মা নিশার খাবারগুলো গরম করে টেবিলে দিয়ে যেও। তারা স্কুল থেকে এসে খেয়ে নিবে। নিশার আব্বুকে দুপুরের আগেই আসতে বলে দিয়েছি। আজ আমাদের বিবাহ বার্ষিকীর কেকটা সকলে একসাথে মিলে ধুমধাম করে কাটব। আমি আসরের আগেই আসব আশা করছি।

– আইচ্ছা, চিন্তা করন লাইগব না আফা।

তোমার আর রাহেলার ঈদের বাজারতো করেছি। আজ কিছু কিনতে পারি নাকি দেখি। লাল জামা না পেলে নিশা আমার ঈদই করবে না।

জেরিনা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। আজ তাড়া আছে। কনফারেন্স সেরে মার্কেট থেকে এসে সকলের সাথে কেক কাটতে চান তিনি ঘরোয়াভাবে, নিশা তার মুরাদ ভাইয়াকে দাওয়াত দিয়েছে।

– বাবা, আম্মুকে আজ আমি শুভেচ্ছা জানাব একটি জিনিস দিয়ে। আর কত দেরি হবে বাবা?, নিশার প্রশ্ন।

– এইতো এখনই আসবে, তুমি খেয়ে নাও মামনি।

– আমার জন্য জামা আনবেতো?

– আনব মা, ।

জেরিনার আসতে দেরি হওয়াতে সামাদ সাহেব খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। রিং দিয়ে মোবাইল বন্ধ পাচ্ছেন, তিনি প্রচুর ঘামতে থাকেন। অঘটন কিছু হবার শঙ্কায় মনটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এমন সময় কলিংবেলটা বিকটভাবে চিৎকার দিয়ে উঠল। তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুললেন– সামনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক।

– এটা কি নিশাদের বাড়ি?

– হ্যাঁ, আপনি? আমি নিশার পরিচিত, সে আমাকে আপনাদের বিবাহ বার্ষিকীতে দাওয়াত দিয়েছে।

– আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে তুমি সোফায় বসো, নিশাকে ডাকছি।

এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। সামাদ সাহেব দরজা বন্ধ করে টেলিফোন উঠালেন। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসল–

– স্যার, আমরা অপরাজেয় ক্লিনিক থেকে বলছি, আপনি একটু তাড়াতাড়ি আসুন। সাংবাদিক জেরিনা খানমের প্রচুর রক্তের প্রয়োজন।

সামাদ সাহেব স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়লেন।

– নিশা, তাড়াতাড়ি আয়, তোর মা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, রক্তের দরকার। আমি গেলাম, (তিনি পাগলের মতো কথাগুলো বলেই বেরিয়ে পড়লেন।

ক্লিনিকে এসে ছুটে গেলেন ডাক্তারের কক্ষে)

– জেরিনা খানমের কেবিন কত নম্বর ?

– একশ চার নম্বর রুম।

সামাদ সাহেব ছুটে গেলেন সেখানে। জেরিনাকে তখন অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে।

– আপনি বি-নেগেটিভ রক্ত জোগাড় করুন। প্লিজ... (চিকিৎসক অবহিত করলেন সামাদ সাহেবকে)

সামাদ সাহেব ব্লাড ব্যাংকে গেলেন। আবার আত্মীয়স্বজন অনেককে রিং দিলেন রক্তের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে। তিনি ব্লাড নিয়ে আসতে আসতে জেরিনা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। হতভম্ব সামাদ সাহেব কী করবেন ভেবে পান না। জেরিনা অভিমান করেই কি নিশার পছন্দের লাল জামায় লাল রক্তে ভিজে একাকার করে চলে গেল!

সামাদ সাহেবের মনটা হু হু করে কেঁদে উঠে।

পরদিন খবরের কাগজের শিরোনাম হয় 'রহস্যজনকভাবে অ্যাক্সিডেন্টে সাংবাদিকের মৃত্যু'।

বিবাহ বার্ষিকীতে অংশগ্রহণ করতে আসা মুরাদ খুবই আপসেট হয়ে গেল। নিশার পরিবারে এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটবে কে আশা করেছিল? সকলেই ভাবছে, এটা নিশ্চয় মাস্তানটার কাজ, যে কি-না তাকে হুমকি দিয়েছে।

রক্তে ভেজা লাল জামাটি বুকে জড়িয়ে নিশা বাকরুদ্ধ হয়ে বসে রয়েছে। ঈদের জামাটিই মায়ের স্মৃতির নিশান হিসেবে চিরজীবন আঁকড়ে ধরতে হবে নিশাকে।

নিশা ভুলতে পারে না তার মায়ের মৃত্যু দিনের সেই বিভীষিকাপূর্ণ সময়। প্রতিটি সময় হাহাকার শব্দে পদচারণা করে বেড়ায়। নিশার লালিত স্বপ্নগুলো বিরস বদনে তাকে তাড়া করে ফেরে। নিশার চিৎকার করে মাকে বলতে ইচ্ছে করছে,

চির অম্লান রবে তুমি ধৈর্যে,
দেব না হতে ক্ষয়, রবে অক্ষয় মিশনে।

৩

নিশাদের বাসা থেকে ফিরে এসে মুরাদ খুবই ক্লান্তবোধ করছে। চেয়ারে নিশ্চুপ বসে থেকে ভাবছে কত কী কথা– আজও দু-চার পাতা লিখতে গিয়ে আর পারেনি। প্রচণ্ড মাথাব্যথা করছে। কড়া করে এক কাপ চা বোধ হয় প্রয়োজন ছিল।

মানুষগুলো এমন নিষ্ঠুর কেন হয়ে গেছে ভাবছে মুরাদ। প্রচণ্ড গরমে চেহারা এমনই খারাপ দেখায় তার উপর যদি কথা হয় আরো রুক্ষ তবে কি আর ভালো লাগে? একটি চিঠি পোস্ট করার জন্য সেদিন মুরাদ ডাক বিভাগে গিয়েছিল। একটা হলুদ খামের জন্য তিন টাকা দরকার, তার কাছে পঞ্চাশ টাকা আছে।

কাউন্টারে বসা লোকটা মুখ বিকৃত করে বলল, তিন টাকার জিনিসের জন্য পঞ্চাশ টাকা কেন? ভাংতি না দিলে খাম পাবে না।

– গাড়ি করে আসতে ভাংতি সব শেষ, এখন দু টাকার একটা নোট আছে।

– আমাদের কাছে ভাংতি থাকলেও দেওয়াটা নিয়মে নেই।

মনটা খারাপ করে মুরাদ চিঠি পোস্ট না করে ডাক বিভাগ থেকে চলে এল। দুটাকা ছিল, এক টাকার জন্য আবারো তাকে একশ টাকা খরচ করে আসতে হবে। পঞ্চাশ টাকাটা ভাংতি দিলেই লোকটার কী এমন ক্ষতি হতো?

প্রতিদিন বের হলেই ভাংতি টাকার দরকার, টেম্পুতে উঠলেও বলে ভাংতি দেন। রিকশায় উঠলেও বলে ভাংতি দেন, বাসেও বলে ভাংতি দেন। তারা না হয় লেখাপড়া নেই বলে কথাটা খুব বিশ্রীভাবে আঘাত দিয়ে বলে, কিন্তু সাহেবতো শিক্ষিত ছিল, প্রচণ্ড গরমে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মনগুলো কঠিন হয়ে গেছে, নাকি মনটা গরিব হয়ে গেছে? যেখানে প্রয়োজনের সময় এক টাকার জন্য কেউ ছাড় দেয় না।

মুরাদ তার রুমে সটান হয়ে শুয়ে পড়ল, আজ আর খাবার রুচি নেই।

৪

– তোর নাম কিরে? এখানে কী করছিস!

– আমার নাম সগীর, কাগজ খুঁজি।

– থাকিস কোথায়?

– দূরের বস্তিটায়।

– আর কেউ থাকে সাথে?

– মা আছে।

– আচ্ছা, তুই কাল সকালে ঐ নীল বিল্ডিংটায় যাবি, চাকরি দেব, এত কষ্ট করতে হবে না, বেতন ভালো হবে।

সগীর কথামতো সকাল হবার আগেই বের হয়ে পড়ে।

কী আছে ঐ নীল রঙের বিল্ডিংয়ে? সগীরের মতো টোকাইদের টাকা আর কাজ দরকার, সেটা কি পাবে?

– বড়ো সাহেব আছেন (দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে সগীর)

– তোর দরকারটা কী, ঝামটা মেরে দারোয়ান কী বলে।

– আমারে আইতে কইছে।

– দাঁড়া, দেখি, সগীর অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়। নাহ! আর পারা যায় না।

– এসেছিস, আয় ভেতরে আয় (রেজা সাহেব তাকে ডাকেন)

বস এখানে, তোর কাজ আজ থেকেই শুরু কর। এই যে ওষুধের বাক্সগুলো দেখছিস, এগুলো ঠিকানা অনুযায়ী শুধু পৌঁছে দিবি হাতে হাতে। প্যাকেট প্রতি একশ টাকা পাবি। পুলিশকে এড়িয়ে চলবি। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তোকে মরতে হবে। পারবিতো?

– ওষুধের বাক্স কেন পুলিশ দেখবে?

– ওসব তুই বুঝবি না।

– আইচ্ছা, স্যার আমি আজ যাই।

সগীর ওষুধের বাক্সগুলো থলেতে ভরে বেরিয়ে যায়। প্রতিটি বাক্সের উপর আলাদাভাবে ঠিকানা দেওয়া আছে। কিছু দূর আসার পর সগীরের ব্যাগটা খুব ভারী লাগে। সে ওটা রেখে পাশে একটি কল থেকে পানি খায়, প্রচণ্ড গরমে জানটা অতিষ্ঠ, দুম! দুম! করে হঠাৎ একটি দুটি এবং আরো অনেকগুলো বোমা ফাটে, কে বা কারা সগীরের পাশ দিয়ে ছুরি, রামাদা ও ভারী অস্ত্র নিয়ে দৌড়ে যায়। সে বসে পড়ে মাটিতে। গোলাগুলির আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়। এক সময় সবকিছু ঝিমিয়ে পড়ে, উঠে দাঁড়ায় সগীর, থলে নিয়ে গন্তব্যে হাঁটতে থাকে। সারাদিনের দুটো প্যাকেট পৌঁছাতে পেরেছে ঠিকানা অনুযায়ী।

সগীর এসেছিস! কয়টা চালান হলো? – দুইটা

– ঠিক আছে, কাল সকাল সকাল বের হবি।

পরদিন ভোরে রওনা দেয় সে, মিশু সওদাগরের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার রাস্তাটা ড্রেনের ময়লা পানিতে একাকার হয়ে গেছে। কয়েকজন টোকাই ছড়িয়ে থাকা সাদা কাগজগুলো কুড়িয়ে থলে ভরছে, ময়লার সাথে বসবাসে তাদের জামাগুলো কালো আর চিতায় পরিপূর্ণ।

অ্যাই! দেখছিস না, এখানে ফুলগাছ লাগানো হয়েছে।

ময়লার ডিব্বা ফেলল কে?, কে যেন কাকে বকা দিল।

সগীর কিছু দূরে গিয়ে দেখে, একটা জটলা পেকেছে, সবাই বলাবলি করছে, খুন করে পালিয়েছে রজব আলী তার বৌকে।

কিছুদিন আগে বিয়ে, কিন্তু সংসারে সুখী ছিল না সে, বৌটা পরকীয়ায় মত্ত ছিল।

সগীর এগুলো দেখার সময় পায় না। গন্তব্যে সে এগোয়, আজ কোনো

বাক্সের ওষুধ যথাযথ ঠিকানায় পৌঁছতে না পারলে টাকা পাবে না। মায়ের অসুখটা বেড়েছে, তাড়া করে বাড়ি পৌঁছাতে হবে।

দুপুরের আগেই সে পৌঁছে যায়। মিশু সওদাগর তার পানের দোকানে বসে আছে। থুঃ করে পানের পিক ফেলে মুখটা হালকা করে সে। চুনা বেশি খেতে খেতে মুখে ঘায়ের মতোন হয়েছে, তবুও না খেয়ে পারে না।

পানটি চুন ছাড়া যায় না খাওয়া,
সাথে লাগবে সুপারির মেওয়া।
একটুকু খেতে লাগে ঝাঁঝ
যদি হয় মিষ্টি জর্দার ভাঁজ
তবে লাগে দারুণ মজার আঁচ।

এই পান নেশা ধরাতে এমনকি ক্যানসার আনতে বেশি সময় নেয় না। মিশু সওদাগর এগুলোর ধারই ধারে না। ভবিষ্যৎ নিয়ে তার মতোন মানুষের মাথা ঘামানোটা উচিত মনে করে না। সগীর তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

– আমি সগীর, রেজা সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন।

– ও আইচ্ছা, ওষুধ এনেছিস?

– হ।

– দেহি, তোরডার নেশা কেমন, এর আগেরবার কিন্তু নেশা কম দিছিল। কলেজের বাবুরা খেয়ে মজা পায় নাই।

– কী বলতেছেন, বুঝবার পারি না, আমারে বড়োসাব দেবার বলছে, দিতে আইছি। দুই বাক্স রেখে দেন।

– অ, আইচ্ছা! তুই তাইলে চোখ বন্ধ কইরা আইনছস? একদিন খাইয়া দেহিস, দুঃখ-কষ্ট কাইটা যাইব।

সগীর কথাটার কিছুই বুঝতে পারে না, অবাক তাকিয়ে থাকে।

– ঠিক আছে, তুই যা, দুইডা রাইখলাম (খুলে দেখে সম্মত হয় মিশু সওদাগর)

৫

নিশা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পদার্পণ করেছে, সে মিনহাজকে আগে কখনো দেখেনি, তবে মিনহাজ নিশাকে ঠিকই চিনে।

– নিশা, তোমার আবৃত্তিটা দারুণ হয়েছে। (নিশা অবাক হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে, হয়তবা পরশুদিন ছেলেটা তার আবৃত্তি সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিল)

– আমি মিনহাজ, চতুর্থ বর্ষে আছি। একটু সময় হবে কথা বলার জন্য? চলো, কোথাও বসি।

– আসলে এখনি বাসায় পৌঁছাতে হবে, নয়ত বাবা ভীষণ রাগ করবেন।

– বেশি সময় নেব না।

– ঠিক আছে, চলুন।

দুজনে কফি শপে বসে পড়ে। এতটা কাছাকাছি এর আগে কোনো ছেলের সাথে বসেনি নিশা, তাই নার্ভাস হয়ে পড়ে।

– নিশা, রুমালটা নাও, তোমার মুখ অনেক ঘেমে গিয়েছে।

রুমালটা এগিয়ে দিতে দিতে মিনহাজ বলে।

– ঠিক আছে, না লাগবে না, গরম পড়েছে হয়ত তাই...

মিনহাজ জোরপূর্বক রুমালটা হাতে ধরিয়ে দেয়। পাখার স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে আসে। আশ্চর্য! মেয়েটা এমন লজ্জা পাচ্ছে, না-কি ভয় পাচ্ছে বুঝতে পারে না মিনহাজ।

– দুকাপ কফি দিয়ে যাও (অর্ডার করে মিনহাজ)

কফির কাপটা আসতে এত দেরি করছে কেন? অনেক সময় লাগছে বলে মনে হলো নিশার, না-কি সময়টা শেষ হচ্ছে না! মিনহাজ ছেলেটা এমন তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে আছে কেন তার দিকে! যাই হোক মিনহাজের রুমালটা থেকে একটা মন ভালো করে দেওয়ার সুগন্ধ আসছে। আবারো মুখটা মুছে নিল সে।

– নাও নিশা, কফি খাও, (কাপটা এগিয়ে দিতে গিয়ে আলতো ছোঁয়া লাগল নিশার হাতের আঙুলে, শরীরটা কেঁপে উঠল, নিশার এতটা ভালোলাগা কোনোদিন বোধ হয়নি। মনে এমন তোলপাড় ঝড় উঠছে, আর কী হবে, কী হয়– এই ভেবে আরো ঘেমে- নেয়ে একদশা হয় নিশার)

– থ্যাংকস (ছোট্ট করে কোনোরকম বলে নিশা)

– এমন নার্ভাস কেন নিশা, আমাকে বন্ধু ভাবতে পারো, এবার বল, তোমার পরিবারে কে আছেন?

– বাবা, ভাই-বোন, আর কেউ না।

– তোমার মা?

– তিনি নেই।

– সরি, আমি হয়ত কষ্ট দিলাম জিজ্ঞেস করে। আমি পরিবারে একমাত্র সন্তান। বাবা আমেরিকায় ব্যবসার কাজে প্রায় ওখানেই থাকেন। দেশে আমার মা আর আমি এক রকম নিরানন্দভাব। মা তো সারাক্ষণ একা থাকেন বাসায়, অলস সময় আর কাটতে চায় না। কখন যাব, কখন পৌঁছব –এই চিন্তায় থাকবেন শুধু। আমি ছাড়া আর কে আছে তার? বাবাটা এতটাই ব্যস্ত যে, দেশে আসেন না দশ বছর হলো, যোগাযোগও কম।

– আমি তাহলে একদিন গিয়ে আপনার মাকে দেখে আসব, ছোটো বয়সে আমি আমার মাকে হারিয়েছি।

– অবশ্যই একদিন নিয়ে যাব, মা অনেক খুশি হবেন।

– আজ তবে উঠি।

দুজন রাস্তায় চলে আসে।

– অ্যাই রিকশা, যাবে? রিকশাটা দাঁড়িয়ে পড়লে নিশাকে উঠতে বলে মিনহাজ।

– তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি (বলেই কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে পড়ে মিনহাজ)

– আমি একা যেতে পারব।

– আমার সাথে গেলে সমস্যা হবে না, এসোতো! (আদেশের সুরে একটু দৃঢ়স্বরে বলে মিনহাজ, না উঠে পারে না নিশা, পাশাপাশি এতটা ছুঁয়ে বসাতে নিশা কেমন যেন জড়তা অনুভব করে। অনুভূতিগুলো এতটাই আবেগতাড়িত করছে যে, সে খুবই অসহায়বোধ করে, মনে হচ্ছে সে নিজের মধ্যে নেই, যেন বা অন্যের জন্য তার জন্ম হয়েছে)।

– নিশা, তোমার হাতটা একটু ধরব? (নিশার জবাবের অপেক্ষা না করে সে নিশার হাতটা টেনে নেয়।)

দুজন অনেকক্ষণ এভাবে বসে থাকে। যা কিছু ভাষা, কথা, অনুভূতি, সবই হাতেই যেন সঞ্চালিত হতে থাকে। নিশার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে পড়ে।

এমন একটা মুহূর্ত সে কখনো কল্পনা করেনি। মিনহাজ তাকে এ কোন মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে।

– কাঁদছ কেন নিশা।

– না, কাঁদছি না (লুকানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালায় নিশা, মনের অজান্তে বেজে উঠে সেই সুর)

সময়গুলো যদি ফিরে ফিরে আসত?
রোমাঞ্চিত প্রতিটা ক্ষণ...
তোমায় নিয়ে যেতে যেতে রক্তক্ষরণ
শিহরিত ছোট্ট এ মন...

রিকশা থেকে নেমেই দৌড়ে চলে যায় নিশা। বাসার ভেতর এসে সোজা তার রুমে ঢুকে পড়ে। সামনে-পেছনে-বাঁয়ে তাকায়নি কোথাও। এমনকি সৌজন্য করে মিনহাজকেও আসতে বলেনি, ডায়েরিটা বের করে লিখতে থাকে এলোমেলো পঙ্‌ক্তিগুলো...।

আজ মনটা বড়োই কাহিল হয়ে পড়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে জীবনটায় ছন্দপতন হতে হতে আজ বড়োই ক্লান্ত, অবসন্ন। হঠাৎ মিনহাজের আগমন জীবনে নতুন সুরের আনয়ন করে। অবসন্ন এ হৃদয় এলোমেলো হয়ে গেছে তার ছোঁয়ায়। এতটা ভালোলাগা, মন ছুঁয়ে যাওয়া সুরগুলো অনুরণিত হয়নি এত প্রকটভাবে। ছোট্ট মনের মাঝে ঝড় বইছে। এমন লাগছে কেন? ইচ্ছে করছে এই একঘেয়েমি জীবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে মিনহাজকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। অনেক দূরে হারিয়ে যাই। সুদূর নীলিমায়। যেখানে থাকবে না হানাহানি, ঘৃণা, বঞ্চনা। থাকবে শুধুই প্রেম আর ভালোবাসা। অনুভূতিতে একাকার হবে মোর হৃদয় আকাশ। সমুন্নত নেত্রে চেয়ে থাকব তারই মায়াভরা চোখের দিকে। তার প্রতিটি বাক্য আমার অন্তর্দাহ নিভিয়ে দেবে। মনের মর্মবেদনায় সাগর যেমন করে উত্তাল হয়ে ওঠে, সমগ্র গ্রাম-গ্রামান্তর-লোকালয় সয়লাব হয় পানিতে, বন্যার সেই করুণ সুরে আকাশে-বাতাসে প্রকম্পিত হয় বিকটরূপে হাহাকারের দৈন্যদশায় সুর বাজিয়ে, তেমনি করেই আমার আকুতিলব্ধ প্রেমের মর্মবেদনা তোমার প্রতিটি অনুরেণুতে প্রকট হবে চাওয়ার ফল্গুধারায়।

আমি বলব তোমায়: তোমার জন্যই হে মানব!
বসে রয়েছিনু, কী-বা ছিল এ হৃদয়ে
বোঝা হয়নি এতটা দিন
বুঝতে পারিনি হায়! চেয়েছি তোমারে।

মা যখন চলে গেলেন তখন মনে হতো, নক্ষত্ররাজি তার উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। নীল আকাশ ফ্যাকাশে আকার ধারণ করেছে। সর্বত্র শুধু পরাজয় আর গ্লানি। ফুলের সৌন্দর্য ও সুবাস, লতা ও পাতার একাত্মতা, আকাশ। জমিনের বন্ধুত্ব, নদীর কুলুকুলু গান, পাহাড়ের মহা মায়াকাড়া নেশা, জীবনের সকল মাধুর্যতা এতটা সময়ব্যাপী শুধুই ভুল ছিল। আজ নতুনভাবে আবারো বলতে ইচ্ছে করছে সবকিছু সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। নক্ষত্ররা উজ্জ্বলতা হারায়নি, নীল আকাশ ফ্যাকাশে আকার ধারণ করেনি। ফুলের সৌন্দর্য ও সুবাস ছিল, লতায় পাতায় একাত্মতা ছিল, আকাশ জমিনের বন্ধুত্ব ছিল, নদীর কুলুকুলু গান ছিল, পাহাড়ের মহামায়াকাড়া নেশা ছিল, জীবনের সকল মাধুর্যতা ও এতটা ভালোবাসা শিখানো, ভয় হচ্ছে যদি সে আমায় প্রবঞ্চনা করে? এমনটা হলে আমি অন্ধকার আকাশে নিরবচ্ছিন্ন মূর্তি হয়ে যাব। গন্তব্যহীন হাঁটব এ পৃথিবীর পরে। আমি চাই যে মানব আমায় ভালোলাগাবোধ শিখালো তার মায়াকাড়া ঐ নেত্রে জয়ী হবে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ, তারই হাতের স্পর্শে জীবন খুঁজে পাবে পরিপূর্ণ বেড়ে উঠার সিঁড়ি। তার অনাবিল হাসি সর্বত্র বিলাবে বটবৃক্ষের ছায়া। এতটুকুই যথেষ্ট। বেশি আশা করি না, জীবনের শেষ পর্যন্ত যদিও তার সহাবস্থান না থাকে তথাপি বুঝে নেব সে আমার দৈন্যতার মুহূর্তে পরম বন্ধু হয়ে এসেছিল।

বন্ধু, আমি থাকব সাথি চিরদিন তোরই
দেব তোকে প্রেম, ভালোলাগা আবেগ অনুভূতি
চাঁদনি রাতে, আকাশ পানে খুঁজিস আমায়
তারার মাঝে, চাঁদের সনে সেথা খুঁজিস আমায়।

৬

– হ্যালো, নিশা, আমি মুরাদ বলছি।

– জ্বি ভাইয়া, ভালো আছেন?

– আছি কোনোরকম, তবে আকাশটা দেখছি থমথমে হয়ে আছে, কেউ ভালো নেই। এখনই ঝমঝম বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি যদি সকলের গ্লানি ধুয়ে মুছে নিয়ে যেত! কষ্টের সীমা যদি কমিয়ে দিত।

– এভাবে কেন বলছেন ভাইয়া, কিছু হয়েছে?

– হয়েছে, কিন্তু প্রকাশ করতে সমস্যা হচ্ছে। তাই তোমাকেই শুধু বলার সাহস সঞ্চয় করেছি। একটি করুণ হত্যাযজ্ঞ আমার জীবনে কেন যে দেখতে হলো। সেই দুর্বিষহ সময়টুকু আর ভুলতে পারছি না। সবকিছু এলোমেলো লাগছে। গত সোমবারের ঘটনা, একটি বিয়ে বাড়ি থেকে রাত করে বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি দোকানের ভেতরে বাতি জ্বলছে কিন্তু বাইরে থেকে তালা দেওয়া। কিসের যেন টুং করে আওয়াজ শুনলাম। বিকট শব্দে কে যেন চিৎকার করে উঠল, আবার হাসির শব্দ– আশপাশে চেয়ে দেখি, কেউ নেই, জনমানব শূন্য এমনকি একটি গাড়িও, রাতের নিস্তব্ধতা সবখানে, আমি হঠাৎ ভয় পেতে শুরু করি। তবু দোকানটার কাছে গিয়ে ফুচকি দিয়ে ভেতরে তাকাই, যা দেখতে পেলাম তাতে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। কেউ একজন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

– শালা ময়দার বস্তায় হেরোইন নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে ভাগ দিসনি। জানব না মনে করেছিস? তুই বেঈমানি করছস, আমাগো লগে, তোকে আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই (একটা মোটা লোক তাকে শাসায়)

– আমায় ছেড়ে দাও, যা টাকা চাও দেব (অনুনয় করে পড়ে থাকা লোকটা। হু হু করে হেসে ওঠে কুৎসিত লোকটা)।

একটি লম্বা ধারালো ছুরি চিকচিক করছে লোকটার হাতে। ওটা নিয়ে উদ্ধত হয়ে সে লোকটাকে মারার জন্য প্রচণ্ড আঘাত করে। চারদিকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে।

– শালা, তোর জন্য ব্যবসায় মার খেয়েছি, অ্যাই! পাশের পচা পুকুরটাতে লাশটা ফেলে দিয়ে আয়।

বৃত্তান্তটা বলা শেষ করে হাঁপিয়ে উঠে মুরাদ।

– ভাইয়া, আপনি এগুলো নিয়ে ভাববেন না ।

– না, ভাবি না, চোখের সামনে ভাসে ঐ দৃশ্যটা। তোমার বাবা কেমন আছেন?

– বুকে ব্যথা ছিল যে সেটা একটু বেড়েছে, আজ দেখি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

– মিনহাজরা এসেছিল?

– হ্যাঁ, এসে নেকলেস দিয়ে গেলেন তার মা, আপনাকে আসতে বলেছিলাম আসেননি তো।

– আসলে আজকাল রাত করে কোথাও যেতে ভয় পাই।

– প্রয়োজনে এখানে থাকতেন তবুও আসলে বাবা খুশি হতেন।

– ঠিক আছে, তোমার বিয়েতে ঠিকই যাব। তোমার ভাবিতো পরিবারের সবার জন্য আর তোমার জন্য সুন্দর একটি শাড়ি কিনে রেখেছে।

– ভাবি আর কমল কেমন আছে? কমলটা খুব দুষ্ট হয়েছে তাই না?

– সবাই ভালো আছে। দুষ্টামি করার সময় কোথায় এখন। স্কুলে যায়। পড়া তৈরি করে, ঘুম থেকে উঠেই আবার স্কুল। সময় যে কোন দিকে চলে

যায়, তোমার ওখানে যাওয়ার জন্য সেও আগ্রহ দেখাচ্ছে।

– আপনারা এক সপ্তাহ আগে থেকে চলে আসবেন। ঘরের মানুষ আপনারা ছাড়া আর কে আছে?

৭

রিকশা নিয়ে আসার সময় সেদিন বাসের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে পায়ে ব্যথা পায় নিশা। মার্কেট করতে গিয়েছিল, কিছু ঘরের সামগ্রী আর নিজের জন্য জিনিস কিনতে। গায়ে হলুদের বাজারটা মিনহাজ তাকে করতে বলেছিল। নিশা রাজি হয়নি, তবে একটি সেট সে পছন্দ করেছে। লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি অনেক রঙের পাথর দেওয়া লকেটটিতে। নকশাটি দারুণ লাগছিল নিশার কাছে।

– নিশা মা, এসেছিস, তোর মুরাদ ভাই আর তার পরিবার এসেছে, যা উপরের রুমে গিয়ে দেখা করে আয়।

– আচ্ছা বাবা। (একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে উপরে উঠে নিশা) উপরে উঠার সিঁড়িতে কমল তাকে দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরে।

– অনেক বড়ো হয়ে গেছ দেখছি।

– এসেছ নিশা, আমরা তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। কেমন আছ তুমি? (কমলের মা জিজ্ঞেস করেন নিশাকে)

– জি ভালো আছি।

– ভালোতো থাকতেই হবে। এখনতো শুধু নিজের জন্য নয় অন্যের জন্যও ভালো থাকা চাই।

– ভাবি, ভাইয়া আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন, বিশ্রাম করুন। আমি পরে আসব। কমল তুমি আমার সাথে চল।

আজ ঘর ভর্তি অতিথি। গায়ে হলুদ কাল হবে। অথচ নিশার মনে হচ্ছে এই সময়টুকু খুবই আস্তে আস্তে যাচ্ছে। সে ভাবছে তার জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন এতটা সময় কীভাবে কেটে গেল, কী করে পার হলো এতটা বছর সে নিজেও জানে না। যেন একটা ঘোরের মধ্যেই শেষ হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি তার জীবনেও আজ সুন্দর ও রোমাঞ্চকর সময় এসেছে। রাতের পরে সকালের মিষ্টি রোদ, তারপর আর একটি দিনের সমাগম। সকাল থেকে সন্ধ্যাটা কেটে গেল নিশার বান্ধবী, আত্মীয় সকলকে রিং করে আপ্যায়ন করতে। তাছাড়া অনেক ঘনিষ্ঠজন ঘরে যারা এসেছে তাদের তদারকি তো আছেই। মা থাকলে নিশার কষ্ট অনেকটা লাঘব হতো।

আজ রাতটা হলুদের রাত। গায়ে হলুদ মানে বিয়ের পূর্ব প্রস্তুতি। বিয়ের রাতের একটা টেনশন কীভাবে সহজ করা যায় তার পূর্বের রাতটা হচ্ছে স্বপ্নকে ঘিরে একটি আবর্তন তৈরি করে কঠিন কিছু একটা জিনিসকে সহজ করার কৌশল।

– নিশা, তোমার কেমন লাগছে? আর একরাত পরে তুমি আমার ঘরে আসবে, খারাপ লাগছে না কী ভালো লাগছে? (মিনহাজ মোবাইল করে জানতে চায়)

– খারাপ লাগছে বেশি, নতুনকে ভয় লাগছে।

– আমাকে ভয় পাচ্ছ? আমাদের দেখা হয়েছে অনেকবার, তবুও সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারনি?

– না, তখন ছিল আবেগ আর কাল থেকে হবে বাস্তবতার শুরু তাই। বান্ধবীরা সবাই এসে গেছে। রাখছি আমি, ভালো থেকো।

– কাল আমার কাছে আসা পর্যন্ত ভালো থেকো লক্ষিটি, আল্লাহ হাফেজ।

অ্যাই নিশা, সব মেহমান চলে এসেছে, তুই এখনো কথা বলছিস! সব কথা কাল বলিস, আয়, তোকে সাজিয়ে দিই। বান্ধবী রেবেকা তাকে রুম থেকে বের করে নিয়ে অন্য একটি ঘরে নিয়ে যায়। যেখানে ঝামেলা কম। তারা তিন-চারজন বান্ধবী এসেছে নিশার হলুদ অনুষ্ঠানে তাদের সকলের সাজগোজ বৈচিত্র্যে ভরা। একেকটা পরি যেন খোঁপায় ফুলের মালা, কাতান শাড়ির চাকচিক্যে আর নানা রঙের প্রসাধনীর ব্যবহার, সাথে গহনার বাহারতো আছেই। রেবেকার চুল তার পায়ের হাঁটু ছুঁয়েছে। রেশমি চুলের বাহার নিয়ে দোল খাইয়ে হেঁটে যাওয়া যুবতী মেয়ের এমন রূপ নিয়েই বুঝি কবিতা লিখতে ভালোবাসে কোনো এক পাগল হওয়া যুবক। রেবেকার একবার বিয়ে হয়েছিল, সেটা সে কাউকে বুঝতে দিতে চায় না। তাকে দেখে আজ বুঝাও যাচ্ছে না, তার মনে কত কষ্ট। আজ তাকে বেশ ফুরফুরে লাগছে, তাজা গোলাপের মতো। সতেরো বছরে তার বিয়ে হয়েছে। ছেলেটা ড্রাগ অ্যাডিকটেড সেটা কেউ জানত না। যখন বুঝতে পেরেছে রেবেকা, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বোঝানোর চেষ্টা করলে রেবেকা মার খেত। টাকা এনে দেবার জন্য অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো। হঠাৎ করেই একদিন তাদের ছাড়াছাড়িটা হয়ে গেল। তবে রেবেকার এখন মনে হয়, যদি তখনকার কষ্টটা মেনে নিয়ে পথ চলতে পারত হয়ত একদিন মিরাজ ঠিকই সংশোধন হতো। এখন আর কাউকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না এবং মেনেও নিতে পারছে না। প্রেম ও বিয়ে জীবনে একবারই আসে। বার বার আনয়ন করতে চাইলে সেটি হয় প্রতারণা। অন্যকে এবং নিজেকে ঠকানো।

– এই দেখ নিশা, তোকে কত সুন্দর লাগছে, মিনহাজ ভাই দেখলে অনেক আদর করত, তুই সত্যিই ভাগ্যবতী।

কাজলটানা চোখের মায়ায় ঢাকা আবেশ জড়িত চাহনিতে এত ভালো লাগছে নিশাকে যেন এক রাজকন্যা। চোখের উপর আইশ্যাডোটা চমৎকার মানিয়ে গেছে শাড়ির রঙের সাথে। হালকা পেস্ট কালার শাড়ি আর মুখে রঙিন প্রজাপতির মতো উজ্জ্বলতা তার চাহনিতে কাজলটানা চোখে রাজ্যের ঐশ্চর্য যেন ভর করেছে। ঠোঁটের লিপস্টিক তার কমনীয়তাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠোঁট একটু ফাঁক করলেই তার রূপের গাঢ়ত্ব এতটা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। উপরওয়ালা রূপের কারিগর বলেই হয়ত কারুকাজটা নিশার ওপর আবর্তিত হয়ে ফুটে উঠেছে।

তবুও এই আনন্দের দিনটিতে তার মা না থাকার বেদনা বুকের মাঝে অসহায় একটি প্রভাব বিস্তার করেছে সর্বক্ষণ। মিনহাজ কী করছে এখন ভাবে নিশা। মিনহাজ হাসলে গালে টোল পড়ে, তার সহজ-সরল একটি চেহারা সত্যিই মনটা ভালো করে দেয়।

–হাত দে, মেহেদি পরিয়ে দেই।

নিশার হাতটা টেনে নিয়ে মেহেদি দিয়ে নকশা একে দেয় রেবেকা। এমন করে কার জন্য খারাপ লাগছে নিশার আজ বুঝতে পারে না সে। তার বাবাকে ছেড়ে যেতে হবে হয়তো তাই।

মেহেদি শেষ করে সোজা রুমে চলে আসল নিশা। বিছানায় শুয়ে অঝোরে কাঁদল অনেকক্ষণ। মিনহাজকে রিং দেবার জন্য মোবাইলটা হাতে নিল। করবে কী করবে না চিন্তা করতে করতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পারল না নিশা। সকালবেলা আজানের শব্দে ঘুম ভাঙল। পাখিদের কিচিরমিচির এতটা ভালো লাগছে কেন বুঝার চেষ্টা করল সে। প্রতিটা সকাল যদি এমন নতুনের বার্তা নিয়ে আসত! মনটা ভালো হয়ে গেল নিশার। নামাজ শেষে ছাদে উঠতে গিয়ে পায়ে ব্যথা অনুভূত হলো। ওটা তেমন আমলে নিল না সে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। সবাই ক্লাবে চলে গেল। এত হৈ হুল্লোড়, হাসি, তামাশা-কথা-বার্তা কিছুই নিশাকে আকর্ষণ করতে পারল না। সে কী যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। যেন বা একটা পুতুল। তাকে সবাই যেমন ইচ্ছে করছে। ভারী শাড়ি, গহনা তার শরীরটাকে আরো দুর্বল করে ফেলেছে। নিজের মাঝে কোনো ধরনের কিছুই ভাবতে পারছে না সে। অন্যেরা যা বলছে তাই করে যাচ্ছে বাধ্য বালিকার মতো। অবশেষে গাড়িতে উঠে বসে নিশা। বাবাকে শেষ কদমবুচি করার সময় চোখের পানি বাঁধ ভেঙ্গে ধেয়ে আসল যেন। মেকাপ, শাড়ি-সবকিছুতেই ভাসিয়ে নিয়ে হৃদয়টা ভেঙ্গে দিয়ে গেল। মিনহাজের কাঁধে মাথাটা রেখে কিছুটা হালকা হতে চাইল নিশা।

বিয়ে গাড়ি যাচ্ছে চলে, চলে সূর্য সাথে সাথে,
কনের মন যাচ্ছে ভেঙ্গে, সূর্যটা ঐ যায় ডুবে।
পদ্মপুকুর পাড়ি দিয়ে, গাড়ি যখন যাচ্ছে ছুটে,
মনে হলো, মা বুঝি এক ঝলকে, দেখা দিয়ে হারিয়ে গেল।

তারপর অনেক মাস চলে গেল। এর মধ্যে আর খবর নেওয়া হয়নি নিশার। মুরাদ তার বাবার কাছ থেকে জানতে পেরেছিল, তারা দুজন দার্জিলিং এ গিয়েছিল বেড়াতে। সেখান থেকে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে নিশা। সম্পূর্ণ বেডরেস্টে থাকতে বলেছে ডাক্তার। আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে তার বাড়ি আসার কথা, ডেলিভারি এবং ঈদপর্ব দুটোই বাবার কাছে শেষ করে মিনহাজের বাসায় যাবে।

রোজা শুরু হয়ে গেছে, কতটা ত্যাগ-তিতিক্ষার পর এই সিয়াম সাধনা।

– মিনহাজ, নিশা ভালো আছে তো?– মুরাদ জানতে চায়।

– তার খারাপ লাগছিল বলে ক্লিনিকে ভর্তি করিয়েছি। ডাক্তার বলেছে, আগামী পনেরো তারিখ তার ডেলিভারির সময়। তবে হাইপ্রেসার আর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ। তাই অনেক বিশ্রাম করতে হবে।

– ঠিক আছে, যত্ন নিও।

পনেরো তারিখ সকালে মুরাদ ক্লিনিকে গেল।

– ভাইয়া আমি কাল ক্লিনিকে এসেছি। আগে থেকেই ভর্তি হয়েছিলাম। মাঝপথে চলে গিয়ে আবার এসেছি। গত পরশু রাতে স্বপ্নে মাকে দেখলাম। তিনি কেমন করে হাসছিলেন, ঘুমটা ভেঙে গেল তারপর।

– মা কে নিয়ে ভাবনা কর তাই দেখেছ। নিজের প্রতি যত্ন নাও বোন।

– এই সময় ডাক্তার এসে সবাইকে চলে যেতে বলে। সবাই চলে এলে নার্স কিছু ওষুধ ও রক্তের ব্যবস্থা করতে বলে যাবার আগে জিজ্ঞেস করে, মিনহাজ কে? আমার সাথে আসুন।

– মিনহাজ তার শ্বশুরকে রক্তের ব্যবস্থা করতে বলে নার্সের সাথে গেল।

– এই জায়গাটাতে একটি সাইন দেন। আমরা রিস্ক নিতে পারব না।

যথাসাধ্য চেষ্টা আমাদের থাকবে। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল মিনহাজের। বন্ডসাইন দিয়ে সে নিশাকে দেখতে চায়।

– আমাকে ক্ষমা করে দিও মিনহাজ। হয়তো কথা রাখতে পারব না। মিনহাজের হৃদয় চুরমার হয়ে যায়। বুঝতে দেয় না সে নিশাকে সেটা।

– চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলেই বাইরে চলে এল সে। একটি কঠিন পাথর তার গলাটায় চেপে বসেছে। তারপর অনেকক্ষণ গেল। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর ডাক্তার এসে বলল,

– আপনার একটি ছেলে হয়েছে, সরি, মায়ের অধিক রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তাই...

– কী হয়েছে আমার নিশার ! (চিৎকার করে উঠে মিনহাজ)

কিছুক্ষণ পর নিশাকে নিয়ে আসা হয়। সাদা কাফনে মোড়ানো সেই নিশা আর কোনোদিন কথা বলবে না।

৮

মুরাদের হয়ত-বা আর কোনোদিন লেখা হবে না। সে ভাবতে পারছে না কেন এমন উলটপালট হলো সবকিছু। নিশার ছেলেকে কে মায়ের আদর দেবে। বিধাতার ইচ্ছাতেই নিশার মতো উজ্জ্বল মেয়েটা এখানে এসেছিল আবার সকলকে খুব অল্প সময়ে আপন করে কাঁদিয়ে চলে গেল। সকলকে হাসি-আনন্দে ভরিয়ে দিয়ে হঠাৎ কোন অভিমানে বিদায় নিল। ঈদের আগমনী বার্তা সে উপেক্ষা করে চলে গেল বাবা, ভাই ও স্বামী সকলের ভালোবাসা ও স্নেহের চাইতে তার মায়ের ভালোবাসা ও স্নেহ পাওয়ার জন্যে। হয়তো নিশা এটাই ভেবেছে যে, সকলের সাথে এতটা বছর ছিলাম কিন্তু মাকে সে নয় বছর পর থেকে আর দেখনি তাই মায়ের কাছেই চলে আসলাম।

মুরাদ ভাবছে সেই পার্কের বেঞ্চিতে বসে। বেশিদিনের কথা নয় অথচ মনে হচ্ছে অনেক যুগ যেন চলে গেল। সেই প্রজাপতিটা ক্ষয়ে যেতে যেতে একদিন নিঃশেষ হলো।

যায় বেল যায় বেলা জীবনের
বিদায় হলো উজ্জ্বল এক নিশার
একদা যাব আমিও নিভি
স্মৃতিতে জ্বলবে এ -লেখাগুলো।

উজ্জ্বল নক্ষত্রটা সারাক্ষণ জ্বলছে। আকাশের বুকে রাতের অন্ধকারে তাকে অনেক আলোকিত মনে হচ্ছে মুরাদের। ঐ তারাটাই কি নিশা!

– স্যার, আমরা পার্কের প্রধান গেটে তালা লাগিয়ে দিচ্ছি, রাত অনেক হয়েছে। আপনি যাবেন না স্যার!

একটা লোক এসে মুরাদের ধ্যান ভঙ্গ করে দেয়, সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে প্রায় এগারোটা, তড়িঘড়ি কর উঠে পড়ে মুরাদ। বাসায় সবাই চিন্তা করবে।

রাস্তায় একটা গাড়িও নেই। চারদিক নিরবতা, একটা ট্রাক থেকে বালু ফেলছে মিস্ত্রিরা রাস্তায়। সেখান থেকে ওগুলো অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় মুরাদ বাসার দিকে। ডাস্টবিনটার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা লোক অলসভাবে বসে আছে দেখল, নাকি নেশা-টেশা করছে কে জানে! ওদিকে তেমন না তাকিয়ে হাঁটতে থাকে মুরাদ। কুকুর দুটো কোথা থেকে এসে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। তেমন গ্রাহ্য করে না সে, পথঘাট ভেজা ভেজা। বৃষ্টি হয়েছিল দুপুরের পরে। এখনো স্থানে স্থানে পানি জমে আছে। মুরাদ একবার ভাবে, নিশার ছেলেটাকে দেখে যাবে। আবার ভাবে, না, এত রাতে তাদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না। ছেলেটার নামটা মুরাদই দিয়েছে। দিয়া রহমান, নিশা রহমানের ছেলে দিয়া রহমান। সে একদিন বড়ো হয়ে পৃথিবীটাকে জয় করবে। সকলের দুঃখ, দৈন্য, জীর্ণতা হাতের মুঠোয় এনে সুখী করবে সমাজটাকে।

মা, দেখ দিয়াকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। চাঁদের আলো তার মুখে পড়েছে। কী সুন্দর করে হাসছে, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ছেলেকে আদর করে মিনহাজ। আজ সপ্তাহ হয়ে গেল নিশাবিহীন এই ঘর। একটি খুশির আমেজ আনতে গিয়ে আরেকজনের এভাবে চলে যাওয়া এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না মিনহাজ।

– বাবা, তুই ঘুমাতে যা, দিয়া সোনাকে আমি দেখব।

মিনহাজের মা ছেলেকে অনুরোধ করেন। তিনি রান্নাঘর থেকে দিয়ার খাবার তৈরি করে আনলেন।

– না, মা, আমি ওর পাশেই রাত কাটিয়ে দেব মা।

– পাগলামি করিস না, কাল অফিস করবি না? এখন যা বলছি, অনেক রাত হলো তো।

– আমার ঘুম আসবে না মা, প্লিজ, আরেকটু থাকি!

– সকালে দিয়ার নানা এসেছিল। কাঁদছিলেন খুব। সবই ভাগ্য! লোকটা খুব একা হয়ে গেলরে! ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন মিনু আক্তার। তিনি নিজেও কিন্তু অনেক কষ্টে আছেন, স্বামী থাকতেও নেই। তার আর ছেলের খবর নেয় না প্রায় চার-পাঁচ বছর হবে। অনেকে বলে, আমেরিকায় বিয়ে করে সুখেই আছেন তিনি। ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে করতে এখন নাতির কথাও চিন্তা করতে হচ্ছে। দিয়াকে তিনি কতদিন দেখে রাখতে পারবেন। তার বয়স হয়েছে। তাছাড়া মিনহাজ জীবনের এতটা পথ পাড়ি দিবে কার সাহচর্যে। এসবই ভীষণ ভাবিয়ে তুলে মিনু আক্তারকে। মিনহাজকে কিছু বলার সাহস পান না তিনি। এসব ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙল দিয়ার কান্নায়।

– দাদু, কান্না করে না। এইতো দাদু আমি আছি।

ফ্ল্যাক্স থেকে গরম পানি নিয়ে ফিডার বানিয়ে খাওয়াতে চেষ্টা করেন তিনি। একটু কোনো রকম খেয়ে আবার কান্না করে দিয়া। মিনু আক্তার কাঁধে নিয়ে কান্না থামাতে চেষ্টা করেন। কতক্ষণ হাঁটলেন। একটু শান্ত হলে আরেকটু খাওয়ালেন। এইভাবে প্রতিটা রাত মিনু আক্তারের কষ্ট করতে হচ্ছে।

সকালবেলা নাশতার টেবিলে মিনহাজ জিজ্ঞেস করে, মা তুমি সারারাত ঘুমাতে পারছ না। আমি বুঝতে পারছি। একটা বুয়া রাত্রে এসে থাকবে

এই রকম পাওয়া যায় কি-না অথবা সারাদিন-রাতের পাওয়া যাবে কি-না বিজ্ঞাপন দিলে ভালো হয়, তাই না মা?

– কী বলছিস! এত পিচ্চি বাচ্চাকে আরেকজনের উপর ভরসা করে ছেড়ে দিতে পারব আমরা! আজকাল কাজের মানুষের বিশ্বাস নেই। আমি বলি কী...

– বলো মা, কী বলতে চাইছ?

– বলতে চাই কী বাবা, একজন আপনজন দরকার দিয়ার জন্যেও, তোর জন্যেও।

– মানে!

– বুঝলি না বাবা! আমাদের নিশার বান্ধবী, রেবেকা রোজই এসে দিয়াকে আদর করে যায়। বেচারি বিয়ে করেও বাচ্চার মুখ দেখল না। তাই দিয়াকে বেশি আদর করে। তুই রাজি হলে...

– মা এসব কী বলছ! আমি...

– থাক বাবা, আমি আর দায়িত্ব নিতে পারব না। আজই তার বাবার সাথে কথা বলব আমি।

– মা, নিশার বাবা অনেক কষ্ট পাবেন। তাছাড়া...

– আমি নিশার বাবাকে বলে দেখেছি। তিনি মত দিয়েছেন। তড়িঘড়ি করে অফিসের ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল মিনহাজ। ছেলেকে দেখে যেতেও ভুলে গেল।

ভাবছে মিনহাজ, এমন হলো কেন জীবনটা! জীবন সুতোয় টান পড়লে একজন যায়, একজন আবার পূরণ হয়... এভাবেই কি মানুষের স্থায়িত্বের কোনো মূল্যায়ন নেই। নাহ! নিশাকে কোনোমতেই ভুলতে পারব না। আমার প্রথম ভালোবাসা, প্রথম স্বপ্ন হৃদয়ে গাঁথা থাকবে চিরজীবন, হোক সে অচিনপুরের বাসিন্দা। আর কারো প্রয়োজন পড়লেও তার স্থানটা হবে অনেক পরের স্টেপে।

ভাবনায় ছেদ পড়ল একটি কোলাহলের কারণে। সামনের খুঁটিটাতে বেঁধে রাখা হয়েছে একজন মানুষকে। রক্তাক্ত শরীরে ব্যথায় কাতরাচ্ছে সে, কয়েকজন বলাবলি করছে, চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে সে।

চোরটা বলছে, সে চুরি করতে আসেনি। নিজের একটা ইচ্ছা পূরণের জন্য এসেছিল। সে চেয়েছিল উঁচু দেওয়াল টপকে তার প্রেমিকার সাথে একটু দেখা করতে। বান্ধবীকে তার বাবা বন্দী করে রেখেছে প্রায় মাস হয়ে গেল। কর্তা সাহেবতো এমনিতেই তার উপর ক্ষ্যাপা। সুযোগ পেয়ে চোর উপাধিটা লাগাতে দেরি করলেন না সে কারণে। যার দরুণ জনগণ ইচ্ছামতো পিটুনি লাগাল ছেলেটাকে। এখন বেঁধে রেখে পুলিশে তুলে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। আমরা এমনই যে, সামনে ঘটমান বিষয়টাই মূল। কেন ঘটল তা যাচাই করার ভার আমাদের জন্য বিবেচ্য নয়।

মিনহাজ এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে দেখার চেষ্টা করল। সবাই এমন ঘিরে রেখেছে তাকে যেন চোর দেখার বাসনা তাদের পূরণ হচ্ছে না। তাই কেউ সরতে চাইছে না। মিনহাজ আরেকটু কাছে গেল অতিকষ্টে। হঠাৎ ছেলেটা চিৎকার করে উঠল। বাঁধনমুক্ত হবার চেষ্টা করল বৃথা।

– মিনহাজ ভাইয়া, আমি সেলিম। আপনাদের পাড়ায় থাকি। চিনতে পারছেন না। ওরা সবাই আমাকে ভুল বুঝছে। আমি চোর নই। দয়া করে আমাকে বাঁচান আপনি।

অবাক হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে মিনহাজ। সেলিমকে চিনতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। চুল এলোমেলো, পুরো শরীরে রক্ত ছোপ ছোপ লেগে আছে। মুখে অনেক গ্লানি আর কষ্টের দরুণ দেখতে বিশ্রি দেখাচ্ছে। তারপরও মায়ামাখা একটা চেহারা এখনো ঢেকে যায়নি।

মিনহাজ তাড়াতাড়ি বাঁধনটা খুলে দিয়ে তাকে অতিকষ্টে টেনে তুলল। মনে হচ্ছে পা ভেঙ্গে গেছে, এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে কোনো রকমে। দুজনে রিকশা নিয়ে বাসায় আসল।

৯

এমন বিরক্তিকর লোডশেডিংটা আর ভালো লাগছে না মুরাদের। আজ একটু লিখবে বলে বসেছিল টেবিলে। কবিতার খাতা মেলে ধরে বসে রয়েছে সে। কলমটা চলছে না। লেখা অনেক কিছুই জমা হয়ে আছে। কিন্তু পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর কারেন্ট আসছে আর যাচ্ছে। জেনারেটরের আলোয় ভালো দেখা যায় না।

– নাহ! মুডটাই অফ হয়ে গেল দেখছি। (নিশ্বাস ফেলে মুরাদ) নিশা চলে গেছে আমাদের জীবন থেকে কিন্তু তার সুঘ্রাণ এখনো বাতাসে মিশে আছে। বাতাসটা এতদিন বিষাক্ত ছিল না। মুরাদের কাছে নিশার বিদায়ের পরে বাতাসটাকে খুবই বিষাক্ত মনে হচ্ছে।

– বাবা, এখনো ঘুমাওনি! কমল এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

– না আব্বু, ঘুম আসছে না।

– বাবা, আজ অনেকগুলো লম্বা ঘাসে বিচ্ছু দেখলাম। তারা ছোটো চাড়াগাছ ও পাতা খেয়ে ঝাঝড়া করছে। আমার সাধের পেয়ারা গাছটায় কত কচি পাতা এসেছিল। সবই বিছার দল খেয়ে শেষ।

– তাহলে তো বিষ প্রয়োগ করতে হবে।

– কাল বিষ নিয়ে এসেতো আব্বু।

– ঠিক আছে, এবার ঘুমাতে যা।

কমল চলে গেলে সে পথে দেখে থাকে মুরাদ। দেখতে দেখতে কত বড়ো হয়ে গেছে কমল। নিশার ছেলেটাও একদিন বড়ো হবে।

একটি উজ্জ্বল তারা সেই কবে থেকেই শুধু মিটমিট করছে। এখন বোধহয় একটু কাছে এসে আরো বেশি জ্বলছে।

রেবেকার সাথে মিনহাজের বিয়ের খবরটা কাল জানিয়ে গেল মিনহাজের মা। আসছে মাসের প্রথম তারিখ দিন ধার্য হয়েছে।

– নিশা, তুমি ঐ দূর আকাশ থেকে সবই দেখছ, তাই না? তোমার ছেলেটা এতিম বলেই তার দেখাশুনা করতেই মিনহাজ আবার বিয়ে করছে। বিশ্বাস কর, মিনহাজের এতে মত নেই। সে আমার কাছে এসে সেদিন ছোটো বাচ্চার মতো কাঁদছিল। জানি না নিশা, জীবন এমন অসহায় ও বিচিত্র কেন হয়। তুমি ভালো আছ তো... (বিড়বিড় করে মুরাদ নিজেকেই কথাগুলো শোনায়)।

কলমটা হাতে নিয়ে খাতাটা মেলে ধরে টেবিলে। হাতাশার পঙক্তিগুলো বেরিয়ে আসে কলমের ফাঁকফোকর দিয়ে। একটি কবিতা লেখা হয়ে যায় মুরাদের। পড়ে দেখে কেমন যেন করুণ অব্যক্ত সুর লুকায়িত কবিতায়। চারদিক নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। লাইটপোস্টের আলোটা কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। কুকুরের ডাকটা কেমন বিশ্রি আর অশুভ মনে হতে লাগল মুরাদের কাছে। শুনশান নিরবতায় আকাশের তারাটা আরো উজ্জ্বল হলো। যেনবা মুরাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তাদের গেটের পাশের একটি কামিনী ফুলগাছ আছে। সেখানে পাতার চাইতে সাদা ছোটো ছোটো ফুলের সংখ্যা বেশি আর সুগন্ধিগুলো চমৎকার। নীরব এই সময়ে তাদের দোল খাওয়া দেখতে বেশ লাগছে মুরাদের। বাতাস যেন সাদা ফুলের মালা গাঁথার জন্যই বেশি করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে ফুলগুলো ঝরিয়ে দিল মাটিতে। সকালবেলা কোনো বালিকা ওগুলো কুড়িয়ে নেবে তার ঝুড়িতে তারপর শখের মালা বানাবে। মুরাদেরও ইচ্ছে করছে কামিনী ফুলের মালা বানিয়ে ঐ দূর নীলিমায় নিশার কাছে পাঠিয়ে দিতে। এতে হয়তো নিশার সেই নিরহংকার মুক্তোঝরা হাসি আবার শুনতে পাবে মুরাদ।

আজ ঈদ, ঈদের আনন্দ সর্বত্র। আনন্দের ঘাটতি শুধু মিনহাজের জীবনে। নিশা চলে যাবার পর থেকে সে জীবনের সকল সুখ হারিয়ে ফেলেছে।

– মিনহাজ, আয় বাবা তোর ছেলেকে কোলে নিয়ে ঈদের দিন একটু পায়েস, সেমাই মুখে দে। অমন বিষন্ন হয় থাকতে নেই ঈদের দিনে।

– মিনহাজের মা মিনু আক্তার ছেলেকে ডাকেন। ছেলেকে কোলে নিয়ে মিনহাজ হু হু করে কেঁদে ফেলে।

– এমন হলো কেন, এমন হবার কথা ছিল না তো।

মিনহাজ ছেলেকে নিয়ে নিশার করব দিয়ারত করতে যায়। দিয়া নিশার কবরের দিকে তাকিয়ে হাসে। চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি শুরু হলো। দিয়ার গায়ে বৃষ্টির ফোটা পড়লে অসুখ হবে তাই মিনহাজ তাড়াতাড়ি জিয়ারাত শেষ করে বাসায় চলে এল। বুকের মাঝখানটায় মিনহাজের শুধুই কষ্ট হচ্ছে। কষ্টে নোনাজল যদি বৃষ্টি ধারায় ধুয়ে মুছে বিলীন হতো! ■

পবিত্র আশীর্বাদ

লিলি হক

এত যন্ত্রণা, সীমাহীন যন্ত্রণা
কী করে সইব, আমি জানি না, বুঝি না
কেন শুনতে পাই হাতুড়ির আঘাত
ঝড়ের কবলে পড়া অকস্মাৎ।
অসংখ্য স্থবির অক্টোপাসে বন্দি করে
তুমি চলে গেলে
হৃদয়ের ক্যাসেট বাজছে অবিরাম
কথাকলি তোমার
অপূর্ব সুরের মূর্ছনায়
অন্তরের পবিত্র আর্শিবাদ
রইল বন্ধু আমার
চলার পথে হাসি গান, অনন্ত অফুরান
বিদায় দেবার সাহস ছিল না
তাইতো বেদনার রেলিংয়ে ভর দিয়েছি
সা সা করে যন্ত্রযান ছুটেছিল তোমাকে নিয়ে
দহিত আত্মার ভাঙচুর জোড়া লাগাতে
অবশ্যই একদিন
প্রিয়তম পাখি হয়ে
প্রিয়ার বাহুডোরে ফিরবেই।

দূরের গাঁয়ে মা

জাকির হোসেন চৌধুরী

হৃদয় মাঝে শুধুই ভাসে আমার দূরের গাঁ
জানিনা তো সে গাঁয়েতে কেমন আছেন মা
আদর স্নেহ পেয়ে যার আমি বড়ো হই
নিজের কাজে তাঁকে ছেড়ে সদাই ব্যস্ত রই।

লেখাপড়া শেষ করে সেই ঢাকায় এলাম মা
তোমার কোলের শ্যামল গাঁয়ে আর ফেরা হলো না
তোমায় ভীষণ মনে পড়ে যখন একলা থাকি
গভীর রাতে জ্যোৎস্না যখন আলোয় মাখামাখি।

তোমার সাথে কত স্মৃতি শুধুই তাড়া করে
নীল সাগরের ঢেউয়ের মতো বুকে ব্যথা বাড়ে
নিজের কষ্ট আঁচল দিয়ে লুকিয়ে রেখেছ
যতই বিপদ আসুক আমায় আগলে রেখেছ।

ঠিকমতো আজ তোমার খবর রাখতে পারি না
একলা তুমি কেমন আছ দূরের গাঁয়ে মা।

ঈদুল ফিত্‌র

মনসুর জোয়ারদার

যুগ যুগ ধরে গাজার দুঃখ
অশ্রু হয়ে যেন অঝোরে ঝরে
বদলে যাবেই চেনা এ দৃশ্য
স্রষ্টার বিচার নয়রে দূরে!

বোমারু বিমান কামান গুলি
নির্বোধের মতো কত জমাবি?
অশান্তি তোদের পিছু হাঁটছে
কী করে এখন বিচার পাবি?

পবিত্র রোজায় যুগ যুগান্তে
ঈদ পয়গাম সকলে পাই
বৈরী সময়ের হিংস্রতা ভুলে
শত্রু-মিত্র মিলে প্রশান্তি চাই।

ত্যাগই ঈদ

শামসুল করীম খোকন

রমজান মাস এলে
সকলেরই প্রাণ
নেক কাজে মেতে পায়
বেহেশতী ঘ্রাণ

তারাবীহ্‌র নামাজেতে
পায় খুজে সুখ
রোজা রেখে দুখিদের
বোঝে ব্যথা-দুখ।

মানুষের প্রতি প্রেম
ভালোবাসা জাগে
নিজে খায় দিয়ে খায়
দুখিদেরও ভাগে।

ফিতরা ও জাকাতের
চলে আয়োজন
বিত্তের বেসাতিতে
ডোবে নাতো মন।

কোলাকুলি ঈদগাহে
রেষারেষি যায়
ঈদ এসে সর্বদা
এই ত্যাগই চায়।

পবিত্র ঈদুল ফিতর

দেলওয়ার বিন রশিদ

মাহে রমজান শেষে
শাওয়ালের চাঁদ
বয়ে আনে
খুশির সওগাত
পবিত্র ঈদুল ফিতর,
আল্লাহ করুণাময়ের
রহমত বারি
নিয়ামত
সুখ কল্যাণ
এ ঈদুল ফিতর,
মানবতাবোধ
সম্প্রীতি
সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্বের
এক মহান শিক্ষা
এ ঈদুল ফিতর,
সব ভেদাভেদ ভুলে
মহা মিলনের আহ্বান
নিয়ে আসে ঈদুল ফিতর
বহতা জীবনে পবিত্র ঈদুল ফিতর
সুখ ঐশ্বর্য ছড়ায়।

বাবা দিবস স্মরণে

বাবা : বটবৃক্ষের ছায়া

মঈনুল হক চৌধুরী

বাবা। আমাদের ভরসা ও ছায়ার নাম। পরম নির্ভরতার নাম। সন্তানের জন্য কী-ই না করেন তিনি! ভাষাভেদে শব্দ আর স্থানভেদে বদলায় উচ্চারণ, তবে বদলায় না রক্তের টান। দেশ থেকে দেশে কিংবা সময় থেকে সময়ে একই মমতায় চিরন্তন বাবা-সন্তানের বন্ধন। সন্তান সামনে এলে সব ক্লান্তি যেন ভুলে যান বাবা। সন্তানের চাওয়াই যেন তার চাওয়া হয়ে ওঠে। বাবাকেই আদর্শ মনে করে সন্তানরা। বাবা সন্তানকে শেখান, কীভাবে মাথা উঁচু করে পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। বাবা মানেই যেন বটবৃক্ষ! বাবা মানে যেন মসৃণ চলার পথ। বাবা মানে নিরাপত্তা, বাবা মানে বিশালতা। বাবাহীন জীবন ধূসর মরুর ঊষর বুক, শ্বাপদ সংকুল বনে দুরু দুরু হৃদকম্পন। বাবাহীন জীবন ছোট্ট ডিঙ্গি নিয়ে উত্তাল সাগর পাড়ি দেওয়ার দুঃসাহসিক চেষ্টার নাম। বিশ্ব বাবা দিবসে দেশে দেশে ঘরে ঘরে সন্তানেরা তাদের প্রিয় বাবাকে একটু আলাদা করে ভালোবাসা ও সম্মান জানায়। দিনটি শুধুই বাবার জন্য। বাবাকে নিয়ে নানা কাব্য তো আছেই, আছে অসংখ্য গান। 'মন্দ হোক আর ভালো হোক বাবা আমার বাবা, পৃথিবীতে বাবার মতো আর আছে কেবা', 'কাটে না সময় যখন, আয় খুকু আয়', 'বাবা আমার মাথার মুকুট চোখের মণি মা, তাদের ছাড়া এই পৃথিবী ভাবতে পারি না'– আরো কত কী। উল্লেখ্য, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে জুন মাসের তৃতীয় রবিবার পালিত হয় এ দিবস। বাবা দিবসের প্রবক্তা আমেরিকার সোনোরা স্মার্ট ডড। তার মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে যখন মারা যান, তখন ডডের বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। আর ডডের বাবা উইলিয়াম জ্যাকসন তখন যুদ্ধফেরত একজন সৈনিক। মায়ের অনুপস্থিতিতে সোনোরা এবং তার ছয় ভাইবোনকে মানুষ করার গুরুদায়িত্ব একাই কাঁধে তুলে নেন সোনোরার বাবা। সন্তানদের মায়ের অভাব কোনোদিন বুঝতে দেননি তিনি। আর বাবার স্নেহের ছায়াতেই বেড়ে ওঠেন সোনোরা ও তার ভাইবোনরা। সোনোরা বড়ো হওয়ার পর অনুভব করলেন এতগুলো সন্তান মা ছাড়া একা একা মানুষ করতে কী ভীষণ পরিশ্রমই না তার বাবাকে করতে হয়েছে। উইলিয়াম তার মেয়ের চোখে ছিলেন একজন সাহসী ও নিঃস্বার্থ ভালো বাবা যিনি তার সন্তানদের জন্য সব সুখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে সোনোরার বয়স যখন ২৭ বছর তখন আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বেই বেশ ঘটা করে পালন করা হতো মা দিবস। মা দিবসের অনুষ্ঠানে সে বছর অর্থাৎ ১৯০৯ সালে চার্চে যান সোনোরা ডড। অনুষ্ঠানে এসেই তার মনে হলো বাবার প্রতি সম্মান জানাতে মা দিবসের মতো বাবাদের জন্যও একটা দিবস থাকা প্রয়োজন। প্রথমদিকে বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষীরা তার এ ধরনের চিন্তা হেসেই উড়িয়ে দেন। কিন্তু তিনি দমবার পাত্রী নন। বাবা দিবস পালনের পক্ষে তিনি জনমত সৃষ্টি করতে লাগলেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্পোকেন মন্ত্রিজোটের কাছে তিনি তার পিতার জন্মদিন ৫ই জুনকে বিশ্ব বাবা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দেন।

অবশেষে তার প্রস্তাব মেনে নিলেও মন্ত্রিজোট ৫ই জুনের পরিবর্তে জুন মাসের তৃতীয় রবিবারকে বাবা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এইভাবে ১৯১০ সালের ১৯শে জুন সোনোরার নিজ শহর ওয়াশিংটনের স্পোকেনে প্রথম বাবা দিবস পালিত হয়। এর প্রায় ৬ বছর পর ১৯১৬ সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এ দিবসকে সমর্থন করেন। একসময় এটা দেশটির আইনসভাতেও স্বীকৃতি পায়। সেই থেকে জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্ব বাবা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭২ সালে আমেরিকায় দিবসটি রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সেই থেকে বিশ্বজুড়ে পৃথিবীর নানা দেশে দিবসটি পালিত হচ্ছে। ইদানীং সবদেশেই বাবা দিবস উদযাপনের চিত্র অনেকটা একই রকম। বাবা দিবসে ছেলে-মেয়েরা বাবাকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠায়, শুভেচ্ছাকার্ড, ফুল, মগ, টাই, টি-শার্টসহ বিভিন্ন ধরনের স্মারক উপহার দেয়। গত কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশেও বাবা দিবস বেশ ঘটা করে পালিত হচ্ছে।

পিতা ও পুত্র

পিতা ও কন্যা

উপহারের দোকানে ভিড় হচ্ছে, টেলিভিশন এবং বেতারে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে, সংবাদপত্রে বিশেষ লেখা ছাপা হচ্ছে। বাবার স্মৃতি এবং বাবাকে নিয়ে বিভিন্ন অনুভূতির কথা লিখছেন পাঠকরাও। বাবা দিবসে পাঠকের সে লেখাগুলো নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বের করছে। উল্লেখ্য, আমরা বাবার হাত ধরেই পৃথিবীকে চিনি। আর একটু একটু বুঝতে শিখি বেঁচে থাকার মানে। বাবা আমাদের পরম বন্ধু। তবে এ বন্ধুত্বের কোথায় যেন ছড়িয়ে আছে খানিক গাম্ভীর্যের মেঘ, কিন্তু ওই মেঘেই ধরা দেয় পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য। প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজ জীবন-অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন, জন্মের পর মায়ের পরেই যে মানুষটি তার নিঃস্বার্থ স্নেহ-ভালোবাসা আর দায়িত্বশীলতার শৃঙ্খলে বেঁধে সন্তানের জীবনকে নিরাপদ ও সুন্দর রাখতে চায়, তিনি হলেন বাবা। সন্তানকে স্বনির্ভর ও সম্পন্ন মানুষ করার স্বপ্ন-সাধনাই যে মানুষটির জীবনের প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়ায়, তিনি হলেন আমাদের বাবা। তাই পবিত্র ধর্মেও মায়ের পাশাপাশি বাবাকে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। জীবন সংগ্রামে শ্রান্ত-ক্লান্ত আমাদের বাবা যে সময়টায় সামান্য একটু নির্ভরতা খোঁজেন আমাদের মাঝে, তখন তাকে উপেক্ষা করা কি সন্তানদের উচিত? যে বাবা সন্তানের মঙ্গল কামনা ছাড়া জীবনে অন্য কিছু কখনো চাননি তাকে যেন আমরা কখনোই নিজেদের ব্যক্তিজীবনে বাড়তি ঝামেলা হিসেবে মনে না করি। আমরা যেন ভুলে না যাই বাবার স্নেহের মাঝে বেড়ে ওঠা আমাদের শৈশব আর কৈশোরের দিনগুলো। তাই বাবা আর সন্তানের সম্পর্ককে কোনো দিবস দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। তারপরও একটি দিনে বিশেষভাবে যদি বাবাকে সম্মান, ভালোবাসা বা কৃতজ্ঞতা জানানো হয়, ক্ষতি কী তাতে? পৃথিবীর সব বাবা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিশ্ব বাবা দিবসে পৃথিবীর শত কোটি বাবার জন্য রইল শুভেচ্ছা আর অকৃত্রিম ভালোবাসা।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

প্রসঙ্গ ১৮ই জুন বিশ্ব বাবা দিবস

পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩

যে মা-বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দিন-রাত পরিশ্রম করে তাদের সর্বস্ব দিয়ে সন্তানদের একটু একটু করে বড়ো করে তোলেন, তাদের সুখ-শান্তির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেন, সেই মা-বাবাকে কোনো সন্তান বোঝা মনে করতে পারে? আমাদের সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে একক পরিবার ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাথে সাথে কোনো কোনো সন্তান সেই পরম মমতা দিয়ে ঘিরে রাখা পিতামাতাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোঝা মনে করে। কখনো কখনো নিজের হাতে গড়া সংসার ছেড়ে বৃদ্ধাশ্রমই হয়ে ওঠে তাঁদের আপন ঠিকানা। কিন্তু সন্তান চাইলেই কি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে পারে মা-বাবা? সন্তানের উপর পিতামাতার কি কোনো অধিকার নেই?

আইন যা বলে

'পিতামাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩' নামের একটি আইন পাস করেছে বর্তমান সরকার। এই আইন অনুযায়ী বৃদ্ধ ও কর্মহীন মা-বাবা তাঁর সন্তানের কাছ থেকে অধিকার আদায় করতে পারেন। এই আইনে প্রত্যেক কর্মক্ষম সন্তানকে তার মা-বাবার ভরণ-পোষণের নিশ্চয়তা দিতে হবে বলে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে:

- প্রত্যেক সন্তানকে তার পিতা-মাতার ভরণ- পোষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- কোন পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকিলে সেই ক্ষেত্রে সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদের পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিবে।
- এই ধারার অধীনে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে পিতা-মাতার একইসঙ্গে একই স্থানে বসবাস নিশ্চিত করিতে হইবে।
- কোন কোন সন্তান তার পিতা-মাতাকে বা উভয়কে তাহার বা ক্ষেত্র মতে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বৃদ্ধ নিবাস কিংবা অন্য কোথাও এক্ষেত্রে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করিতে বাধ্য করিবে না।
- প্রত্যেক সন্তান তাহার পিতা-মাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখিবে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করিবে।
- পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে সন্তান হইতে পৃথকভাবে বসবাস করিলে সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে নিয়মিতভাবে তাহার বা ক্ষেত্রমত তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।
- কোন পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে সন্তানদের সহিত বসবাস না করিয়া পৃথকভাবে বসবাস করিলে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পিতা বা মাতার প্রত্যেক সন্তান তাহার দৈনন্দিন আয়-রোজগার বা ক্ষেত্রমত মাসিক আয়, বাৎসরিক আয় হইতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা বা মাতা বা ক্ষেত্র মত উভয়কে নিয়মিত প্রদান করিবে।

পিতামাতাকে ভরণ-পোষণ প্রদান না করিলে জেল-জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

- কোন সন্তান কর্তৃক এ আইনের বিধান লংঘন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থ, অনাদায়ে অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।
- কোনো সন্তানের স্ত্রী বা ক্ষেত্রমত স্বামী কিংবা পুত্র-কন্যা বা অন্য কোনো নিকট আত্মীয় ভরণপোষণে বাধা প্রদান করিলে বা অসহযোগিতা করিলে তিনি উপরে উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

কোনো বৃদ্ধ বাবা-মা কিংবা উভয়কে সন্তানেরা যদি ভরণপোষণ না করে আইন অনুযায়ী সেবা-যত্ন ও দেখা সাক্ষাৎ না করে তাহলে চাইলেই তারা এ আইনের আশ্রয় নিতে পারেন।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

তাসের ঘর

নাসিম সুলতানা

ফেলে আসা দিনগুলোর কথা আজ অনেকদিন পর মনে পড়ছে সানজানার। কী কঠিন সময়গুলো– কী নিদারুণ কষ্টে পার করতে হয়েছে তাকে। আজ তার মনে হচ্ছে আমি হারিনি। জীবনে সবকিছু পাওয়া যায় না। চারদিকের তিনদিক পেলে একদিক অসম্পূর্ণ থাকে। আর সেটাই বোধহয় সানজানার ভাগ্যে হয়েছে। এ কথাগুলো মনের অজান্তে চোখের সামনে ভেসে উঠতেই কেমন যেন মনটা বেদনায় ভরে ওঠে সানজানার। চোখ বেয়ে অশ্রুর ফোঁটাগুলো বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে। সানজানা মনে করে, কী চেয়েছিল– কী হলো। ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়ত তখন সবাই ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নগুলো দেখে। একটা মনের মতো সংসার–একটা মনের মতো স্বামী।

বাবার বড়ো মেয়ে সানজানা সুলতানা। তিন বোন, দুই ভাইয়ের মধ্যে সানজানা বড়ো। বাবা বিদেশি ফার্মের বড়ো অফিসার। মা গৃহিণী এবং তখনকার দিনের গ্র্যাজুয়েট।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য হাইস্কুলের

টিচারের চাকরি তাকে ছাড়তে হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ভালো লেখাপড়া করে বড়ো হোক– এটা বাবার কথা, ছেলেমেয়েরাও কেউ কারও চেয়ে মেধায় কম নয়। তো বড়ো মেয়ে সানজানার এমএ পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো সেদিনই ইত্তেফাকের চাকরির বিজ্ঞপ্তিটা মায়ের চোখে পড়ল।

সানজানার মা বললেন, দেখ, সরকারি অফিসে সরাসরি প্রথম শ্রেণির চাকরি, এটা কিন্তু ভালো সুযোগ। বিসিএসের সমান মর্যাদা। মায়ের কথা শেষ হলো না।

বাবা বললেন, না না চাকরির দরকার নেই। সানজানার বিয়ে দিয়ে দিব। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বুঝবে চাকরি করবে কি-না।

মা বললেন, বিয়ে বিয়ে করো না তো। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। তারপর বিয়ের কথা বলবা। আর পাত্র দেখেশুনে খুঁজতে হবে। আজকাল ভালো পাত্রের অভাব বুঝলে?

মায়ের লেকচার শুনে বাবা হাঁপিয়ে গেল। বলল– ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি যা ভালো বোঝ কর।

ব্যাস, পরদিন কাগজপত্র রেডি করে জমা দিলো। যথারীতি বাসায় ইন্টারভিউ কার্ড চলে আসল। যথাসময়ে পিএসসিতে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হলো।

ভালোমতো মনে পড়ছে সেদিনের কথাগুলো। পরীক্ষা তো জীবনে সে অনেক দিয়েছে। রেজাল্টও খারাপ নয়। কিন্তু চাকরির পরীক্ষা এই প্রথম। প্রশ্নপত্র পেয়ে দুরু দুরু চিত্তে লেখা শুরু করল। পরীক্ষা হলে গার্ড দেওয়া হচ্ছে অনেক কড়া। মিনিস্ট্রির সিনিয়র অফিসার, লেকচারার এবং আরো অনেকে গার্ড দিচ্ছেন। এদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক বার বার সানজানার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে।

ওহ্ কি ডিস্টার্ব? তার লেখায় বিঘ্ন ঘটছে। তারপরও নিজের মনকে শক্ত করে বলল, দাঁড়িয়ে ঘোড়ার ডিম দেখছে, ওদিকে খেয়ালই করব না। খুব ভালো পরীক্ষা হলো। এক ঘন্টা লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষা হলো। যাক, দুটো পরীক্ষাই খুব ভালো হলো।

বাসায় আসার পর মা বললেন, কি-রে, জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ। চাকরিটা হবে তো? ভাই-বোনেরা খুব খুশি, পরীক্ষা ভালো হয়েছে শুনে। ছোটো ভাই প্রান্ত বলল, আম্মা, আপু পাস। মিষ্টি খাওয়াও।

ওর কথা শুনে সবাই হেসে ফেলল। ছোটো বোন রেজিনা চিনির বয়ম এনে বলল, নে খা। সত্যি সত্যি সবাই একটু করে চিনি খেল। মা বললেন,

কালকে তোদের পায়েস রান্না করে খাওয়াব।

যথাসময় Appoinment লেটার আসল। তার মানে চাকরিটা হয়েছে। বাসার সবাই খুব খুশি। সানজানাও খুশি। ভাবতেও পারেনি চাকরিটা হবে।

নির্দিষ্ট তারিখে গিয়ে জয়েন করল। কিন্তু যে লোকটি পরীক্ষার দিন তার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে লোকটি প্রথম দিনই এসে হাজির। তার সঙ্গে কথা বলতে একটু বিরক্ত বোধ করল। এত আগ বাড়িয়ে খোঁজখবর নেওয়া ভালো লাগছিল না।

সানজানা জানল লোকটার নাম ইমরান চৌধুরী। পেশায় ল'ইয়ার।

সে লোকটিকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করত। কিন্তু তিনি যেন আরো বেশি সানজানার পিছু ছাড়ত না। এক পর্যায়ে তাদের বাসায় গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে তাদেরকেও মুগ্ধ করে ফেলল। ছোটো ভাই-বোনরাও তার ওপর প্লিজ্‌ড। তো বাবা-মার ইশারা সানজানার বুঝতে বাকি রইল না যে-ইমরান পাত্র হিসেবে খুব ভালো। ঢাকায় বাড়ি আছে। তারাও দু'ভাইবোন। বোনের স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। বাবা-মা গ্রামে থাকেন। এরকম একটা প্রতিষ্ঠিত ছেলেকেই তো তাঁরা খুঁজছেন। ইমরানের সঙ্গে কথা বলে সানজানার কিন্তু মনে হয়েছে কী যেন তার বেশি। আবার কখনো মনে হয়েছে কী যেন লুকাচ্ছে। প্রথম থেকেই কেমন যেন তাকে বেশি সুবিধার মনে হয়নি। এর কিছুদিন পরই তার সঙ্গে সানজানার বিয়ে হয়ে গেল। বড়ো মেয়ে হিসেবে বাবা-মা, ভাই-বোনদের আদর-স্নেহ-ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সে স্বামীর বাড়ি চলে গেল।

শুরু হলো সংসার জীবন। তার বাবা-মা যেভাবে সংসার করেছেন মনে হলো তার সংসারটা ওরকম নয়। কেমন যেন খাপছাড়া ধরনের। যাক, নিজের সংসার তো । নানা ধরনের ভুলত্রুটি সহ্য করে প্রথম সন্তান জয় এল সানজানার কোলে।

চাকরি, সংসার, বাচ্চা তিনটা ঠিক রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। প্রত্যেকদিন সময়মতো অফিস যাওয়া রেসপনসেবল ডেস্কে চাকরি করতে হলে মাইন্ড কুল রাখতে হয়। কিন্তু সংসারের চিন্তা তারপর বাচ্চার, আর কি সবকিছুই যেন তার। সব কিছুতে কাজের অজুহাতে অতি সূক্ষভাবে এড়িয়ে যাওয়া ইমরানের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু সানজানা ভাই-বোনদের মাঝে যেভাবে বড়ো হয়েছে ইমরানের এ ত্রুটিগুলো তাকে কষ্ট দিলেও সেগুলো খারাপ দৃষ্টিতে ভাবার সময় পায়নি। এভাবে সংসারের চাকা চলতে শুরু করল। বেশিরভাগ সময় জয়কে মায়ের বাড়ি রেখেই সে অফিস করে। জয়ের বয়স যখন তিন বছর তখন মায়ের বাসার কাছেই একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে জয়কে প্লে-শ্রেনিতে ভর্তি করে দেওয়া হলো।

কিন্তু এর মধ্যে দ্বিতীয় ছেলে শুভর জন্ম হলো। ইমরানই ওর নাম রাখল শুভ। দিন যতই যেতে থাকে ইমরানের ছোটো ছোটো ত্রুটিগুলো তার মনে সূঁচের মতো বিঁধতে থাকে। দায়িত্ব বলতে সংসারে টাকা দেওয়া ছাড়া বাচ্চাদের একটু দুধ বানিয়ে খাওয়ানো, জয়কে কোনোদিন স্কুলে নেওয়া-কিছুই তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

প্রত্যেকদিন রাত বারোটা একটায় বাড়ি ফেরা। ওফ্ আর সহ্য হচ্ছে না। সেদিন রাত করে বাড়ি আসলে সানজানা তাকে জিজ্ঞেস করলো- এ সবের অর্থ কি? তোমার কি কোন দায়িত্ব নেই! এভাবে আর কত কষ্ট দিবা। টাকাই কি সব? আমারও তো একটা মন আছে? তাছাড়া বাচ্চা দুটোকে দেখাশোনা করাও তো

তোমার কর্তব্য।

সে সানজানার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে কথা বলল যেন কিছুই হয়নি। তুমি এত কথা বলছ কেন? টাকা-পয়সা রোজগার করতে গেলে খাটতে হয় বুঝলে। আর ওদের জন্য তো তুমি আছো। এক কাজ কর। তোমার মায়ের বাসার নিচ তলাটা ভাড়া নাও। তাহলে তো যাওয়া আসার সময় নষ্ট হবে না। কত অল্প কথায়, ঠান্ডা মাথায় সলিউশন দিয়ে দিল ইমরান।

আমি তার কথায় হতবাক হয়ে গেলাম। যাক, অগত্যা মা-বাবাকে ওর কথ াটা লজ্জিত কণ্ঠে জানাতে হলো। বাবা-মার বড়ো সন্তান কষ্টে থাকবে? নাতি দুটো কষ্টে থাকবে? বাবা-মা দু'জনে বলে উঠল-আমরা তোকে এ কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম। তা ভালোই হলো। নিচতলা খালি আছে।

তুই কালই চলে আয়।

পরদিন শুক্রবার ছিল বলে মালপত্র গুছিয়ে ইমরান, সানজানা ও বাচ্চা দুটো মায়ের বাসাতেই উঠল। বাবা-মা ও ভাই-বোনরা অনেক খুশি। যেন তাদের মেয়ে তাদের কাছে এসেছে। মা-বাবা ও ভাই-বোনদের অনেক সহযোগিতায় বাচ্চা দুটো ভালোভাবে বড়ো হতে থাকল। সেই সঙ্গে সানজানার যত ট্রেনিংগুলো ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ছিল সেগুলো ফটাফট করে ফেলতে লাগল। ইমরানের ভুল-ত্রুটিগুলো চিন্তা করার সময়ই সে পেলো না।

এভাবে বেশ অনেকদিন কেটে গেল। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। চোর বার বার চুরি করলে একবার ধরা পড়তেই হয়। বাবার বাসায় আসার পর বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে মায়ের বাসাতে টেলিফোন করে বাচ্চাদের ডেকে কথা বলতে হয়। বাসা চেঞ্জ করার কারণে সানজানার টেলিফোন লাইনটির এখনও সংযোগ দেওয়া হয়নি।

ঐ দিন অফিস থেকে এসে সানজানা দেখে বাবার ফোনের লাইনের সঙ্গে সঙ্গে তার টেলিফোন লাইনের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আপাতত তার ফোনের লাইন ঠিক না করা পর্যন্ত। এটাওতো একটা বিরাট সুবিধা পেলো।

এর সপ্তাহখানেক পরের কথা। চোর ধরা পড়ে গেল। ঐদিন ছুটির দিন ছিল। ইমরান কি মনে করে ঘরেই আছে। আমার এখন তার সঙ্গে বেশি কথা বলতেও ইচ্ছা হয় না।

তো একটা ফোন আসল ইমরান ফোনটা ধরে কথা বলতে থাকল। আর প্যারালাল লাইনে বাবার ফোনে ছোটো বোন রেজিনা তাদের কল মনে করে ধরল পরে ওপাশ থেকে দুলাভাই ও অপিরিচিত মেয়ের কণ্ঠ। সে কৌতূহলবশত ফোন কানেই রাখল। ওপাশ থেকে মেয়েটি বলছে–ইমরান, এ লুকোচুরি খেলা আর কতদিন চলবে। তখনই মা এদিকে কি কাজে এসেছে। সে দৌড়িয়ে গিয়ে মায়ের কানে ফোনটি ধরল এবং লাউড স্পিকার দিয়ে দিল। এদিকে মেজ বোন অন্তরা বড়ো আপুকে চুপ করে ডেকে নিয়ে আসল। তারা সকলে মিলে ফোনে অশ্লীল প্রেমের গল্প শুনল। রেজিনা বলল, আহারে আপু কিছুই জানে না। আর সানজানা লজ্জা-দুঃখ-অপমানে মুহ্যমান হয়ে গেল। তার মনে হলো এ জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো ছিল।

আর তাদের মা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, তাদের এত ভালো মেয়েটাকে একটা খারাপ ছেলের হাতে দিয়েছে। ইমরানের চালবাজি যে কত জঘন্য তা বাইরে থেকে বোঝা অনেক কঠিন। এজন্য সংসারে তার আকর্ষণ কম। ছেলে দুটোর প্রতিও তার আদর যত্ন কম।

সানজানার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে মা বললেন-মা, ধৈর্য ধরো। আল্লাহ সব ঠিক করে দিবে। সানজানা মাকে জড়িয়ে ধরে বলল মা, বলেছিলাম না, ওর মধ্যে বিরাট গলদ আছে। আমি তোমাদের কত বলেছি কিন্তু তোমরাও তাকে ভালো বলতে, এখন দেখেছো তো– তার কেমন ছলনা।

চোখের অশ্রুতে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বিশ্বাস ধুয়েমুছে গেল। সে মনে মনে ডিসিশন নিয়ে নিল যে চোর, ভণ্ড, চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে আর সংসার নয়। সে মনকে ধিক্কার দিচ্ছে। কেমন করে এ ভণ্ডের সঙ্গে এক বিছানায় একই ছাদের নিচে থেকেছে। সে শুধু মনে করত কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সংসারের প্রতি উদাসীন কিংবা বেখেয়ালী। ইমরানও বোধহয় সেই দলের। কিন্তু উদাসীন এক জিনিস আর ক্যারেক্টারলেস অন্য জিনিস। সব হজম করা যায়। কিন্তু চরিত্র খারাপ হলে সহ্য করা যায় না। ছোটোবেলায় সে পড়েছিল-

Money lost, Nothing lost. Time lost, Somthing lost

But Character lost, Everything lost.

আজ সানজানা বুঝতে পারছে কি ভুল সে করেছে। কিন্তু তার মা, মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বলল, মা আরো দেখ। সত্য সত্য ঘটনাটা কি। এখনই গণ্ডগোল করো না।

তারপর সানজানা ইমরানের এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলল। তার কাছে যা শুনল তা ঐ ফোনের কথাগুলোর সঙ্গে এক হয়ে গেল এবং অতি সহজে ঐ মহিলার নাম ঠিকানাও পেয়ে গেল। বন্ধুটি আরোও বলল ইমরানকে বহুবার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে শোনেনি। এর দিন দুই পরে সানজানা ও তার দুই ভাই ঐ ঠিকানায় গিয়ে দেখে ইমরান ও সেই মহিলাকে। ওরা ইমরানকে ধরে আনল বাবার সামনে। উত্তম-মাধ্যম লাগাতে যাচ্ছিল তার ভাইয়েরা। কিন্তু বাবার নিষেধ তাদের থামিয়ে দিল। আর সানজানা রাগে, দুঃখে, লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায় এত বছরের সংসার জীবনের ইতি ঘটালো ইমরানকে ডিভোর্স দিয়ে। তার এতদিনকার সাজানো সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল। ■

আমার দৃষ্টি

খান মো. রফিকুল ইসলাম

আমার দৃষ্টি এখন
পাহাড়ি ঝর্ণার সৌন্দর্যে আবদ্ধ
অপরূপ প্রকৃতি
হৃদয় মন আকৃষ্ট
স্রষ্টার কী অপরূপ সৃষ্টি!
আমার দৃষ্টি এখন
ঐ রাশি রাশি পাহাড়ি চূড়ায়
কত রূপ কত শোভা
পাহাড়ি গাঁয়ে
প্রকৃতির কত ভালোবাসা
বৃক্ষ-লতায় চারপাশ ঘেরা
পাখিদের কলকাকলি যেন
স্বর্গীয় ছোঁয়া।
আমার দৃষ্টি এখন
সাগর সৈকত পানে
মনে হয় যেন আকাশ, মাটি আর পানি
একসাথে মিশে একাকার।
আমার দৃষ্টি এখন
নদীর শুভ্র কাশফুলের পানে
বিল-ঝিল-নদীনালা
ফসলের ক্ষেতে
শুভ্র বক দাঁড়িয়ে থাকে
এক পায়ে
অপলক নয়নে
আমার বাংলাদেশ
আমার জন্মভূমি আমার দেশে।

পাণ্ডুর জীবন

আনসার আনন্দ

সূর্যটা হারিয়ে গেলে
দু চোখে সন্ধ্যা নামে
এখন অচেনা অতীত
এই পাণ্ডুর জীবন
শুধুই বদলে যাওয়া।
এই ধূপছায়া সন্ধ্যায়
একা একা ছায়াপথে হাঁটি
নীরব অভিমানে কান্না শুনি...
আমাকে ছুঁয়ে দেখি আমি
এই আছি এই নেই।

নদী নারী বৃক্ষের প্রতি

খান চমন-ই-এলাহি

নদী নারী ফলবতী বৃক্ষের প্রতি
গোলাপ আশ্রিত গুচ্ছ ইচ্ছেগুলি
জীবন স্বপ্ন মাঠে বিচিত্র বাঁক বদলায়
গ্রীষ্মের নির্জন ক্যানভাস তুলির আঁচড় ভালোবেসে

লতাগুল্মের মতো বাহুর প্রণয় জড়ায়
নক্ষত্র রাতের উদম শরীর; ফনা
তোলা সর্পের মতো তীব্র শ্বাস।

স্বপ্ন পরাস্ত নয়, স্বপ্ন আগামীর গান
স্বপ্ন শস্যের মাঠ স্বপ্ন জলের প্রপাত
স্বপ্ন অন্তর্গত নারীর গর্ভালয়
স্বপ্ন ধরিত্রীর ফলবতী হৃদয়।

কণ্টকাকীর্ণ পথের আর্বিভাব

মাজেদুল হক

দৈবচক্রের বিভীষিকায় নিজেকে জড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেছি
সেই সাথে স্থবির হয়ে গেছে মন-মানষিকতা।
দু'চোখ বুজে অন্ধকারের দিকে তাকালেও আলোর মতো
স্পষ্ট দেখতে পাই জড়াজীর্ণ, কন্টকাকীর্ণ
পথের আর্বিভাব...

তখন নিস্পন্দ্য মৃত্যু আলিঙ্গন করে সর্বক্ষণ
মৃত্যুর অভিমুখে, ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও বেগমান
ঢেউয়ের গর্জনে সুপ্ত চেতনা আর ফিরে আসে না
জেগেও ঘুমের ভান করে থাকি।

প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি পদক্ষেপে;
আত্মঘাতী শ্মশানের অগ্নিস্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছি নিজেকে
হারিয়ে যাই অজানা পথে...।

কষ্টের কৃষ্ণপক্ষ

শিলা চৌধুরী

কষ্টের কৃষ্ণপক্ষের মুখোমুখি চাঁদ
জানে না শেষ কোথায় আর কতকাল
জ্বলতে হবে আগ্নেয় অনল প্রপাতে
নেশার ঘোর কাটার দাম নেই মোটে
বাড়াবাড়ি ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে।
এমনটা ভাবা ঠিক নয় জেনে গেছি
তাহলে উপায় খুঁজে বের করা যাবে
তেমন কিছুই দেখছি না ইদানীং
সময় যেভাবে চলছে চলতে থাক।
কষ্টেরা কষ্টে পড়লে তখন একটা পথ
বেরিয়ে আসবে আলোকিত ঝলমলে
দেখবে সবাই চেনাজানা খোলা চোখে।

জড়তাহীন বাস্তবতার অধিকার
আজকাল অনাস্থায় হয় প্রসারিত
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিরোধিতার হামাগুড়ি
শিহরিত উৎসাহের সকাল-সন্ধ্যা
যোজন-বিয়োজনে ব্যর্থ পড়ে আছে
সাধহীন ভয়হীন বিষণ্ন জীবনে
নীরবতা প্রার্থনায় যেন নিরন্তর
অপলক তাকিয়ে থাকা মায়াবী চোখ
সান্ত্বনার হাতছানি চায় ভুলে যেতে
ছোটো ছোটো সুখ অনুভবের ক্ষমতা
দিয়ে হারাতে কৃষ্ণপক্ষের যন্ত্রণাকে।

নকশিকাঁথা

শিবনাথ বিশ্বাস

সৃষ্টির আদিকালে অপরিণত বুদ্ধির মানুষ যে সব আলৌকিক কাহিনির সৃষ্টি করেছিল তাকে আমরা লোক-পুরাণ বা Myth বলি। লোক-পুরাণের মধ্যে মানুষের মনের রহস্যঘন রূপের সন্ধান সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। আজকের নকশিকাথাঁ নিয়ে এমন নানারকম মিথ প্রচলিত রয়েছে।

নকশিকাঁথার মধ্যে দেব-দেবীর সমাবেশ থেকে বোঝা যায় যে, এটি কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি দুর্বলতা অনুভব করেনি, নানান কাহিনির গল্প অবলম্বনে রচিত নকশিকাঁথার রূপ কল্পনা করেছে। কাঁথাটির বিষয়বস্তু আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, এখানে পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ, হর-গৌরীর লিলা, ঐতিহাসিক কাহিনি, লোকগল্প, সবকিছু অবলম্বন করে নকশিকাঁথাটি তৈরি করা হয়েছে। এই সব কাহিনি শুধু লোকশিক্ষামূলক অংশের উপর ভিত্তি করে রচনা করা। লোকশিক্ষার প্রয়োজনে বাংলার পল্লিবালাদের জীবনের নিখুঁত রূপ প্রকাশ করেছে। দেবাদিদেব মহাদেব ও রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনি, হর-গৌরীর মর্তে আগমন অন্যদিকে ধর্মযোদ্ধা গাজীর অলৌকিক কীর্তিকাহিনি, মোগল আমলের আমোদ-প্রমোদের দৃশ্য, রাজা দশরথের ঘোড়ায় চেপে মৃগ শিকার, বাঙালি নারী-পুরুষের জন-জীবনের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

নকশিকাঁথার কেন্দ্রে অবস্থিত বৃত্তাকার পদ্ম মোটিফ হলো সৃষ্টির আদি প্রতীক। এটি অষ্টদল পদ্ম। পদ্মের উপর লক্ষ্মী দেবীর ছবি এখানে নেই। পদ্ম সম্পর্কে গ্রামীণ ব্যাখ্যা হলো যে, সূর্যাস্তের পরে পদ্ম ফোটে। সূর্যের আলোতে পদ্ম নেতিয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কারণ আছে। এই ভাবনা থেকে এই মোটিফটি পল্লি নারীরা ব্যবহার করে। দ্বিতীয়ত, পদ্মের মূল থাকে মাটিতে, ভাসে পানিতে, চেয়ে থাকে আকাশের দিকে, এই তিনের সমন্বয়ে ফোটে পদ্ম। তৃতীয়ত, সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের আকারবিহীন জড়পিণ্ডবৎ অবস্থায় পদ্মের মতো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান ছিল। পদ্ম জলের প্রাণদায়ী শক্তির প্রতীক এবং পদ্ম নারীত্বের প্রতীক।

প্রথম নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা তৈরির ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড ঘটনা বিন্যাসের পদ্ধতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পদ্মের পাশে আলপনা অঙ্কিত মোটিফের মধ্য দিয়ে নারীর মনের কামনা-বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা যেমন প্রকাশ পায় তেমনি এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে তার সৌন্দর্যবোধ।

পদ্মের চারকোণার বেষ্টনীর মধ্যে চারটি শিবলিঙ্গ দেওয়া আছে। তিনটি শিবলিঙ্গের পার্শ্বে দুটি করে ছয়টি সাপ এবং একটির মাথায় বেলপাতা। এখানে শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রতীক বা চিহ্ন। সাকার রূপে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কুমারী মেয়েরা মাটি দিয়ে অতি সহজে এ প্রতীক তৈরি করে। তারা চৈত্র মাসে শিবব্রত পালন করে। ব্রত পালন করতে বেলপাতা লাগে। শিবলিঙ্গের পাশে প্যাঁচানো সর্প হলো শিবের ভূষণ।

বাংলার নকশিকাঁথার দেবদেবীরা হলো লোকিক দেবদেবী। কারণ নকশিকাঁথায় মূল লক্ষ্য হলো ইহজগতের কামনা-বাসনা। তাই এর কাহিনির মধ্যে সমাজ জীবনের ছবি, পারিবারিক-সামাজিক আশা- আকাঙ্ক্ষার চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

প্রথম নকশিকাঁথায় চারকোণা চারটি জীবনবৃক্ষের মোটিফ দেওয়া আছে। এটি হলো সুচ শিল্পের প্রচলিত মোটিফ। বৃক্ষের জীবনচক্রে প্রতি ঋতুতে প্রতীক্ষা করে দীর্ঘজীবন লাভের আশায়। জীবনবৃক্ষ হলো প্রাণ ও উর্বরতার প্রতীকস্বরূপ। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত হলো হর-গৌরীর বা শিব-পার্বতীর লীলা। এই ঘটনাগুলো নির্বাচনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা থাকে। শিবের স্ত্রী পার্বতী। দক্ষরাজার সাতাশ কণ্যার মধ্যে একজন। পার্বতীকে বিবাহ দেবার জন্য স্বয়ংবর সভার আমন্ত্রণে দেবকুলের সকলে উপস্থিত হলো। পার্বতী অন্য কোনো পাত্রকে পছন্দ না করে, শিবের গলায় মালা দিলে শিব পার্বতীকে নিয়ে কৈলাসে চলে যায়।

শিব সম্পর্কে আরো কিছু জেনে রাখা ভালো, শিবের একনাম ভূতনাথ। ভূত অর্থ প্রাণী। তিনি প্রাণিজগতের পালনকর্তা। তার কাছে উঁচু-নীচু কোনো ভেদাভেদ নেই। শিবের বাদ্যযন্ত্রের নাম ডুমুরু। ডুমুরু থেকে সৃষ্টি শুরু। শিবকে নটরাজ বলা হয়। তাঁর ডান হাতে ত্রিশুল থাকে। ত্রিশুল হলো চাবি। মানুষের ধনরত্ন সিন্দুকে রেখে প্রয়োজনে চাবি দিয়ে বের করে থাকে।

এখানে লৌকিকবেশে পৌরাণিক দেবদেবীরা গ্রামবাংলার প্রাণের স্পর্শে সবচেয়ে সপ্রাণ হয়ে ওঠেন। পার্বতী চরিত্র কোনো এক গাঁয়ের বধূ আর শিব কখনো উদ্যমী কখনো হতাশ দরিদ্র এক চাষি। ধর্মের ভেক ও আচারবদ্ধতাকে ছুড়ে ফেলে দেবার এই বিধান দিতে পারে একমাত্র নির্যাতিতা গ্রামের বধূ, যার কাছে ঘর গেরস্থালীর অন্নসংস্থান স্বর্গসুখের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

দেখা যায়, অযোধ্যার রাজা দশরথ রাজপ্রসাদ থেকে বেড়িয়ে ঘোড়ায় চেপে মৃগশিকারে যাবার দৃশ্যটি কিন্তু দশরথের যে ছবিতে সিন্ধুপত্মীও তাদের পুত্রকে দাহ করেছিলেন এখানে তা দেখানো হয়নি।

দ্বিতীয় নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা বাঙালির জীবনচর্চার সঙ্গে কতখানি জড়িত তা সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সাহিত্য রামায়ণের কাহিনি থেকে কাঁথা সেলাইকে কেন্দ্র করে কবিতা ও সংগীত রচিত হয়েছে। যেমন:

'রাম গেল বনবাসে কাথাঁ দিয়া গায়,

সেই শোকে কাইন্দা মরে জাবানুল্লার মায়'।

দ্বিতীয়- নকশিকাঁথাটিতে দেখা যায়, রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য, অশোক বনে সীতা, সারথী রাম রথে বসে তীর-ধনুক হাতে যুদ্ধ পরিচালনা করছে, রাক্ষসকুলের অনেক সৈন্য ভূপাতিত, রামভক্ত হনুমান ও শুগ্রীবসহ সব বানরকুলের সবাই যুদ্ধে লিপ্ত, কিন্তু এই ঘটনাটির মধ্যে রামের বনবাস, সূর্পানখার নাসিকাচ্ছেদ, জটায়ুর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ, সেতুবন্ধ, লঙ্কাদহন ইত্যাদি প্রাধান্য পায়নি। এখানে রাবণ রাজার দেহাবয়বের সঙ্গে বাঙালি মল্লবীরের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবার হনুমান বালি ও সুগ্রীব এবং সকল বানরকুলকে রামচন্দ্রের স্নেহভাজন হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এছাড়াও আছে গাজীর বাঘের পিঠে বসার দৃশ্য। দক্ষিণ বাংলার মুসলিম ধর্মযোদ্ধা গাজী ও পিরদের বীরত্ব এবং অলৌকিক কাজকর্ম নিয়ে তৈরি হলো নকশিকাঁথা। গাজী সুন্দরবনের রাজার সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত। বাঘের পিঠে বসেছে, কখনো রাজ-মুকুট কিংবা টুপি মাথায়, পরনে রঙিন ধূতি, একহাতে ত্রিকোণ পতাকা, (যা পিরের পরিচয়বাহী) অন্য হাতে তলোয়ার, ধর্মযোদ্ধা গাজীর অলৌকিক কীর্তি-কাহিনি এখানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু গাজী-কালু ও চম্পাবতীর কাহিনি নিয়ে রচিত কিংবদন্তি চরিত্র এখানে রচিত হয়নি। সুন্দরবনের রাজার পাশে দাঁড়ানো মানিক পিরকে দেখা যায়, মানিক পির হলো গরুর কল্যাণকামী দেবতা। তার দেহ সুন্দর সাদা, মাথায় বাবরি চুল এবং তার উপরে পাগড়ি, চোখ দুটো বড়ো বড়ো। হাতে তসবিহ ও চামর এখানে দেওয়া হয়নি।

এই লোকশিল্প বাংলার নকশিকাঁথা আমাদের গ্রামীণ জীবনকে নান্দনিক মাত্রা দিয়েছে। এই লোকশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কার এবং ধর্মীয় চিন্তা। মোগল আমলে রাজা-বাদশা ও জমিদারদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচের আসর বসত। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতির ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিশ্রাম ও শ্রান্তি বিনোদনের জন্য উচ্চ শ্রেণির লোকেরা আমোদ-প্রমোদ করতেন। যেখানে কবি, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ও গায়ক-গায়িকা উপস্থিত থাকত। জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে সজ্জিত নর্তকীরা তাদের সুরধর সংগীত ও চমৎকার অভিনয় দ্বারা অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। চৈনিক দূতগণ পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে যখন পাণ্ডুরার রাজদরবারে আগমন করেন তখন এই ধরনের গান-বাজনা ও নৃত্যগীত দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। এছাড়াও সে যুগে একদল পেশাদার সংগীত শিল্পী গৃহে গমন করতেন এবং সংগীত যন্ত্র বাজাতেন, বিনিময়ে তারা খাদ্য এবং টাকাপয়সা কিংবা অন্য জিনিসপত্র উপহার পেত।

বৈদিক সাহিত্য ও মহাকাব্য থেকে জানা যায় যে, মহেঞ্জোদারো খননকার্য থেকে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে– তাদের পরিহিত পোশাক সুচ শিল্পে দেখা যায়। পুরানো বৌদ্ধ স্তম্ভ এবং ভাস্কর্যের মূর্তিগুলোয় এই ধারা বর্তমান। এই ধরনের পোশাকে অপূর্ব কারুকাজ, সংস্কৃতি, নাটক, কালিদাসের নাটকের নানা চরিত্র সুচশিল্পে বিভিন্নভাবে নকশিকাঁথায় ব্যবহার হয়ে আসছে। পায়ে নূপুর পরা পোশাকে দেশজ আলপনার মতো কিছু ডিজাইন এখানে শোভা পাচ্ছে। কোথাও কোথাও নকশিকাঁথার বিষয়বস্তু ট্রিটমেন্টের সঙ্গে টেরাকোটা মন্দিরের একই বিষয়বস্তুর ট্রিটমেন্টের কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য সেই কাহিনির উপস্থাপনার রীতিটি নকশিকাঁথায় হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নকশিকাঁথা

পল্লিবালাদের প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা এবং আবেগ মথিত ও কল্পনায় এই নকশিকাঁথা তৈরি করছে। ছন্দোময় স্টিচে রঙের এর বিন্যাসে সুন্দর শিল্পরূপ গড়েছেন। রেখার মধ্যে মিশিয়েছেন লীলায়িত রেখার বৈচিত্র্য। হয়ত সে জানে না তার মনের অজান্তে সৃষ্টি হয়েছে এই শিল্পরূপ।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির শুদ্ধতা

শাহ্ সোহাগ ফকির

প্রত্যেক জাতি তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে হৃদয়ের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখে। জীবনের অংশ হিসেবে ভাষা ও সংস্কৃতি লালন করেই বাঁচার স্বাদ গ্রহণ করে। জাতি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে তার সেই সত্তা জিইয়ে রাখে যুগ-যুগান্তর।

আচার-ব্যবহার, সামাজিক সম্পর্ক, কর্ম ও চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশই একটি জাতির সংস্কৃতি হয়ে ওঠে। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডে বাঙালি নামের একটি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতার জন্যই বয়ে গেছে অনেক রক্ত স্রোত। যার স্মৃতিচিহ্ন খুদিত হয়ে আছে বিশ্ব ইতিহাসে। সে হিসেবে বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ ও রক্ত ঢেলেছে। সে ভাষা প্রাণের ভাষা, মধুর ভাষা, বাংলা ভাষা, বাংলা মায়ের বুলি। এ যে শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারদের বাংলা ভাষা। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করে। এই তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে মর্যাদা বা স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর সভায় ১৮৮ টি দেশের সমর্থনে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সুদূর আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় অশুদ্ধ প্রয়োগে আজ বাংলা ভাষার মূলধারাকে বিবর্তিত করা হচ্ছে। শহিদদের রক্তকে অপমান করে বাংলা ভাষার চেতনা ও অস্তিত্বকে ভূলুণ্ঠিত করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যমের ভূমিকা অসামান্য। কিছু গণমাধ্যম বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মূলধারার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়ন তথা তথ্য প্রযুক্তির যুগে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মূলধারা কতটুকু বজায় আছে তা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। সরকার অনুমোদিত এফএম রেডিও স্টেশন বর্তমানে ২৭টিরও বেশি। সেখানে ভাষা ব্যবহারে নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। কিছু স্টেশন শহিদের জীবন ও রক্তে কেনা বাংলা ভাষাকে ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুর সংমিশ্রণে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করছে। এই সকল অনুষ্ঠান মূলত তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করে সাজানো ও সম্প্রচার করা হয়। প্রভাবিত হয়ে তরুণ সমাজ ভাষা ব্যবহারে ভুল পথেই হাঁটছে। অমার্জিত ও অশুদ্ধ ভাষা চর্চার দিকে ঝুঁকছে আমাদের তরুণ প্রজন্ম। যা প্রভাব ফেলছে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর।

বাংলাদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সকল ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে আমরা সবাই বাঙালি। আমাদের আছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। যা যুগ যুগ ধরে বাঙালিকে সুষ্ঠু সামাজিক রীতিনীতি ও মননের পথে চালিত করে আসছে। সকলের মাঝে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনই হচ্ছে এই সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। ধর্ম-বর্ণের মতবাদ উর্ধ্বে রেখে এক বাঙ্গালি অন্য বাঙ্গালির সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। স্বাধীনচেতা এই জাতি ১৯৫২, ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে একটি মাত্র বাঙালি পরিচয়ে আবদ্ধ থেকে দুর্বার সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অন্যান্য সকল গুণী সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম বিশ্ব সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। ফকির লালন শাহ্, হাসন রাজা, রাধা রমন তথা বাউল সাধকদের সৃষ্টি করা অমর কথা ও সুর মানুষের হৃদয়ে গভীর ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া ও গম্ভীরা এই সুস্থ ধারার গানগুলো আমাদের সংগীত তথা সংস্কৃতির অঙ্গন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতম করেছে। কিন্তু তরুণ সমাজ আজ আগ্রাসী বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের মূল ধারার বাংলা গান গ্রহণ করছে না।

ভিনদেশি গণমাধ্যমের কারিশমার ফাঁদে ফেলে আমাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে গলা টিপে হত্যার প্রচেষ্টা চলছে। শত শত বছরের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। স্টার জলসা, জি-বাংলা ও স্টার প্লাস চ্যানেলে সম্প্রচারিত বিভিন্ন ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে দেশের মানুষের সমাজ, সংসার ও জীবনে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণকারী যে ঢঙের পোশাক-আশাক পরেন তার অনুকরণে আমাদের তরুণ সমাজ, বিশেষ করে তরুণীরা। বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতিবিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতা, কুসংস্কার, সংসারের কূটচাল, শত্রুতা, ছলনা, বৃদ্ধ মা-বাবা ও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি অবহেলা-অযত্নের মতো নিন্দনীয় বিষয় উপস্থাপন করা হচ্ছে এসব অনুষ্ঠানে। মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা দিন দিন উঠে যাচ্ছে এই অপসংস্কৃতির প্রভাবে।

সংস্কৃতি অঙ্গনে শূন্যতা সৃষ্টির সাথে অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। দর্শক দেশীয় চ্যানেলের অনুষ্ঠান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ফলে নিজেদের পণ্যের প্রচারে বাংলাদেশি কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতীয় চ্যানেলের অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় আমাদের বিপুল পরিমাণ অর্থ অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। এ নিয়ে দেশীয় চ্যানেলের প্রচণ্ড আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ভিনদেশি অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না। এই অর্থনৈতিক ক্ষতি বাংলাদেশের জন্য বা বাঙালি জাতির জন্য খুবই লজ্জাজনক।

আমাদের দেশীয় নাটকগুলো বিদেশি সিরিয়ালগুলোর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তথাপি দৃষ্টিনন্দন বিদেশি অনুষ্ঠানের দর্শক বাড়ছে, আমাদের দেশি অনুষ্ঠান ও চ্যানেল থেকে দর্শক মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এখানে আমাদের সংস্কৃতিপ্রীতির অভাব অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। এই জায়গাটি থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের বাংলা ভাষা ও মূলধারার সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। সমস্ত অশুভ শক্তির নাগপাশ ভেঙ্গে দিয়ে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন রুখে দিয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষা জাতির ভবিষ্যতের স্বার্থে জরুরি। পরিচ্ছন্ন সমাজ ও শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়তে আগামী প্রজন্মের কাছে শুদ্ধ বাংলা ভাষা ও সুস্থ সংস্কৃতি পৌঁছ দিতে হবে। এটাই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

লেখক : সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

অভিনেত্রী দিলারা জামান

একুশে পদক ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী দিলারা জামান। একসময় সাহিত্যে পদচারণা ছিল। রয়েছে ৪টি গল্পগ্রন্থ ও ১টি উপন্যাস। সর্বপ্রথম লেখা ছাপা হয় *দৈনিক ইত্তেফাকের* কচিকাঁচা আসরের পাতায় ১৯৫৬ সালে এবং ১৯৫৮ সালে সাপ্তাহিক *বেগম* এ। সম্প্রতি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়* প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে প্রথম মঞ্চ নাটক *মামলার ফল*, ১৯৬৩ সালে ডাকসু'র প্রযোজিত নাটক *মায়াবি প্রহর* এবং ১৯৬৬ সালে টেলিভিশন ও বেতার নাটকে অভিনয় দিয়ে শুরু। প্রায় ৫০ বছরের অভিনয় জীবনে অসংখ্য নাটক, মঞ্চ নাটক, টেলিফিল্ম ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। অভিনয়ের সুবাদে তিনি অনেক অভিনয় শিল্পীর মা। ১৯শে জুন তাঁর ৭৫তম জন্মদিবস। জন্ম ১৯৪৩ সালে বর্ধমানে। লেখাপড়া শুরু আসানসোলে। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর যশোরে বসতি। এরপর ঢাকায় বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ইডেন মহিলা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা এবং বসবাস। পেয়েছেন অধ্যাপক শহীদ মুনীর চৌধুরী, শহিদুল্লাহ কায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল-এর মতো গুণীজনদের সাহচর্য। দেশ-বিদেশে রয়েছে তাঁর অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রইল জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হলো এবারের ঈদ সংখ্যায়।

প্রশ্ন : আপনার জন্ম বর্ধমানে। এরপর আসানসোল, যশোর ও ঢাকায় পড়াশুনা করেছেন। আপনার ছেলেবেলা কেমন ছিল ?

উত্তর : আমার আব্বা চাকরি করতেন। আব্বার বদলির সুবাদে আমাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে, থাকতে হয়েছে। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর অনেকের মতো আমরাও যশোরে চলে আসি। সেখানে প্রাথমিকের পাঠ শেষে ঢাকায় বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে, ইডেন মহিলা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি। ভিকারুন নিসা

দিলারা জামান

নূন স্কুল এন্ড কলেজে পড়িয়েছি। আমাদের ছোটোবেলায় অনেক বৈচিত্র্য ছিল, অনেক স্বাধীনতা ছিল। প্রকৃতিতে ঘুরে বেড়ানো, নির্মল ও সুন্দর ছেলেবেলা ছিল আমার।

প্রশ্ন : আপনার ছোটোবেলার ঈদ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

উত্তর : তখনকার দিনে ঈদে এত বাহুল্য ছিল না। সকলের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। অনেক আনন্দ হতো, আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। নির্মল আনন্দ।

প্রশ্ন : আজকের ঈদ এবং ছোটোবেলার ঈদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন কি-না ?

উত্তর : এখন জীবনে অনেক গতি এসেছে, বাহুল্য বেড়েছে; বেড়েছে দেখানোর স্পৃহা ও প্রতিযোগিতা। কে কত দামি পোশাক পরবে, তার প্রতিযোগিতা আমাকে পীড়া দেয়। আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রবণতা কমেছে।

প্রশ্ন : নতুন পোশাক কেনা বা পাওয়ার অনুভূতি তখন কেমন ছিল ?

উত্তর : নতুন পোশাক পেলে খুবই খুশি হতাম। তখন ঈদে আমরা একটি নতুন পোশাক পেতাম। সেটি যত্ন করে লুকিয়ে রাখতাম, যেন কেউ দেখে না ফেলে। ঈদের দিন সকালে পোশাকটি বের করে পরতাম। একটির বেশি জামা বা পোশাক পাওয়ার কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না। এখন জীবন অনেক বদলে গেছে। মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, সময়– সবই বদলেছে। তাই তুলনা করা একেবারেই উচিত নয়। তবে এখন একাধিক পোশাক কেনা হয়, কিনতে হয়।

প্রশ্ন : ঈদি বা সালামি প্রসঙ্গে কিছু বলুন।

উত্তর : ছোটোবেলায় সালাম করে দাঁড়িয়ে থাকতাম সালামির জন্য। এটা খুবই আনন্দের বিষয় ছিল। একটি সিকি, একটি আধুলি বা একটি কাঁচা টাকা সালামি পেতাম। এক টাকা সালামি পাওয়া তো বিরাট ব্যাপার ছিল। সবগুলো জমা করে মায়ের হাতে দিতাম। মা রেখে দিতেন, পরে সময় করে এগুলো দিয়ে গল্পের বই কিনে দিতেন। এখন সালামি পাই না, বরং দিতে হয়।

প্রশ্ন : ঈদ বা উৎসবে নগদ সালামি ছেলেমেয়েদের ধূমপান, মাদক ইত্যাদিতে উৎসাহিত করে বলে একটি সমালোচনা আছে, এ বিষয়ে আপনার মতামত কী ?

উত্তর : সালামি বা ঈদি খারাপ নয়। শুধু সালামি কেন, ছেলেমেয়েরা অর্থটা কীভাবে ব্যয় করছে, সে ব্যাপারে পিতা-মাতা অভিভাবকদের অবশ্যই সচেতন থাকা দরকার। বর্তমানে নানা কারণে ব্যস্ততা বেড়েছে, শিশু-কিশোরদের পিতা-মাতা সময় দিতে পারছেন কম। এর মধ্যেও সজাগ থাকা দরকার, যাতে ছেলেমেয়েরা ভুল পথে পা না বাড়ায়। বিশেষ করে ঈদি বা সালামি দেওয়ার সময় আয়ের সাথে সংগতি রেখে সালামি দেওয়া উচিত, নইলে সন্তানের কাছে ভুল বার্তা যায়; যা হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : ছোটোবেলায় ঈদ জামাত বা মেলায় যেতেন কি-না ?

উত্তর : খুব ছোটোবেলায় বাবার সাথে ঈদের জামাতে যেতাম। একটু বড়ো হওয়ার পর আর যাওয়া হয়নি। এখন অনেক জায়গায় মেয়েদের নামাজের ব্যবস্থা আছে, তবে যাওয়া হয় না।

প্রশ্ন : ঈদের প্রস্তুতি কীভাবে নেন ?

উত্তর : আগে ঈদের প্রস্তুতি বলতে ছিল নতুন জামা কেনা, সেলাই করা আর খাবার তৈরি করা। এখন গ্লোবালাইজেশনের ফলে আমাদের ঈদ প্রস্তুতিতে আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া লেগেছে, এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন।

প্রশ্ন : ঈদের খাবার সেকালে কেমন ছিল ?

উত্তর : ছোটোবেলায় মাকে দেখতাম কল ঘুরিয়ে হাতে সেমাই তৈরি করছেন। তখন ফ্রিজ ছিল না। তাই তৈরি খাবার রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হতো। নানাবাড়ি নোয়াখালী গেলেও দেখতাম হাতে তৈরি অনেক খাবার তৈরি হচ্ছে ঈদের জন্য। এসব খাবার তৈরির মধ্যেও একধরনের উৎসব ভাব ছিল। এখন আমরা আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করি। দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, মেনু পালটেছে। ঈদের খাবারের মধ্যে এখন অন্যকে চমকে দেওয়ার একটা বিষয় কাজ করে, ভিনদেশি খাবারও কেউ কেউ পরিবেশন করছে। এগুলো আগে ছিল না। আমাদের ঐতিহ্যবাহী পায়েস, সেমাই, ফিরনি, পোলাও, মুরগি, পিঠা-এর সাথে এখন নুডলস, চটপটি, চিকেন ফ্রাই, স্যুপ, খিচুড়ি ইত্যাদি যোগ হয়েছে। সামর্থ্য অনুযায়ী নিত্যনতুন খাবার যোগ হচ্ছে।

প্রশ্ন : আগে দলবেঁধে প্রতিবেশীর বাসায় যেতেন কি-না ?

উত্তর : আগে সবাই মিলে ঈদের দিন প্রতিবেশীর বাসায় যাওয়া,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০০৮ গ্রহণ করছেন দিলারা জামান –ফাইল ছবি

আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া ছিল একধরনের বাধ্যবাধকতা। এখনো গ্রামে এই সংস্কৃতি চালু রয়েছে। নানারকম আর্থসামাজিক পরিস্থিতির চাপে শহরে বিশেষ করে ঢাকা শহরে এটি অনেকটাই হারিয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ হলো নিরাপত্তাজনিত কারণে এখন বাবা-মা সন্তানকে একা বের হতে দিতে ভয় পান। এছাড়া ভালোবাসার আদান-প্রদান অনেকটাই কমে গেছে, শহুরে সমাজে আত্মকেন্দ্রিকতা বেড়েছে, ডিজিটাল যুগে মানুষ গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে আমি প্রতিবেশীর বাসায় যেতে চাইলেও, তারা আমাকে বা আমার সন্তানকে কতটুকু সাদরে গ্রহণ করবে সে জড়তা কাজ করে। আজকের প্রজন্ম তাই ঈদের দিন কাটায় টিভি দেখে, ফেইসবুকে চ্যাট করে, শিশুপার্ক বা অ্যামিউজমেন্ট পার্কে ঘুরে। কেউ কেউ নির্দিষ্ট কিছু আত্মীয় বা বন্ধুর বাসায় যায়। ভ্রমণের নানারকম দুর্ভোগও যোগাযোগ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

প্রশ্ন : ঈদ একটি সার্বজনীন উৎসব– এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : ঈদ নানা কারণে সার্বজনীন। ঈদে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, পরিচিত জনদের মধ্যে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হয়। অনাবিল আনন্দের মাঝে অতীত ভুলে নতুনের যাত্রা শুরু হয়। এ সমাজের ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, পেশা নির্বিশেষে সকলেই ঈদে আমন্ত্রিত এবং সমাদৃত হয়। সকলেই নতুন কাপড় কিনে, সেদিন নতুন কাপড় পরে।

প্রশ্ন : আপনার অভিনয়ে ও সাহিত্যে ঈদ কীভাবে এসেছে ?

উত্তর : ২০/২২ বছর আগে বিভিন্ন পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় আমার ৪/৫টি লেখা ছাপা হতো। এখন ব্যস্ততার কারণে অনেকদিন ধরেই লেখা হয় না। ৪টি গল্পগ্রন্থ ও ১টি উপন্যাস বেরিয়েছে, সম্প্রতি আত্মজীবনীমূলক একটি সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি বলব অভিনেত্রী দিলারা জামানের আড়ালে লেখক দিলারা জামান হারিয়ে গেছে। প্রায় ৫০ বছর ধরে অভিনয় করছি। সহ-অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আমার ভাইবোন, ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। এখন প্রতি ঈদেই একাধিক ঈদের নাটকে অভিনয় করতে হয়।

প্রশ্ন : একসময় বিটিভি দেশের একমাত্র টেলিভিশন ছিল। এখন সরকারি-বেসরকারি মোট ২৯টি টিভি চ্যানেলে ঈদ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে। মানের কোনো পার্থক্য দেখেন কি-না ?

উত্তর : ১৯৬৪-এর ডিসেম্বরে বিটিভির যাত্রা শুরু। তখন অভিনয়ের জন্য মঞ্চ অন্যতম ক্ষেত্র ছিল। মেয়েরা বিশেষ করে মুসলিম মেয়েরা অভিনয়ে আসত না। তখন অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেওয়ার কথা কল্পনাও করা যেত না। সেকালে অভিনয় শিল্পীরা প্রায় সকলেই অন্য পেশায় কাজ করে অভিনয় চালিয়ে গেছেন। আজ সময় বদলেছে। এখন অভিনয় শেখানোর স্কুল হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে, তথ্য মন্ত্রণালয় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট খুলেছে। এগুলো অবশ্যই ভালোলাগার জায়গা। তবে দুটি সময় ভিন্ন, তাই তুলনা করা উচিত নয়। এখনো ভালো অভিনেতা বেরিয়ে আসছে, ভালো অনুষ্ঠান হচ্ছে।

প্রশ্ন : এপার বাংলা-ওপার বাংলার নাট্যচর্চার মধ্যে কোনটিকে এগিয়ে রাখবেন ?

উত্তর : অবশ্যই নিজের দেশকে। এখনো নাট্যচর্চার মূল ধারাটি বাংলাদেশেই রয়েছে। ওপারেও ভালো কাজ হচ্ছে। তবে সুযোগ এখানেই বেশি।

প্রশ্ন : বর্তমানে ভাষা ও উচ্চারণের বিকৃতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী ?

উত্তর : ভাষা ও উচ্চারণের বিকৃতি আছে, এজন্য নানাজন নানা ধরনের দোষারোপ করেন। প্রমিত বানান ও উচ্চারণ অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে, নাটকের ক্ষেত্রেও। আঞ্চলিক ভাষায় নাটক হলে ভিন্ন কথা। তবে জগাখিচুড়ি কিছু হওয়া একেবারেই উচিত নয়।

প্রশ্ন : *সচিত্র বাংলাদেশ* নিয়মিত পড়েন কি-না ?

উত্তর : আমার স্বামী ফখরুজ্জামান চৌধুরী বিটিভিতে থাকাকালীন নিয়মিত *সচিত্র বাংলাদেশ* পেতাম ও পড়তাম। এখন সেভাবে পড়া হয় না।

প্রশ্ন : ঈদ নিয়ে কোনো স্মরণীয় ঘটনা আছে কী ?

উত্তর : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি আমার স্বামীর সাথে ময়মনসিংহের নদীর ওপারে একটি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তরুণ বয়স, একজন নারীর জন্য সময়টি অনিরাপদ ও শঙ্কার। ভোর হওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকে যেতাম, সারাদিন আর বের হতাম না। পাছে কেউ জেনে যায়– এখানে একটি মেয়ে আছে এই ভয়ে। বাবা-মা ঢাকায় ছিলেন। ১৯৭১-এর ঈদটি ছিল আত্মীয় পরিচিতিবিহীন, সারাদিন ঘরবন্দী থেকে নানারকম শঙ্কা ও আতঙ্কের মাঝে নিরানন্দ দিনটি অতিবাহিত করেছি। সেবার আমাদের ঈদ হয়নি। সে স্মৃতি আজও ভোলা যায় না। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-এর ঈদটিও স্মরণীয়। সেদিন আপনজনদের অনেককেই আর পাইনি। তারা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।

প্রশ্ন : রমজান সংযম, সহমর্মিতা শিক্ষা দেয়। এর মধ্যে আগে আর বর্তমানে কোনো পার্থক্য দেখেন কী ?

উত্তর : সময়ের সাথে সবকিছু পালটেছে, পরিবর্তন স্বাভাবিক। আগে রোজার দিনে কেউ সহজে রেগে যেতেন না, কটু কথা বলতেন না, উচ্চস্বরে কথা বলতেন না, সবক্ষেত্রে একধরনের সংযম চোখে পড়ত। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যারা অসচ্ছল, রমজানে তাদের খোঁজখবর নেওয়া হতো, ঈদে নতুন কাপড় দেওয়া হতো। এখনো এগুলো হয় কিন্তু সহমর্মিতার জায়গা সংকুচিত হয়েছে, আত্মকেন্দ্রিকতা বেড়েছে।

প্রশ্ন : আপনার অভিনয় জীবনের স্বীকৃতি সম্পর্কে কিছু বলুন ?

উত্তর : অভিনয়ের জন্য ১৯৮০ সালে একুশে পদক পেয়েছি। এরপর পেয়েছি সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। এছাড়া আরো অনেক পুরস্কার বিভিন্ন সময় পেয়েছি। তবে সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার দর্শকের ভালোবাসা।

প্রশ্ন : নতুন প্রজন্মের জন্য কোনো পরামর্শ দেবেন কী ?

উত্তর : আমরা মা, মাটি, ভাষা, সংস্কৃতি, দেশ, পতাকাকে ভালোবাসব। যেখানেই থাকি না কেন, দেশকে মনে রাখব। মনে রাখব পতাকা আমার হাতে আছে। এ পতাকা ও দেশের ভাবমূর্তি ও সম্মান সর্বদা সমুজ্জ্বল রাখব।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে আপনাকে জন্মদিনের অগ্রিম শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক শুভকামনা।

[২৫শে মে উত্তরায় শিল্পীর বাসায় সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন সচিত্র বাংলাদেশ-এর সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, সাথে ছিলেন সহকারী চিত্র প্রযোজক জাফর আহমেদ, ফটোগ্রাফার মো. নাজিম উদ্দিন ও প্রতিবেদক ***নাহিদা সুলতানা****]*

মানুষ মানুষের জন্য

মোহাম্মদ হাসান জাফরী

হত্যা, আত্মহত্যা মহাপাপ। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী সবক্ষেত্রে, সবসময়। আর সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় হলে-তো সে পাপের সীমা-পরিসীমা নেই। অথচ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এ খেলা চলছে হরদম। যা কি-না দিনে দিনে প্রসার লাভ করছে ভয়ঙ্কর বীভৎস এক রূপে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের এ রক্তাক্ত খেলা দিনে দিনে আমাদের সুন্দর মনের মানসিকতাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যেন আদিম যুগে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের অনেক সন্তান আজ বিপথগামী। ওদের ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদের সকলের। যুগের পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী যুব সমাজের আজ আর বেশি মাঠে-ময়দানে পাওয়া যায় না। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে তরুণ সমাজ হয়ে পড়েছে কম্পিউটার, মোবাইল নির্ভর। তাই ঘরে বসেই যাচ্ছে তাদের সময়। মাঠ -ময়দান এখন আর আগের মতো তাদের টানে না। খেলাধুলায়, শরীরচর্চায়, প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা আনন্দঘন মুহূর্তের সুখময় দিনগুলো আজ কেবলই যেন স্মৃতি।

শান্তিপ্রিয় ছোটো ছোটো শিশুরা আজ বড়ো হয়েছে, হচ্ছে, অথচ বিবেক বর্জিত অসুন্দর দিকসমূহের প্রতি আকর্ষণ তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে অশান্তির পথে। বিশ্বব্যাপী মানসিক অস্থিরতা দিনে দিনে আরো আমাদেরকে অস্থির করে তুলছে। এক সময়ে নজরে পড়ত বড়ো দেশের উপর ছোটো দেশের আগ্রাসন। অথচ আজ এই আগ্রাসনের স্তর জাতি থেকে জাতিতে, গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীতে, পথ থেকে পথে নেমে এসেছে। প্রতিটি ধর্মই আনে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন, অথচ বর্তমানে কতিপয় কুচক্রী মহলের উন্মাদনায় ভরা ভুল ব্যাখ্যা তরুণ সমাজকে করছে বিপথগামী। আর আমরা যখন এর উৎস খুঁজতে যাই তখন দেখতে পাই বড়ো বড়ো পরাশক্তির ধারক ও বাহকদের হাতে এর কলকাঠি। দূরে বসেই যেন ঘুড়ি উড়ানোর মতো নাটাই নিয়ে খেলছে তারা।

বাবা-মাদের কথা এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও একসময় তা হাতছাড়া হতে বাধ্য। ছোটো শিশুটিকে যে বাবা-মা তিলে তিলে আদর-সোহাগ দিয়ে বড়ো করেছেন, তিনি আজ দিশেহারা। নিজের সন্তানের লাশ আজ তিনি আনতে যান না। নিজের সন্তানের লাশটি আজ নিজের হাতে দাফন করবেন এ ইচ্ছাও তাদের নেই। এর চেয়ে করুণ, বীভৎস, বেদনাবিধূর পরিণতি আর কী হতে পারে ? কে-না চান তার সন্তান মানুষের মতো মানুষ হোক! সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে কে-না চায়? কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের এ চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে আজ বিস্তর ব্যবধান।

বন্ধুদের মতো আমিও একজন ছাত্র। ছোটোবেলা থেকে বাবা-মায়ের আদর্শের পাশাপাশি আমরাও শিক্ষক-শিক্ষিকার আদর্শে অনুপ্রাণিত। স্যার-ম্যাডামদের সাথে দিনের প্রায় অর্ধেক সময় কাটানোর কারণে তাদের রীতিনীতি, চালচলন শিশু শ্রেণির বাচ্চাটিকে যেমন আকৃষ্ট করে, আমাদেরও তেমন করেছিল জীবনের শুরুতে।

বাবা-মায়ের গণ্ডি পেড়িয়ে স্কুল জীবন কেবলই বন্ধুদের সাহচর্য আর স্যার–ম্যাডামদের আন্তরিকতায়, চালচলনে, নীতি-নৈতিকতায়, শিক্ষা লাভের যে সময় অতিবাহিত হয় তার গুরুত্ব বাস্তব জীবনে অসীম। অনেক বাবা-মা এ সময় শুধুমাত্র আনা-নেওয়ার দায়িত্ব পালন ভিন্ন সন্তানের নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি তেমন গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয় না। এর পিছনে যে বিষয় লক্ষণীয় তা হচ্ছে বাবা-মা নিজেরাই এ পথের পথিক নয়। তারা সন্তানের মঙ্গল চান ঠিকই কিন্তু সৎ পথে নাকি বেঠিক পথে এ বিচারে যেতে রাজি নন। বিষয়টি সন্তান ছোটো হলেই যে তার নজর এড়িয়ে যায় তা কিন্তু নয়। আর এর থেকে সন্তানের মনে, বিবেকে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তা পরবর্তী জীবনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে।

বন্ধুদের সাহচর্য এক বিশাল ভূমিকা রাখে পরবর্তী জীবনে। ভালো, সৎ, নিষ্ঠাবান বন্ধু যেমন আমাদেরকে ভালোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অসৎ বন্ধুরাও তেমনি খারাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়। বয়সের এমন এক ধর্ম যে ছোট্ট সময়ে মা-বাবার প্রতিটি বিষয়ই মনের মধ্যে লালন করে নিজেকে গড়ে তোলে, কিন্তু একটু বড়ো হলে স্কুলের স্যার-ম্যাডামদের আদর্শ, চালচলন, কথাবার্তা থেকে সবকিছুই নিজের জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সেই সাথে বন্ধুদের সাহচর্য তাকে নতুন নতুন পদক্ষেপে এগিয়ে নেয়। আমরা জীবনে এ সময়কে অনেক গুরুত্ব দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বিপথগামী হয়ে পড়ি। আমরা জানতে চাই না, বুঝতে চাই না এর পরিণতি কত শুভ বা অশুভ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মাদকাসক্তরা নানাবিধ কুকর্মে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। নিজের বাহাদুরি ফলাতে এক বন্ধু অন্য বন্ধুর উপরে কীভাবে থাকা যায় তা মাথায় কাজ করে। নীতি পরিপন্থি অনেক কাজ সামনে আসলে তা করতে দ্বিধা বোধ করে না ।

এভাবে স্কুল জীবন শেষ হলে মনে হয় নিজেরা বড়ো হয়ে গেছি, নিজের ভালোমন্দ বাছ-বিচারে নিজেই যথেষ্ট। কারো মতামতকে প্রাধান্য দিতে আমরা বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শ গ্রহণ করি। বাবা-মা বিচ্ছিন্ন স্বাধীন এ জীবন বিপথে টানতে অসৎ বন্ধুদের জুড়ি মেলা ভার। কিছুক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম চোখে পড়ে তা হচ্ছে ঐ সমস্ত বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে, যাদের মধ্যে ইতোমধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। এ সমস্ত বাবা-মা কলেজ লাইফে সন্তানের সাথে সাথে না ঘুরলেও উভয়ের অবসরে যাবতীয় বিষয়ে অত্যন্ত খোলামনে আলাপ-আলোচনা বজায় রাখেন। যদিও এসব ক্ষেত্রে তারাই বেশি সফলতা পায় যাদের বাবা-মা নিজেরাই আগ্রহী হয়ে সন্তানের সাথে উপযাচক হয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যায়।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের সাথে বাবা-মা বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন, বয়সের খেলায় আমরা যেন অসৎ বন্ধুদের মাঝে হারিয়ে না ফেলি। অন্তত পক্ষে বয়স পঁচিশ না পেরুনো পর্যন্ত আমরা না চাইলেও, কাছে না থাকলেও আজকের মোবাইলের যুগে মাঝেমধ্যেই উপদেশ বাণী না শুনতে চাইলেও, মায়ার বাঁধনে আঁকড়ে ধরে আমাদের মানুষের মতো মানুষ করে সঠিক পথে রাখুন। জোরাজুরি করে নয়, বরং আনন্দের সাথে বুঝিয়ে বলুন। সামনে সময় আরো বেশি খারাপ হবার সময় আসছে তাই বাবার পাশাপাশি মায়েরাই বেশি করে এগিয়ে আসুন। শিক্ষকগণও শুধু লেখাপড়া নয় বরং নৈতিক এবং প্রকৃত শিক্ষায় আমাদেরকে শিক্ষিত করে তুলুন। আর আমরা নিজেরা যেন বিবেককে জাগ্রত করতে পারি। নিজেরা সৎ ও ভালো বন্ধু হতে পারি এবং সৎ ও ভালো বন্ধুদের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হতে পারি। মানুষ মানুষের জন্য-এ নীতি আগলে ধরে আমরা বড়ো হতে চাই।

লেখক : শিক্ষার্থী, চতুর্থ বর্ষ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

বাবার স্নেহের পরশ পেয়ে

এসএম শহীদুল আলম

বাবার স্নেহের পরশ পেয়ে–
এ জগতে আসি চাঁদের মতো হাসি
বাজাই নতুন বাঁশি স্বপ্ন রাশি রাশি।
বাবার স্নেহের পরশ পেয়ে–
আকাশ ছোঁয়া মই মিষ্টি কথা কই
চারপাশ হইচই স্বর্গসুখে রই।

বাবার স্নেহের পরশ পেয়ে–
সূর্য রূপে উঠি পুষ্প হয়ে ফুটি
আলো-হাওয়ায় লুটি স্বাধীনতা ছুটি।
বাবার স্নেহের পরশ পেয়ে–
খেলার মাঠে যাই কী যে মজা পাই
প্রিয় কোরাস গাই যার তুলনা নাই।

বাবার স্নেহের পরশ পেয়ে–
আলোর সড়ক ধরি কর্ম ভালো করি
ন্যায়ের পথে লড়ি শুদ্ধ সমাজ গড়ি।
বাবার স্নেহের পরশ পেয়ে–
ভালোবাসি মাটি সরল পথে হাঁটি
বাধার পাহাড় কাটি দ্বন্দ্বগুলো ছাঁটি।

সন্ধ্যাবেলা

রুস্তম আলী

আমি যা খাই তা
রক্তে মিশে ।
আমি যা বলি তা
বাতাসে ভাসে ।

হেরে গেলাম-
জীবনকে ভালোবেসে।
চাওয়া-পাওয়ার ইতি টানি
শেষবেলাতে।

এ পৃথিবীর সব কিছু আমার
শুধু আমি আমার না।
এ কথা বুঝে গেলাম সন্ধ্যাবেলা।

জীবনের মানে

নাসিমা আক্তার নিঝুম

ভালোবাসা পেয়ে কারো সুখী হব আমি মনেপ্রাণে,
সেই স্বপ্ন কেটে গেছে বহুকাল সুখের সন্ধানে।
জীবন-বসন্তে কত কেটে গেছে নিদ্রাহীন রাত
হয়ত কেউবা এসে জানিয়ে গেছে সুপ্রভাত।
তবু এ– জীবন কুঞ্জে ডাকিল না কোকিল-বুলবুল,
থামিল গুঞ্জন যত, চলে গেছে তৃপ্ত অলিকুল।
ভালোবাসা দিয়ে আমি পেয়েছি যে শুধু প্রবঞ্চনা,
আর কত সয়ে যাব জীবনের এই বিড়ম্বনা!

সে এল

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

অকস্মাৎ সে এল চুপেচুপে–
স্বাগত, ভালোবাসার প্রিয়াঙ্গনে।
আলো-ছায়ার মিলন মেলায়। উদ্ভাসিত-
প্রথম দেখা! ভেসে যাওয়া দুপুরে।

অস্ফুটে সে প্রস্ফুট গোলাপ! যৌবনের উদ্ভাস;

এসো স্বপ্নের বাগানে ঘর তুলি–
এসো দু'জনে মন খুলে কথা বলি
হৃদয়ে নূপুর বাজল নিঝুম দুপুরে
তুমি জুড়ে আছ আমার স্বপ্নপুরে।

হৃদয়ের আকুতি দোলে আমার এ পরানে
মিশে আছ আমার স্বপ্ন আর জাগরণে
একান্ত নির্জনে তোমার প্রতিচ্ছবি আঁকি।

দুঃখ

মাহতাব আলী

আকাশে মেঘের পাহাড়
ঢেকে দেয় সূর্য সম্ভার
শ্রাবণের দুরন্ত নদী
প্লাবিত করে বুকের দুকূল।
মনের কুহরে
বেদনারা বাস করে।
ক্ষরিত হৃদয় আনন্দ হারা
জীবন প্রান্তর শুধু মরু সাহারা।

বৃষ্টি ঝরা দিনে

অপু বড়ুয়া

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
সকাল থেকে সন্ধ্যা-দুপুর
অঝোরে একটানা।
ভেজা ভেজা হাওয়ায় যেতে
ইচ্ছে করে বাইরে যেতে
উদাসী মনখানা।
আমি কী আর ছোট্ট ছেলে
হারিয়ে যাব বাইরে গেলে
কিন্তু মায়ের মানা
কাগজ দিয়ে নাও বানিয়ে
বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে
দুষ্টুরা আটখানা।
সারাটা দিন বদ্ধ ঘরে
কারণ ঠেলে যাই কী করে
মন মানে না মানা
জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই
ভাল্লাগেনা ধুত্তুরি ছাই।
বন্দি জীবনখানা।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে পূর্ণতা দিয়েছেন

৮ই মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নওগাঁর পতিসরে জাতীয় কর্মসূচি উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কেবল তাঁর সময়ের কবি নন, তিনি সর্বকালের কবি। তিনি বাংলা সাহিত্যকে পূর্ণতা দিয়েছেন, দিয়েছেন বিশ্বসমাজে উচ্চ প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। তিনি মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ ছিলেন। তেমনি অন্যদের অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী হতে শিক্ষা দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ই মে ২০১৭ নওগাঁর পতিসরে রবীন্দ্র কাছারি বাড়িতে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন – পিআইডি

তিনি আরো বলেন, রবীন্দ্রনাথ সুবিধাবঞ্চিত বাঙালির কল্যাণ সাধনে ও তাদের সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য লেখালেখির পাশাপাশি সমাজকর্মী ও সমাজসংস্কারক হিসেবে কাজ করে গেছেন। তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে নয়, তিনি বাঙালিকে বিশ্ববাদে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন। দরিদ্র প্রজাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কৃষি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, সমবায়নীতি ও কল্যাণ বৃত্তি চালু করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনধারায় প্রত্যয়ে ও প্রত্যাশায় সমভাবে প্রাসঙ্গিক। স্বদেশ প্রেম, মানবতাবাদ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বিশ্ববোধ প্রতিষ্ঠায় তাঁর রচনাবলি এবং কর্মধারা নিঃসন্দেহে প্রেরণার অসীম উৎস। তাই রবীন্দ্রনাথের বিশালতা এবং তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব মাধুর্যকে অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করতে হলে রবীন্দ্রচর্চার কোনো বিকল্প নেই।

শিশুরাই হবে আমাদের স্বপ্নের সত্যিকার উত্তরাধিকার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, শিশুর ব্যক্তিত্ব ও আগ্রহের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। অহেতুক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে দিলে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হতে পারে, তাদের স্বপ্ন ভেঙে যেতে পারে।

১৮ই মে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন।

তিনি বলেন, ফুলকে যেমন পরিপূর্ণভাবে ফুটতে দিলে তা চারদিকে সুগন্ধ ছড়ায় তেমনি শিশুদের তাদের মতো করে বড়ো হওয়ার সুযোগ দিলে তারা সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এজন্য দরকার শিশুদের সব ধরনের সহযোগিতা নিশ্চিত করা। শিশুকে শিশুর মতোই থাকতে দিতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, নিঃসন্দেহে আজ তোমাদের জন্য আনন্দের দিন। উৎসবের এ দিনে তোমাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজকের শিশুরাই নেতৃত্ব দেবে আগামী বাংলাদেশের। তারাই এগিয়ে নিয়ে যাবে বাঙালি সংস্কৃতিকে। লালন করবে এ– দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্ত চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে জন্মভূমির প্রতি থাকবে শ্রদ্ধাশীল। বাংলা ও বাঙালির মাতৃভাষা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে তোমরাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।

তিনি আরো বলেন, আমরা চাই শিশুরাই হবে আমাদের স্বপ্নের সত্যিকার উত্তরাধিকার। সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদের দোরগড়ায় উন্নত জীবনমানের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিয়ে সৃষ্টি করতে হবে একটি কল্যাণমুখী সুষম শিশুবান্ধব পরিবেশ।

শিশুদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান একান্তই তোমাদের। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছ তোমরা। তোমাদের মধ্যে কেউ বিজয়ী হয়েছে, কেউ বিজেতা। আর যারা অংশ নিয়েছ, কিন্তু জয়ী হতে পারোনি, তারাও কিন্তু বন্ধুদের বিজয়ের অংশীদার। কারণ, তোমরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছ বলেই অন্যরা জয়ী হতে পেরেছে।

নদীপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতনতার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে নৌপরিবহণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কালবৈশাখি ঝড়সহ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। তাছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে এ সময়ে বাংলাদেশের নদ-নদী উত্তাল হয়ে অশান্ত আকার ধারণ করে। নদীপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় নৌ-সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এলক্ষ্যে সরকার নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

২১শে মে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২১-২৭শে মে 'নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৭' উপলক্ষে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, নৌ-পরিবহণ নিরাপদ ও আধুনিক করতে নদীপথে চলাচলকারী লঞ্চ মালিক, শ্রমিক, যাত্রী সাধারণকে অধিক সচেতন হতে হবে। ধারণ–ক্ষমতার অধিক যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ রোধসহ নৌ-পরিবহণ সংক্রান্ত আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসরণ খুবই জরুরি। এছাড়াও নৌ-পরিবহণ খাতে দক্ষ জনবল তৈরি এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নৌ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

মালিক-শ্রমিকদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা মে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত মহান মে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মালিক-শ্রমিক হতে হবে হৃদ্যতাপূর্ণ। তারা একে অপরের পরিপূরক। এলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মে দিবসের চেতনাকে ধারণ করে শ্রমিক-মালিকদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি কোনোরকম উস্কানিতে কান না দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও উল্লেখ করেন।

৭ জেলায় ১১ গুচ্ছগ্রাম উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা মে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৭ জেলায় ১১টি গুচ্ছগ্রাম উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হবে। এলক্ষ্যে দেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না। প্রত্যেক ভূমিহীনকে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়া হবে এবং পুনর্বাসন করা হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া বাসস্থান নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানও নিশ্চিত করা হবে।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আরো সোচ্চার হওয়ার আহ্বান

বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে দেশবাসীকে আরো সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৩রা মে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা বিভাগের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবিরোধী ও উন্নয়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ইসলামে খুন-খারাবি বা জঙ্গিবাদের কোনো স্থান নেই–এ বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরতে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, ওলামা-মাশায়েখদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে অভিভাবক-শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

কক্সবাজারে মেরিন ড্রাইভ সড়ক উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই মে কক্সবাজার যান এবং শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজিত জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারের উন্নয়নে সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। তিনি কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন এবং সেখানে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও টুরিস্ট জোন গড়ে তোলা হবে বলে উল্লেখ করেন। কক্সবাজার শহরে প্রধানমন্ত্রী সুপরিসর বিমান চলাচল উদ্‌বোধনের পর ইনানিতে গিয়ে কক্সবাজার-টেকনাফ ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ সড়ক উদ্‌বোধন করেন। সড়ক উদ্‌বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী চলে যান বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম সমুদ্র সেকত ইনানি বিচে। সেখানে কিছুক্ষণ খালি পায়ে হাঁটেন এবং পানিতে নামেন। প্রায় ১৫ মিনিট তিনি সেখানে ছিলেন। সমুদ্রসৈকত থেকে কক্সবাজার ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রী গ্যাস সরবরাহ লাইনসহ ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন এবং ৯টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এআইএ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে মে আরব-ইসলামিক-আমেরিকান (এআইএ) সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য সৌদি আরবে চারদিনের সরকারি সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২১শে মে বিকেলে প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে পৌঁছলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। সৌদি শূরা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ ফয়সাল বিন আবু সাদ এবং সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পরে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে প্রধানমন্ত্রীকে রিয়াদের মোভেনপিক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সফরকালে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবের রাজধানীতে কিং আবদুল আজিজ সম্মেলন কেন্দ্রে আরব-ইসলামিক-আমেরিকান সম্মেলনে যোগ দেন এবং লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা অবশ্যই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই মে ২০১৭ কক্সবাজারের ইনানিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক সমাপ্ত কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ –এর উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাত করেন – পিআইডি

সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র সরবরাহ ও অর্থের উৎস বন্ধ করতে চাই। তিনি কঠোরভাবে জঙ্গিবাদ মোকাবিলা নিশ্চিত করতে সন্ত্রাসীদের অস্ত্র ও অর্থায়নের জোগান বন্ধে বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী মুসলিম দেশগুলোর প্রতি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি বন্ধ ও শান্তির নীতি অবলম্বনের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংলাপে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ইসলামকে সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার না করার আহ্বান জানান। ২২শে মে বিকেলে প্রধানমন্ত্রী সৌদির রাজকীয় নিয়ম অনুযায়ী পবিত্র নগরী মদিনায় মসজিদ-ই নববিতে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মুবারক জিয়ারত করেন। তিনি দেশবাসী ও গোটা মুসলিম বিশ্বের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ২৩শে মে স্থানীয় সময় বিকেল সোয়া ৪টায় দেশের পথে রওনা হন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশু-কিশোরদের পরিবেশের বন্ধু হতে হবে

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৯ শে মে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে (ডিএফপি) 'নবারুণ পরিবেশ সম্মেলন' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, 'পরিবেশ রক্ষা করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। এজন্য শিশু-কিশোরদের পরিবেশের বন্ধু হিসেবে গড়ে ওঠা জরুরি। শিশুকাল থেকেই পরিবেশ সচেতন হতে হবে। স্কুলের সব পাঠ্যসূচিতেই পরিবেশ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।'

'প্রকৃতির বন্ধনে প্রাণের স্পন্দনে'–প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ডিএফপি'র মাসিক পত্রিকা *নবারুণ*-এর খুদে লেখক ও আঁকিয়েদের নিয়ে এ আয়োজন করা হয়।

মন্ত্রী শিশু-কিশোরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপকালে পরিবেশ রক্ষায় ছন্দোবদ্ধ শপথবাক্য পাঠ করান। তারা সানন্দে মন্ত্রীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শপথ নেয়–'ভালো করে লেখাপড়া করব, পশুপাখি গাছপালাকে মায়া করব।'

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৯শে মে ২০১৭ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে (ডিএফপি) 'নবারুণ পরিবেশ সম্মেলন' অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন, মঞ্চে উপবিষ্ট (ডান থেকে) প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনজুরুর রহমান এবং ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন – ডিএফপি

সুস্থ-শিক্ষিত মা সমৃদ্ধ জাতির মূল চালিকাশক্তি

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৪ই মে মহাখালীতে রাওয়া সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল আয়োজিত বিশ্ব মা দিবসে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার 'গরবিনী মা' প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সুস্থ-শিক্ষিত-হাসিখুশি মায়েদেরকে সমৃদ্ধ জাতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অভিহিত করে তাদের স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র ও সমাজকে আরো ভাবতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

মা দিবসে সব মায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে মন্ত্রী স্মরণ করেন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে বন্দি অবস্থায় অকথ্য অত্যাচারে শহিদ আজাদ ও তাঁর মায়ের কথা। বন্দি অবস্থায় আজাদের সাথে শেষ দেখায় মা বুকভাঙা কষ্ট চেপে বলেছিলেন, 'কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিও বাবা, সহযোদ্ধাদের নাম কিন্তু বলিও না।'

উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে জঙ্গি নির্মূলের বিকল্প নেই

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৫ই মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস মিলনায়তনে গুণিজন ও জাসদের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জঙ্গি নির্মূল ও শান্তির নিশ্চয়তা অর্জনের বিকল্প নেই। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নেতৃত্বে বিস্ময়কর উন্নয়নের ধারায় প্রত্যাশার চাইতেও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে জঙ্গিবাদকে চিরতরে নির্মূল করে শান্তির নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে।

উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানো নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, জনগণের কাছে সুফল পৌঁছাতে দুর্নীতি, দলবাজি ও বৈষম্য অবসান করে সুশাসনের পথে হাঁটার পথকে দৃঢ় করতে হবে।

বিদ্যাপীঠ হোক দেশপ্রেমিক তৈরির কারখানা

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৭ই মে তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেস ক্লাবের *মাসিক এডুকেশন টাইম* পত্রিকার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বিদ্যাপীঠগুলোকে দেশপ্রেমিক মানুষ তৈরির কারখানা হতে হবে। টাকা বানানোর যন্ত্র নয়।

'যত বড়ো পদেই আসীন হোন না কেন দেশপ্রেম না থাকলে সকলই বৃথা' উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, মাতৃভাষা, মূল্যবোধ ও গণমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠতা চর্চা করতে হবে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

শিশু মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে আবারো মুক্তিযোদ্ধার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। যাঁরা এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে অগণিত মানুষের আত্মত্যাগে। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণদান, ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিষয়টি সামান্য নয় মোটেও। এই মহাযুদ্ধে নারী, পুরুষ, শিশু সকলের আত্মদান, আত্মত্যাগ আছে। আছে শ্রম ও বুদ্ধির মহাপরিচয়।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে শিশুদের কী রকম অবদান আছে, বাংলাদেশের লেখকদের বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে, চলচ্চিত্রে তা নানাভাবে রচিত ও চিত্রায়িত হয়েছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে সকল নাটক, বিশেষ নাটক প্রচারিত হয়ে থাকে সেইসব নাটকেও মুক্তিযুদ্ধকালে শিশুদের বিশেষ ভূমিকা তুলে ধরতে দেখা যায়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের ১৩ বছর বয়স ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন কিন্তু তালিকায় নেই এমন ব্যক্তিগণকে এবার অনলাইনে আবেদনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ১৩ বছরের কম বয়সিরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসংখ্য শিশু ছিলেন যারা মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। কৌশলগত তথ্য সংগ্রহ করে তা মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে পৌঁছানো, খাবার সামগ্রী, গোলা-বারুদ এগিয়ে দেওয়ার কাজও করেছেন ঐসব দুরন্ত শিশুরা। তারা এই কাজগুলো ভেবে-চিন্তে করেছিলেন– এমনটা মনে করার কারণ নেই। তারা এগুলো করেছেন আবেগে, বাঙালি জনগণের ভাবাবেগের সাথে তাল মিলিয়ে এবং পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতি প্রবল ঘৃণায় স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে।

একজন বদিউল আলমের কথা। যার পুরো নাম শেখ মো. বদিউল আলম পাটওয়ারী। মুক্তিযুদ্ধকালে কুড়িগ্রামের রাজীবপুরে থাকতেন। কারণ সেটা তাঁর জন্মস্থান ছিল।

বদিউল মুক্তিযুদ্ধের সময় কঞ্চিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর কুড়িগ্রামের ঢুষমারীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যাতায়াত করতে থাকেন এবং এই ক্যাম্পে গোয়েন্দা গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং দিয়েছেন ইপিআর– এর তৎকালীন হাবিলদার এবং মুক্তিযুদ্ধের ঢুষমারী ক্যাম্পের গ্রুপ কমান্ডার হায়দার আলী। পরে তিনি রৌমারীতে বিকল্প মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ইপিআর–এর তৎকালীন সুবেদার ও ১১নং সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার আলতাফ হোসেন ও কোম্পানি কমান্ডার নজরুল ইসলাম। তাঁর ট্রেনিংয়ের বিষয় ছিল শত্রুপক্ষের তথ্য গোপনে সংগ্রহ করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ তথ্য বুঝিয়ে দিয়ে রাতে গেরিলা হামলায় অংশগ্রহণ করা, শিশু হিসেবে, ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশ নিয়ে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের অবস্থান জানা, তাদের অস্ত্রের পরিমাণ ও ধরন ইত্যাদি জেনে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জানানো। প্রশিক্ষণকালে সামরিকবাহিনীর পোশাকের মধ্যে কী থাকলে কোন পদবি বোঝায়, কীভাবে রেকি করতে হয়, কোথায় কী রকম ছদ্মবেশ নিলে ভালো হয় তা বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রশিক্ষকগণ।

ঢুষমারীতে শেখ বদিউল আলম পাটওয়ারীর সাথে গাইবান্ধার সরকার পাড়ার নুরুল আমিন, লালমনিরহাটের মিশন মোড়ের মো. সাধু মিয়াসহ ৭ জন শিশু প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ইংলিশ হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে তারা এমনভাবে ফেরি করতেন যেন সত্যিকারের ফেরিওয়ালা ছিলেন। শিশু বলে পাকিস্তানি সেনার সামনে পড়ে গেলেও কিছু বলত না। শিশুদের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে উলিপুর, চিলমারী, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধায় শত্রু শিবিরে হামলা চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সফলতাও পেয়েছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নে সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩ বছর। গাইবান্ধার শিশু মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আমিনের বয়স মুক্তিযুদ্ধকালে ছিল ১১ বছর ৯ মাস। শেখ বদিউল আলমের ১২ বছরের কিছু বেশি। রংপুর বিভাগে এই রকম প্রায় ২০-২৫ জন এবং সারাদেশে ৪-৫শ শিশু, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় আসতে পারছেন না।

একাত্তরে তাঁদের বয়স ১১-১২ বছরের মধ্যে ছিল, কিন্তু সেই শিশুরা শত্রুপক্ষের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। তাই স্বীকৃতি তাঁদের প্রাপ্য। বিষয়টি সরকার ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল বিবেচনা করতে পারে।

প্রতিবেদন : আজহারুল আজাদ জুয়েল

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

মহান মে দিবস পালিত

১লা মে : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে মহান মে দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল –'শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ'।

❑ একনেকে ৫ প্রকল্প অনুমোদন

২রা মে: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) সভায় পাঁচটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৭১১ কোটি টাকা।

❑ বিশ্ব অ্যাজমা দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব অ্যাজমা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আপনার অ্যাজমা আপনিই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন'।

❑ বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'ক্রান্তিকালে সমালোচকদের দৃষ্টি ; শান্তিপূর্ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের ভূমিকা'।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে ১৬ই মে ২০১৭ বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাক্ষাৎ করেন – পিআইডি

❑ নওগাঁর পতিসরে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্‌বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

❑ **বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস**

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'রেড ক্রিসেন্ট সর্বত্র, সবার জন্য'।

❑ **রবীন্দ্রজয়ন্তী**

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬ তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে।

❑ **বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস**

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, 'রক্ত দিন, জীবন বাঁচান'।

নানা আয়োজনে বৌদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত

১০ই মে : রাজধানীসহ দেশজুড়ে বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলোতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'বৌদ্ধ পূর্ণিমা' উদ্‌যাপিত হয়।

❑ **আন্তর্জাতিক পরিযায়ী পাখি দিবস**

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক পরিযায়ী পাখি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'পরিযায়ী পাখির ভবিষ্যৎই আমাদের ভবিষ্যৎ, পাখি ও মানুষের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী চাই'।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস

১২ই মে : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নার্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'

এসএসসি'র ফল প্রকাশ

৪ঠা মে: এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। এবার দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

❑ **এসএসসি'র ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে বলেন, দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ে তুলতে সরকার প্রতিটি শিশুরই শিক্ষার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে চায়।

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী

৫ই মে : গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতে দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহ উৎক্ষেপণ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এই উপগ্রহ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে হবে মাইলফলক। ভিডিও কনফারেন্সে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেন, একই সঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে।

কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রী

৬ই মে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ সড়ক ,কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ উদ্‌বোধন, দুটি এলএনজি টার্মিনালসহ বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৮ই মে : সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধিত) আইন ২০১৭-এর খসড়া অনুমোদিত হয়। এছাড়া বৈঠকে রমজানের সরকারি-বেসরকারি অফিসের নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত সরকারি অফিস চলবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ৪ঠা মে ২০১৭ তাঁর কার্যালয়ে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০১৭-এর ফলাফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ – পিআইডি

এনইসি সভা

১৪ই মে : শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় আসন্ন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৩১ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুমোদিত হয়।

বিশ্ব মা দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব মা দিবস' পালন করা হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

১৫ই মে : সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেনানিবাস আইন ২০১৭-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৯শে মে ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন – পিআইডি

১৬ই মে : রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি তাঁর ভারত ও ভুটান সফর সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

একনেকে ৮ প্রকল্প অনুমোদন

এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ক্ষমতায়নে 'তথ্য অ্যাপ' প্রকল্পসহ মোট আটটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস

১৭ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'বিগ ডাটা বিগ ইমপ্যাক্ট'।

❑ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস

২৮শে মে : প্রতি বছরের ন্যায় এবারো দেশব্যাপী 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'নিরাপদ প্রসব চাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চল যাই'।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস

২৯শে মে : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০১৭' পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশি সদস্যদের পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

অস্ট্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী

২৯শে মে : আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) ৬০ হতে পারে বিতর্কিত ইতিহাসের অভয়ারণ্য'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০শে মে অস্ট্রিয়ায় 'আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার টেকনিক্যাল সহযোগিতা কর্মসূচি : ৬০ বছর পেরিয়ে উন্নয়নে অবদান' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন – পিআইডি

হাওরে বন্যাদুর্গতদের পাশে প্রধানমন্ত্রী

১৮ই মে : নেত্রকোনার হাওর এলাকায় বন্যাদুর্গতদের পাশে গিয়ে হাওরের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

❑ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরে ৭ দিনের অনুষ্ঠানমালা ও প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'জাদুঘর

বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে অংশ নিতে অস্ট্রিয়া যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৩০শে মে : অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় 'আইএইএ কারিগরি সহযোগিতা কর্মসূচি: ৬০ বছর পেরিয়ে উন্নয়নে অবদান' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও জ্ঞান বিনিময়ের মধ্য দিয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'বিজ্ঞানভিত্তিক কূটনীতির' ওপর জোর দেন।

প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

জেগে উঠেছে 'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ'

সম্প্রতি মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৮০ কি.মি. দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে উঠেছে এক দ্বীপ। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২ মিটার উচ্চতায় রয়েছে এটি। ৭.৮৪ বর্গ কি.মি. আয়তনের এ ভূখণ্ড বর্তমানে পূর্ণতা লাভ করেছে। নতুন সম্ভাবনার এ দ্বীপ ৯ কি.মি. দীর্ঘ ও ৫০০ মিটার প্রশস্ত। পর্যটন শিল্প বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের এ সম্ভাবনার নাম 'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ'।

সর্বক্ষণ পানি উৎপাদনের ব্যবস্থা

রমজান মাসকে কেন্দ্র করে সরকার রাজধানীতে সর্বক্ষণ পানির ব্যবস্থা করেছে। গ্রীষ্মকালে পানির চাহিদা বেশি থাকে। তাছাড়া রমজানে মানুষের যাতে কষ্ট না হয়, সেজন্য সরকার ৭৮১টি পাম্পে সার্বক্ষণিক উৎপাদন নিশ্চিত করেছে। পাম্প অপারেটরদের ছুটি বাতিলসহ সার্বক্ষণিক পানির গাড়ি ও ট্রলির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ৩ পাম্পে জেনারেটর ও বিদ্যুতের ডুয়েল কানেকশন দেওয়া হয়েছে। ২৫শে মে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

ঈদে বিআরটিসি'র ৯০০ স্পেশাল বাস

রাজধানীর কমলাপুর বিআরটিসি'র বাস ডিপোতে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'ঈদে ঘরমুখো মানুষের জন্য বিআরটিসি'র ৯০০ স্পেশাল বাস প্রস্তুত থাকবে। এই বাসগুলো ২২শে জুন থেকে ঈদের পরবর্তী তিনদিন পর্যন্ত চলবে।

মেহেরপুরের হিমসাগর ইউরোপে রপ্তানি

স্বাদে সেরা মেহেরপুরের হিমসাগর এবার যাচ্ছে ইউরোপে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোতে এবার প্রায় ২০০ মেট্রিক টন আম রপ্তানি হবে। গত বছর হয়েছিল ১২ মেট্রিক টন। ৩১শে মে থেকে আম সংগ্রহ শুরু হবে। **প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

আরব-ইসলামিক-আমেরিকান শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

এবারই প্রথম আরব-ইসলামিক-আমেরিকান শীর্ষ সম্মেলন সৌদি রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। ২১ শে মে সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সউদ এ সম্মেলন উদবোধন করেন। সম্মেলনে বিশ্বের ৫৬টি দেশ অংশগ্রহণ করে। সৌদি আরবের নেতৃত্বে যে সামরিক জোট গঠন করা হয়, প্রধানত সেই জোটের দেশগুলোই এই সম্মেলনে অংশ নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যোগ দেওয়ায় আরব-আমেরিকা সম্মেলনে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে বিজয়ের পর এই প্রথম কোনো দেশে সম্মেলনে যোগ দিলেন।

রিয়াদ ঘোষণায় ইরাক ও সিরিয়ার সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে অভিযানের জন্য প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। তবে ঢাকা ও রিয়াদের কূটনীতিকরা জানান, রিয়াদ ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের যৌথ উদ্যোগে সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হলেও বাংলাদেশ সেখানে সৈন্য পাঠাতে আগ্রহী নয়। শুধুমাত্র মক্কা ও মদিনার পবিত্র মসজিদ আক্রমণ হলেই বাংলাদেশ সৈন্য পাঠাতে পারে। এছাড়া জাতিসংঘের নেতৃত্বে কোনো জোট হলে সেখানে বাংলাদেশ সৈন্য পাঠাবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেন।

ব্রিটেন পার্লামেন্ট নির্বাচনে এবার ১২ প্রবাসী বাংলাদেশি প্রার্থী হয়েছে

৮ই জুন ২০১৭ ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে ১২ জন প্রবাসী বাংলাদেশি ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। লেবার পার্টি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন ৮ জন। লিবারেল ডেমোক্র্যাট থেকে দুজন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন দুজন। লেবার পাটির হ্যামস্টেড ও কিলবার্ন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন টিউলিপ সিদ্দিক, বেথ নাল এবং বো আসন থেকে রুশনারা আলী, ইলিং সেন্ট্রাল এবং কটন থেকে রুপা হক, ওয়েলিং এবং হার্ড ফিল্ড থেকে ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল, বেকেনহাম থেকে মেরিনা আহমেদ, স্কটল্যান্ড এডিনবরা সাউথ ওয়েস্ট থেকে ফয়সাল চৌধুরী, পোর্টসমাউথ নর্থ থেকে আবদুল্লা রোমেল খান, সাউদার্ন থেকে রোশনারা রহমান। লিবারেল ডেমোক্র্যাট পার্টি থেকে লুটন সাউথে মনোনয়ন পেয়েছেন আশুক আহমেদ এবং ওয়ার ফরেস্ট থেকে সাজু আহমেদ। বেথনাল এবং বো আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন আজমল মাশরুর, লাইম হাউস এবং পপলার থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন অলিউর রহমান। ব্রিটেনের মূলধারার রাজনীতিতে বাঙালিদের অংশগ্রহণ আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, গত নির্বাচনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনজন বাঙালি এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে মে ২০১৭ সৌদি আরবের বাদশাহ আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্মিলিত আলোকচিত্র পর্বে অংশগ্রহণ করেন – পিআইডি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

টেক্সটাইল বিষয়ে গবেষণা ও চর্চা বাড়ানোর আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৩রা মে তেজগাঁও– এ বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স) অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নবনির্মিত মেজর নজরুল ইসলাম হলের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের সমস্যা সমাধানের প্রযুক্তি আমাদেরই আবিষ্কার করতে হবে। আমরা শুধু প্রযুক্তি আমদানি করব না রপ্তানিও করব। এলক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী টেক্সটাইল শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা ও জ্ঞান চর্চা বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় একটি বাস্তবমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানকার শতভাগ শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থান হচ্ছে। টেক্সটাইল গবেষণায় এটাকে সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

সিলেটের গোলাপগঞ্জ এমসি একাডেমি সরকারিকরণের ঘোষণা ও নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৭ই মে সিলেট যান। সিলেটের গোলাপগঞ্জ এমসি একাডেমি প্রাঙ্গণে এমসি একাডেমি (মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ) সরকারিকরণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মন্ত্রী। এসময় তিনি গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানি বাজারে দুটি বিশ্বমানের কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। একই দিন শিক্ষামন্ত্রী শাহজালাল উপশহরের একটি হোস্টেলে একটি আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শিক্ষায় পিছিয়ে থাকলে স্বনির্ভর হওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করেন। তিনি ২০১৭ সালের মধ্যেই বিয়ানি বাজার এবং গোলাপগঞ্জের সব গ্রামে বিদ্যুৎ যাবে বলে আশ্বাস দেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার নির্দেশ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৫ই মে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অতীশ দিপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে হবে। বিধিবিধান মেনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে হবে। যারা নির্ধারিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং একাধিক ক্যাম্পাসে পাঠদান পরিচালনা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রী দেশের বাস্তবতা এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফিসহ সকল প্রকার ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দক্ষ মানবসম্পদ। বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও তথ্য বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। এছাড়া মেধাবী ও সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা যাতে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যাদানকারী জঙ্গিদের কবলে পড়ে জীবন ধ্বংস না করে সেদিকে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৫ই মে ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অতীশ দিপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

অটিস্টিক শিশুরাও হতে পারে বিজ্ঞানী-চিকিৎসক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের(বিএসএমএমইউ) উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান অটিজম বিষয়ক ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রামের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বলেন, অটিজমের শিকার শিশুদের রয়েছে কোনো বিশেষ বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর ও দক্ষতা। এগুলো চিহ্নিত করে সহায়তা করতে পারলে তারাও হতে পারে বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, শিল্পী ও গণিতবিদ।

তিনি বলেন, অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে দেশে বিপ্লব ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি অটিজমকে চিহ্নিত করা, চিকিৎসা, পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, অটিস্টিক শিশুর পিতামাতাদের পাশে রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজের বিভিন্ন শক্তি ও পেশাজীবীরা থাকায় তাদের অসহায়ত্ববোধ কিছুটা হলেও দূর হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে অটিজম বিষয়ে সচেতনতার ক্ষেত্রে দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সমাজের সকলেরই মানবিক দায়িত্ব রয়েছে।

প্রতিবেদন : হাছিনা আক্তার

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

আরো ১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক হচ্ছে

দেশে আরো নতুন ১ হাজার ২৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের এবং পুরোনো ২ হাজার ক্লিনিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১৫ই মে সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল উপস্থাপন সংক্রান্ত এক সভায় এই তথ্য জানানো হয়।

সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের যেসব

অর্জনকে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করছে সেগুলোর মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক অন্যতম।

চিকনগুনিয়া ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজন সচেতনতা

চিকনগুনিয়া ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে আতঙ্ক না ছড়িয়ে গণসচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। ১৭ই মে সচিবালয়ে চিকনগুনিয়া রোগ বিস্তার রোধে করণীয় সংক্রান্ত এক সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, চিকনগুনিয়া মরণঘাতী কোনো রোগ নয়। এ নিয়ে অহেতুক ভীত বা আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ করেন। নিজ বাড়িঘর এবং আশপাশে যেন কোনোভাবে পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী আরো বলেন, সাধারণত জমে থাকা পানির মধ্যেই চিকনগুনিয়া ও ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশা জন্মায়। মশা নিধনই এ রোগ প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায়।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাচ্ছে কলেজগুলো

দেশের সরকারি-বেসরকারি সব মেডিক্যাল কলেজ তিনটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ৭ই মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গ প্রতিস্থাপন বিষয়ক সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহম্মদ নাসিম এ তথ্য জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ঢাকা বিভাগের মেডিক্যাল কলেজগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) অধীনে,

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ১৫ই মে ২০১৭ তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল উপস্থাপন বিষয়ক সভায় সভাপতিত্ব করেন – পিআইডি

চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলের কলেজগুলো যথাক্রমে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় যাবে। এতে কলেজ পরিচালনা সহজ হবে।

হাওরের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাওর এলাকার মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। ৩রা মে সুনামগঞ্জে কৃষকদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ শেষে একটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্‌বোধন করেন তিনি।

হাওর পাড়ে ফসলহারা মানুষদের জন্য আরো ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলা হবে এবং তাদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, ওষুধের ব্যবস্থা করবে সরকার।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী উৎসব

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও ছায়ানটের সভাপতি ড. সনজিদা খাতুন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর। আলোচনা শেষে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, মিতা হক, শামা রহমান প্রমুখ।

জাতীয় জাদুঘরে চর্যাগানের আসর

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতি নিয়ে ভাবনগর ফাউন্ডেশন আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে ২১শে মে সপ্তাহব্যাপী চর্যাগানের আয়োজন করে। জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ভাবনগর ফাউন্ডেশনের শিল্পীরা চর্যাগানের পাশাপাশি চর্যানৃত্যও পরিবেশন করেন। ভারতের শিল্পীরাও চর্যাগান ও নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগীতজ্ঞ অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী।

রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন হায়াত মামুদ ও মিতা হক

রবীন্দ্র সাহিত্যে গবেষণা ও চর্চায় অবদানের জন্য প্রাবন্ধিক, গবেষক, অধ্যাপক হায়াত মামুদ এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মিতা হক পান বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ই মে বাংলা একাডেমির আয়োজনে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

বন্ধুত্বের সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি

বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো গভীর করার লক্ষ্যে এবং এই সময়ের শিল্পচর্চার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো এপার-ওপারের ২০ জন নবীন শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। ইন্টিগ্রেটি অব বেঙ্গল বা বাংলায় অখণ্ডতা শিরোনামে 'বন্ধুত্বের সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি' স্লোগানে ১৫ই মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় জয়নুল গ্যালারির সামনে অনুষ্ঠিত হয় এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের কবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নওগাঁর পতিসরে ৮ই মে দুদিনব্যাপী সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। জাতীয় পর্যায়ের এ অনুষ্ঠান উদ্‌বোধনকালে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন না, তিনি পল্লি সংস্কারকও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর কালের কবি নন, তিনি সর্বকালের কবি।

সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৫শে মে ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন –পিআইডি

পাটমন্ত্রী ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক, সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ইস্রাফিল আলম, অধ্যাপক হায়াত মামুদ ছাড়াও ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কবি নজরুলের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী ছিল ১১ই জ্যৈষ্ঠ। এদিন কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সারাদেশে দিনটি উদ্‌যাপিত হয় নানা আয়োজনে। এ বছর জন্মবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান হয় ঢাকায়। কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এদিন ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। কবির ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য–'সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সৈনিক নজরুল।' নজরুল ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এ উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডিজিটাল বাংলাদেশ

১৬টি অ্যাপ জাতীয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন পুরস্কার পেল

জাতীয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন পুরস্কার পেল ১৬টি অ্যাপ। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের তৈরি সেরা মোবাইল কনটেন্ট এবং উদ্ভাবনী মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ৪ঠা মে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দ্বিতীয়বারের মতো এ পুরস্কার দেওয়া হয়। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আয়োজনে ৮টি বিভাগে এই ১৬টি অ্যাপের নির্মাতাদের পুরস্কৃত করা হয়। অ্যাপগুলো হলো–ভ্যাট চেকার, প্রাইমারি স্কুল মনিটরিং ইয়ুথ আপরচুনিটিস, হাই আই ওয়ার্ক, হিরোজ অব সেভেন্টি, ব্রেইন ইকুয়েশন, জলপাই, বেবিটিকা, নৌকা বাইচ, পথ দেখুন, কলরব, অটিজম বার্তা, ডেসকো ও শপ-আপ।

গ্লোবাল মোবাইল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেল আইসিটি বিভাগ

'গ্লোবাল মোবাইল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৭' পেয়েছে সরকারের আইসিটি বিভাগ। সম্মানজনক এ পুরস্কারটি বিশ্বব্যাপী মোবাইল ফোনভিত্তিক প্রযুক্তির অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত জ্ঞানের আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করতে প্রদান করা হয়।

৯ই মে যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত সামিটে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। 'জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক কর্মসূচির জন্য আইসিটি বিভাগকে এ পুরস্কার দেয় এমফর লাইফ ডট ও আরজি নামের একটি প্রতিষ্ঠান।

দেশে আইসিটি বিপ্লব

এখন বাংলাদেশেই তৈরি হতে যাচ্ছে বিশ্বমানের প্রযুক্তি পণ্য স্মার্টফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ। দেশের নির্মিত সফটওয়্যার দিয়েই চলবে দেশের ব্যাংক, বিমা, কলকারখানা, অফিস-আদালত। এ সবকিছুর দ্বার খুলতে প্রস্তুত হচ্ছে প্রযুক্তি পণ্যের শিল্পাঞ্চল হাইটেক পার্ক। হাইটেক পার্কের উন্নয়নে এবং বিনিয়োগে ইতোমধ্যেই যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুরভিত্তিক চারটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশ হাইটেক পার্কের তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অভাবনীয় সাফল্যে এ অগ্রযাত্রা এখন বিশ্ব স্বীকৃত। তথ্যপ্রযুক্তি খাত থেকে ২০২১ সালের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

দুর্যোগ মোকাবিলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া জানান, দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশব্যাপী স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। এর ফলে যে-কোনো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তাৎক্ষণিক চিত্র সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

১৭ই মে তিনি রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে 'দুর্যোগ মোকাবিলায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহার' শীর্ষক এক কর্মশালায় এ বক্তব্য পেশ করেন। বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার এ কর্মশালার আয়োজন করে। দেশের দুটি ইউনিয়নকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির আওতায় আনা হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কাউয়াকোলা ইউনিয়ন ও বরগুনা সদর উপজেলার পাতাকাটা ইউনিয়ন। এর ফলে মোবাইলে যে-কোনো জায়গা থেকে ওই ইউনিয়ন দুটির দুর্যোগের চিত্র দেখা যাবে।

নাসা অ্যাপসের বাংলাদেশ পর্বের সমাপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা আয়োজিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ হ্যাকাথন প্রতিযোগিতা 'নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০১৭' –এর বাংলাদেশ পর্ব শেষ হলো। ৩০শে মে রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ ঘণ্টার প্রতিযোগিতা শেষে ১১টি দলকে প্রথম পর্যায়ে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পর্বের পাঁচ অঞ্চল থেকে বিজয়ী হয়েছে ১১টি দল। অঞ্চলগুলো হলো–ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, সিলেট ও বরিশাল।

ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর উৎক্ষেপণ

দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হবে আগামী ডিসেম্বরেই। আর পরের বছরের জুন থেকে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবে। ২৯শে মে ২০১৭ সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ২৯শে মে ২০১৭ সচিবালয়ে টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট'-এর কাজের অগ্রগতি ও সম্ভাব্য উৎক্ষেপণের বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন -পিআইডি

সম্প্রতি স্যাটেলাইট নির্মাণের অগ্রগতি পরিদর্শনে ফ্রান্স সফর করেন প্রতিমন্ত্রী। ফ্রান্সের থালিস এলিনিয়া স্পেস ফ্যাসিলিটিতে এ স্যাটেলাইট নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। ২০১৮ সালের জুনে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বাণিজ্যিক অপারেশনে যেতে পারবে বলে জানান তিনি।

ফ্রান্সে তৈরি স্যাটেলাইটটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষেপণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই উৎক্ষেপণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হবেন বলে জানান তারানা হালিম। **প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি**

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-খুলনা-কলকাতা রুটে বাস চলাচল শুরু

রাজধানী ঢাকা থেকে খুলনা হয়ে কলকাতার রুটে সরাসরি বাস চলাচল শুরু হয়েছে। গ্রীন লাইন ও বিআরটিসি পরিবহণ যৌথ উদ্যোগে একদিন পর পর বাসটি ঢাকা থেকে কলকাতায় যাত্রী বহন করবে। এই কোচটি খুলনা থেকেও যাত্রী তুলবে। ২২শে মে সকাল ৭টায় কমলাপুরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ করপোরেশনের আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনালে এ সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান। মিজানুর রহমান জানান, ঢাকা থেকে মাত্র ১০ ঘণ্টায় কলকাতায় পৌঁছা যাবে।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মিজানুর রহমান জানান, মাওয়া হয়ে এটাই প্রথম কলকাতার সঙ্গে চালু হওয়া বাস সার্ভিস। ফলে খুব অল্প সময়েই কলকাতায় পৌঁছা সম্ভব। প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকা থেকে বাস ছাড়বে আর কলকাতার সল্টলেক করুণাময়ী আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল থেকে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসবে। বাসটি রাত ৮টায় ঢাকা এসে পৌঁছবে। ১৯৯৮ সালে প্রথম ঢাকা-কলকাতা যাত্রীবাহী বাস সার্ভিস চলাচল শুরু হয়। ২০১৫ সালে প্রথম কলকাতা-ঢাকা-আগরতলার মধ্যে যাত্রীবাহী বাস চলাচল শুরু হয়। উল্লেখ্য, ৮ই এপ্রিল ২০১৭ খুলনা-কলকাতা রুটে আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী ট্রেন ও বাস সার্ভিস শুরু হয়েছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

সাতক্ষীরায় পানিফল চাষ

পানিফল একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। এর ইংরেজি নাম Water chestnut এবং উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Trapa bispinosa। পানিফল স্থানভেদে Water caltrop, buffalo nut, devi pod নামেও পরিচিত। পানিফলের আদিনিবাস ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা হলেও এর প্রথম দেখা পাওয়া যায় উত্তর আমেরিকায়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের বেশকিছু জায়গায় পানিফলের গাছকে আগাছা হিসেবে গণ্য করা হয়। জানা যায় যে, প্রায় তিন হাজার বছর পূর্ব থেকেই চীন দেশে পানিফলের চাষ হয়ে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও টাঙ্গাইল জেলায় বাণিজ্যিকভাবে পানিফলের চাষ শুরু হয়েছে।

পানিফল একটি বর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদ। জলাশয় ও বিল-ঝিলে এ ফলটি জন্মে। এ গাছের শিকড় থাকে কাদার মধ্যে, কাণ্ড থাকে পানিতে ডুবে, আর পাতা পানির

পানিফল

উপর ভাসতে থাকে। পাতা দেখতে অনেকটা কচুরিপানান মতো, তবে ছোটো, পুরু এবং গাঢ় সবুজ। পাতায় শিরা তেমন চোখে পড়ে না। পাতা ৮ সেন্টিমিটার লম্বা ও পাতার কিনারা খাঁজকাটা, প্রায় ৬ সেন্টিমিটার চওড়া হয়। পাতার বোঁটা পশমযুক্ত। কাণ্ড নলাকার দড়ির মতো, পেন্সিলের মতো মোটা হয়। এক একটি গাছ প্রায় পাঁচ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পানিফলের আরেক নাম 'শিংড়া'। ফলগুলোতে শিঙের মতো খাঁজকাটা থাকে বলেই এরকম নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কোথাও কোথাও একে 'পানি সিংগাড়া' নামেও ডাকা হয়। বীজ থেকে পানিফলের গাছ জন্মে। সাধারণত পাকা ফলের বীজ প্রথম দুবছরের মধ্যেই গজিয়ে যায়। তবে বারো বছর পর্যন্ত পনিফলের বীজ গজানোর ক্ষমতা রাখে। পানিফলের ফুল ক্ষুদ্রাকার ও সাদা রঙের। ফুল উভয়লিঙ্গ। ফলচাষ শুরু হয় জুন-জুলাই মাসে এবং ফল সংগ্রহ শুরু করা হয় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। পানিফল কচি অবস্থায় লাল, পরে সবুজ এবং পরিপক্ক হলে কালো রং ধারণ করে। ফলটির পুরু নরম খোসা ছাড়ালেই পাওয়া যায় হৃৎপিণ্ডাকার বা ত্রিভুজাকৃতির সাদা শাঁস। কাঁচা ফলের নরম শাঁস খেতে বেশ সুস্বাদু। প্রতি ১০০ গ্রাম পানিফলে ৮৪.৯ গ্রাম পানি, ০.৯ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ২.৫ গ্রাম আমিষ, ০.৯ গ্রাম চর্বি, ১১.৭ গ্রাম শর্করা, ১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৮ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.১১ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২ ও ১৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। তাছাড়া এ ফলে ৬৫ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি থাকে। পানিফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম রয়েছে। দেহের প্রয়োজনীয় খনিজ লবণগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম অন্যতম। ফসফরাসের সহযোগিতায় শরীরের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত করা ক্যালসিয়ামের প্রধান কাজ। লৌহ অত্যন্ত জরুরি একটি খনিজ লবণ। লৌহের অভাবে মানবদেহে অপুষ্টিজনিত রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। ছোটো ছেলেমেয়েরা এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা অতি সহজে এ রোগের শিকার হয়। পানিফলে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম পানি ফলে ভিটামিন 'সি'-এর পরিমাণ ১৫ মিলিগ্রাম। আর শসাতে আছে ভিটামিন 'সি' মাত্র ৫ মিলিগ্রাম। ভিটামিন 'সি' শরীরের চামড়া, দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য। তাছাড়া ভিটামিন 'সি' অন্ত্রে লৌহ শোষণে সাহায্য করে। বাংলাদেশের শতকরা ৯৩ ভাগ পরিবার ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে ভুগছে। খাদ্যে ভিটামিন 'সি' ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি বিবেচনা করে এ ফলের প্রতি আমাদের অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পানিফল কাঁচা খাওয়া হয়, তবে সিদ্ধ করেও খাওয়া যায়। কাঁচা পানিফল বলকারক। দুর্বল ও অসুস্থ মানুষের জন্য সহজপাচ্য খাবার। ফলের শুকনো শাঁস রুটি করে খেলে এলার্জি ও হাত-পা ফোলা রোগ উপশম হয়। পিত্তপ্রদাহ, উদরাময় ও তলপেটের ব্যথা উপশমে পানিফল খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। বিছা পোকা কামড়ের যন্ত্রণায় থেঁতলানো কাঁচা ফলের প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। চীনের বেশ কিছু খাবার তৈরিতে পানিফল ব্যবহার করা হয়।

পানিফল খুব লাভজনক একটি ফসল। এর উৎপাদন খরচ খুব কম। চারা রোপণের ৯০-১০০ দিন পর থেকে পানিফল সংগ্রহ করা যায়। প্রতি বিঘা জমিতে ৫০-৬০ মণ পানিফল উৎপন্ন হয়। সাতক্ষীরা জেলার সদর, কলারোয়া, দেবহাটা, কালিগঞ্জ, আশাশুনি ও শ্যামনগর এবং টাঙ্গাইলের কালিহাতি ও ঘাটাইল উপজেলায় জলাবদ্ধ এলাকার চাষিরা পানিফল চাষ করে অধিক লাভবান হচ্ছেন। ফলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এ ফলের চাষ।

প্রতিবেদন: মো. আবদুর রহমান, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

রোগসহিষ্ণু জাতের ধান উদ্ভাবন

ঝিনাইদহে ধানের নতুন একটি জাত উদ্ভাবন করেছেন দুদু মিয়া নামের এক কৃষক। উচ্চ ফলনশীল ও রোগবালাই প্রতিরোধক এই ধান ইতোমধ্যে 'দুদুলতা' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

জানা যায়, ২০১২ সালে সদর উপজেলার কালুহাটি গ্রামের কৃষক এমদাদুল হক দুদু মিয়া সুবল্লতা ধানের মধ্যে নতুন জাতের ৩টি গোছার সন্ধান পান। পর পর দুই বছর সেই ধান পরিচর্যা করে বীজ তৈরি করে নিজের জমিতে আবাদ শুরু করেন। বালাইসহিষ্ণু এই ধানের জাতটি উচ্চতায় খাটো হওয়ার কারণে ঝড়-বাতাসে হেলে পড়ে না। পোকামাকড়ের আক্রমণও হয় কম। গত বছর কৃষক দুদু মিয়া ৩ বিঘা জমিতে ১০০ মণ ধান উৎপাদন করেন। ব্রি-বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় এ ধান উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান কৃষক দুদু মিয়া।

ভুট্টার বাম্পার ফলন চলনবিলে

মৎস্যভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত নাটোরের সিংড়ায় ভুট্টার বাম্পার ফলন হয়েছে এবার। চলতি মৌসুমে নাটোরের সিংড়া উপজেলার ডাহিয়া, ইটালি, তাজুপুর ও শেরকোল ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি ভুট্টার আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে এসকে ৪০, প্যাসিফিক মুকুট, এলিট, সুপার ফাইন জাতের ভুট্টার আবাদ বেশি হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অধিদফতরের দেওয়া তথ্য মতে, এ বছর উপজেলায় ১ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫০ হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদ বেশি হয়েছে। এবার কাঁচা ভুট্টা প্রতি মণ ৪২০–৫০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। শুকনো ভুট্টা প্রতি মণ ৬৫০–৭০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। গতবারের চেয়ে বেশি দাম পেয়ে কৃষকরা খুশি। চলনবিলে উৎপাদিত ভুট্টা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বিজনেস হাবে' পরিণত করা হবে

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেছেন, সমতলের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের উৎপাদিত দ্রব্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানির সুবর্ণ সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলকে 'বিজনেস হাবে' পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

২৫শে মে ২০১৭ রাজধানীর একটি হোটেলে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিমানমন্ত্রী একথা বলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউনটেইন ডেভেলপমেন্ট এই কর্মশালার আয়োজন করে।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন ২৫শে মে ২০১৭ লেকশোরে Destination Management Plan শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

পর্যটন মন্ত্রী বলেন, পাহাড়, নদী, লেক ও ঝরনাবেষ্টিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথিবীর অন্যতম পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান। এ এলাকাকে বিশ্বমানের পর্যটন অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে।

রাজশাহীতে আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সম্মেলন

'তারুণ্যই শক্তি, আদিবাসীদের মুক্তি'– স্লোগান রেখে আদিবাসী ছাত্র পরিষদের চতুর্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ২৬শে মে ২০১৭ রাজশাহী আলুপট্টি মোড় থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রা শেষে মিয়াপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি এবং জাতীয় আদিবাসী পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা। অতিথি ছিলেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন আদিবাসী যুব পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হরেন্দ্রনাথ সিং।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ছিলেন বাংলার প্রথম মুসলিম সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজধানী ছিল ঐতিহাসিক সোনারগাঁওয়ে। তাঁর শাসনাধীন এলাকা বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি এবং সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের সিলাহদার (অস্ত্রাগার তত্ত্বাবধায়ক)। ১৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর ফখরুদ্দিন সোনারগাঁওয়ের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেন এবং ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নাম ধারণ করে নিজেকে সোনারগাঁওয়ের স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। সেসময় বাংলাদেশ ছিল দিল্লির তুঘলক শাসিত অঞ্চল। এটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সোনারগাঁও, সাতগাঁও এবং লখনৌতি। ফখরুদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের সূচনা হয়। তারপর তিনি তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন

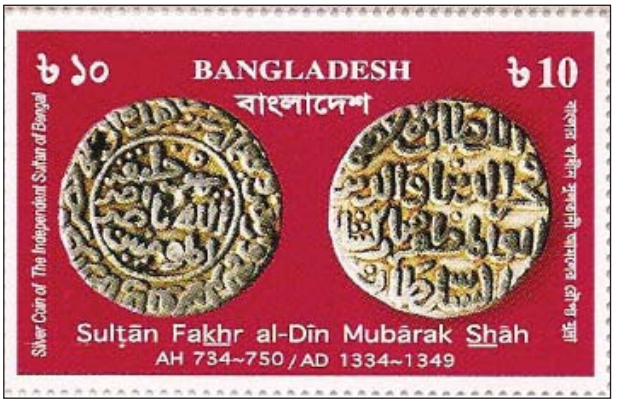

সুলতানি আমলের ডাক টিকেটের মুদ্রার ছবি

বর্তমান কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জয় করেন এবং উত্তরের সিলেটও জয় করেন। তিনিই প্রসারিত করে দেন পরবর্তী দুই শতাব্দীব্যাপী বাংলায় স্বাধীন শাসনের দিগন্তকে। তিনি ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ বছর দিল্লির হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীনভাবে বাংলার একাংশ শাসন করেন। দিল্লির শাসকগণ কয়েকবার চেষ্টা করলেও ফখরুদ্দিনের নিকট থেকে বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারেননি। সোনারগাঁওয়ে শুরু হওয়া বাংলার এ স্বাধীনতা পরবর্তী দুইশ বছর অক্ষুণ্ন থাকে।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকারের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন। চট্টগ্রাম তখন ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন। তিনি নোয়াখালীর মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হন এবং যুদ্ধে ত্রিপুরার রাজা প্রতাপ মাণিক্যকে পরাজিত করে কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জয় করেন। চট্টগ্রামের অভিযানে বদরউদ্দিন আল্লামার (বদরপীর) নেতৃত্বে বহুসংখ্যক সুফি দরবেশ সুলতানের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম জয়ের পর ঐ অঞ্চল একটি প্রদেশ (মূলক) হিসেবে ফখরুদ্দিনের সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর অপর পারে একটি সুউচ্চ ও দুর্ভেদ্য দুর্গও দখল করেন। সুলতান শাযদা নামের এক সুফি দরবেশকে ফখরুদ্দিন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা (নায়েব) নিয়োগ করেন।

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আলকরা ইউনিয়নে একটি রাস্তা রয়েছে, যার স্থানীয় নাম 'হদ্দিনের হঁথ' অর্থাৎ শুদ্ধ বাংলায় 'ফখরুদ্দিনের পথ'। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জয় করার পর চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এ রাস্তাটি নির্মাণ করেছিলেন, যার অধিকাংশটাই এখন বিলুপ্ত। চৌদ্দগ্রামের রাস্তার অংশটুকু ছাড়াও চাঁদপুরে এবং চট্টগ্রামের মিরশ্বরাইতে এ রাস্তার কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে বলে জানা যায়।

একজন স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নিজ নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন। তাঁর মুদ্রায় খোদিত তারিখ থেকেই ধারণা করা হয় যে, তিনি ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগাঁও-এ রাজত্ব করেন।

ফখরুদ্দিনের অধীনে বাংলার সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার বর্ণনায়। ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজধানী ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বাংলায় তার ভ্রমণের এক মূল্যবান বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান। এ বিবরণে বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য, অধিবাসীদের জীবনের বিভিন্ন দিক এবং দেশের সমৃদ্ধির প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি তার বিবরণে ফখরুদ্দিনের চারিত্রিক গুণাবলির প্রশংসা করে তাঁকে একজন খ্যাতনামা নৃপতি হিসেবে মূল্যায়ন করেন। তার বিবরণে সেসময়ে বাংলাদেশে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রাচুর্য, রমরমা অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, চালের উদ্বৃত্ত মজুত, বিদেশে চাল রপ্তানি এবং প্রতিবেশী দেশ চীন ও জাভার সঙ্গে সোনারগাঁওয়ের বাণিজ্যিক যোগসূত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুলতান ফখরুদ্দিন ছিলেন ফকির ও সুফি দরবেশদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। সুলতানের স্থায়ী নির্দেশ ছিল যে, তাঁর রাজ্যে ফকিরদের নদী পারাপারের জন্য কোনো মাশুল বা ভাড়া প্রদান করতে হবে না। যে-কোনো আগন্তুক, ফকির ও সুফিদের বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে এবং কোনো ফকির কোনো শহরে পৌঁছলে তাকে ন্যূনতম অর্ধ দিনার ভাতা প্রদান করতে হবে।

ফখরুদ্দিন ছিলেন খ্যাতনামা নৃপতি, সমর বিজেতা ও কূটনীতিক। দিল্লির অধীনতার পাশ থেকে বাংলার স্বাধীনতা সূচনার অগ্রনায়ক। বহুমুখী গুণে গুণান্বিত বাংলার এই সুলতানের প্রধান কৃতিত্ব হলো, স্বল্পমূল্যে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রাচুর্যতা নিশ্চিত করে তাঁর রাজ্যের জনগণের জন্য সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারক, বহিরাগত ও ফকির-দরবেশদের উদার পৃষ্ঠপোষক, মসজিদ, সমাধিসৌধ ও সড়ক নির্মাতা, আরাকানি মগদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন থেকে রাজ্যের জনগণের রক্ষক এই মহান নৃপতি বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল যুগের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে (৭৫০ হিজরি) সোনারগাঁওয়েই ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের মৃত্যু হয়।

প্রতিবেদন : আফিয়া খাতুন, যুগ্মসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

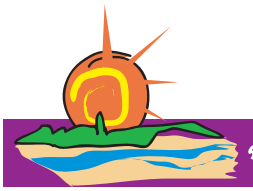

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

তামাক দূষিত করছে পরিবেশ

বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটছে ধূমপানসহ অন্যান্য তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের ফলে। তামাকজাত পণ্যের উৎপাদন, বিতরণ এবং এর বর্জ্যে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশেরও। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, ২০৩০ সাল নাগাদ তামাকজাত পণ্যের কারণে ৮০ শতাংশ মৃত্যু ঘটবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসকে লক্ষ্য রেখে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। ডাব্লিউএইচও প্রধান মার্গারেট চেন বলেন, তামাক সবার জন্য হুমকি। এটি দারিদ্র্যতা বাড়াচ্ছে। কমাচ্ছে উৎপাদনশীলতা। আর পরিবেশ দূষণ তো আছেই। ডাব্লিউএইচও-এর অ্যাসিট্যান্ট জেনারেল ওলেগ চেস্তনোভ বলেন, উৎপাদনের শুরু থেকে ভোগ তামাকজাত পণ্যের পুরো প্রক্রিয়াই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তামাক চাষে প্রচুর কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। কয়েকটি দেশে ক্রমবর্ধমান তামাক চাষও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া তামাক পাতা পরিশোধন করতে ব্যাপক জ্বালানির প্রয়োজন পড়ে। ডাব্লিউএইচও-এর হিসাব অনুযায়ী, ৩০০ সিগারেট উৎপাদনে একটি বড়ো আকৃতির গাছ লাগে জ্বালানি হিসেবে। এর মানে প্রতিবছর কোটি কোটি গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তামাকজাত পণ্যের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পেছনে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। এজন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশের সরকার প্রধানকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান করা

শুকিয়ে যাওয়া নদী

হয়েছে। আর এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার দেশকে তামাকমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে চলেছেন।

নদনদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে সরকারি পদক্ষেপ

দেশের নদনদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে দেশের ২৩টি বড়ো নদী খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সংসদে প্রশ্নোত্তরের সময় পানিসম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের অন্যতম প্রধান নদী যমুনা, গঙ্গা, পদ্মা ভাঙন রোধে সরকার 'ফ্লাড অ্যান্ড রিভার ব্যাঙ্ক ইরোসান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' (এফআরইআরএমআইপি) শীর্ষক একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি ২০১৪–১৫ অর্থবছরে শুরু হয়ে ২০২২–২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে মোট ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। ৩টি পর্যায়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) সর্বমোট ২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা এবং নেদারল্যান্ড সরকার ১৫ দশমিক ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা প্রদান করবে। মন্ত্রী বলেন, দেশব্যাপী ৮৯ দশমিক ২৪৬ কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশের নদীতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্প এবং ৩৪ দশমিক ৬০৯ কিলোমিটার সীমান্ত নদী সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

লন্ডনে স্পিকার পদে বাংলাদেশের মেয়ে সাবিনা

সাবিনা আখতার

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের মেয়ে সাবিনা আখতার স্পিকার হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৮ই মে টাউন হলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, এর আগে তিনি কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

পুরস্কৃত হলেন পাঁচ 'জয়িতা'

ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল পাঁচ নারীকে 'জয়িতা' নির্বাচন করে তাদের পুরস্কৃত করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সরকারের 'জয়িতা' অন্বেষণ কার্যক্রমের আওতায় এ জয়িতাদের নির্বাচন করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীতে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

পাঁচ জয়িতার মধ্যে কেউ বীরাঙ্গনা, কেউ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, কেউ শারীরিক প্রতিবন্ধী, কেউবা সফল ব্যবসায়ী বা সফল জননী।

'অনন্যা শীর্ষ ১০ সম্মাননা ২০১৬' প্রদান

২৪তম 'অনন্যা শীর্ষ ১০ সম্মাননা ২০১৬' প্রদান করা হয়েছে ৬ই মে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে অদম্য ১০ নারীকে *পাক্ষিক অনন্যা* এ পুরস্কার প্রদান করে। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দশ নারীর হাতে সম্মাননা তুলে দেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

নারী পরিচালিত ফিলিং স্টেশন

পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার উত্তর চক গ্রামে শালুক ফিলিং স্টেশনটি পরিচালিত হচ্ছে সব নারী কর্মীদের দ্বারা। এখানে ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক, পাম্প অপারেটরসহ সবাই নারী। ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা এবং বেলা ২টা থেকে রাত ১০টা দুই পর্বে কাজ চলে এ ফিলিং স্টেশনে। এক সপ্তাহ পর পর পালা বদল হয়। ফিলিং স্টেশনটি চালু হয় ২০০৮ সালে। তখন থেকেই অত্যন্ত সাফল্যের সাথে মূলত নারীরাই এটি চালান।

মেয়েদের নিয়ে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

মেয়েদের নিয়ে 'ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট ২০১৭' (এনজিপিপি) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টরন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। আর জাতীয় পর্যায়ের এ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) 'চুয়েট ডায়মন্ড অ্যান্ড রাস্ট' দল।

সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ১০২টি দল এতে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ সড়কের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই মে বিশ্বের দীর্ঘতম কক্সবাজার–টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের উদ্‌বোধন করেন। পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য নির্মিত ৮০ কিলোমিটার এ সড়কের একপাশে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত, অন্যপাশে রয়েছে পাহাড়ের সারি। হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে তিন ধাপে এই নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সড়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই নির্মাণকাজ পরিচালনা করে।

দুর্ঘটনা রোধে ২০০ জন চালককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ব্র্যাক

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালকদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে ব্র্যাক। ১৯শে মে উত্তরার ব্র্যাক ড্রাইভিং স্কুলে আয়োজিত 'সুরক্ষা' সড়ক নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষামূলক গাড়ি চালনা প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ করেছে ব্র্যাক। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চালকের দক্ষতার পাশাপাশি সচেতনতা ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটবে। এতে সড়ক দুর্ঘটনাও হ্রাস পাবে।

ঢাকার গৈদারটেক–মনসুরাবাদ সংযোগ সেতু ও সড়ক উদ্‌বোধন

ঢাকার গৈদারটেক–মনসুরাবাদের মধ্যে সংযোগ সেতু ও সড়ক উদ্‌বোধন করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক। গৈদারটেক–মনসুরাবাদ এলাকা ঢাকার ১৩ নাম্বার ও ১৪ নাম্বার সংসদীয় এলাকার মধ্যে পড়েছে। সেতু তৈরির আগে গৈদারটেক থেকে মনসুরাবাদে নৌকায় যাতায়াত করতে আধা ঘণ্টা সময় লাগত। বর্তমানে সেতু উদ্‌বোধনের ফলে ১৩ নাম্বার সংসদীয় এলাকার সঙ্গে ১৪ নাম্বার সংসদীয় এলাকার সরাসরি সংযোগ হয়েছে। ১৩ নাম্বার এলাকার মধ্যে পড়েছে শ্যামলী রিং রোড, আদাবর ও আশপাশের এলাকা আর ১৪ নাম্বারের মধ্যে পড়েছে গৈদারটেক, মাজার রোড ও গাবতলী, কল্যাণপুর।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক ঢাকার গৈদারটেক-মনসুরাবাদের মধ্যে সংযোগ সেতু ও সড়ক উদ্‌বোধন করেন

বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণের দায়ে ১৫৪৯ জনকে জরিমানা

বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণের দায়ে ৯ই মে ও ১০ই মে এই দুদিনে এক হাজার ৫৪৯ জনকে জরিমানা করেছে ঢাকা রেলওয়ের কমার্শিয়াল বিভাগ। জরিমানা হিসাবে ১০ই মে সকাল থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিমানবন্দর স্টেশনে বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণকারী এক হাজার ২৯ জনের কাছ থেকে দুই লাখ ৯৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ৯ই মে ৫২০ জনের কাছ থেকে আদায় করা হয় ১ লাখ ১৬ হাজার ৯২০ টাকা। এ নিয়ে গত দুদিনে বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের অভিযোগে ১৫৪৯ জনের কাছ থেকে চার লাখ ১০ হাজার ৮২০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

শিশু অধিকার সূচকে বাংলাদেশ ৮৭তম

শিশু অধিকার সূচকে ১৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৭তম। নেদারল্যান্ডসভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'কিডস রাইটার ফাউন্ডেশন' দেশগুলোর এই অবস্থান নির্ণয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে। এ সূচকে বাংলাদেশ ভারত, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও পাকিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। তথ্য অনুযায়ী অধিকার ভোগ করার দিক থেকে শীর্ষে আছে ইউরোপের দেশ পর্তুগালের শিশুরা। আর সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আফ্রিকার দেশ আফ্রিকান রিপাবলিক, ইউরোপের দেশ লিসটেন্সটাইন ও পোল্যান্ডের শিশুদের।

শিশুদের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, অধিকার এবং অধিকার ভোগ করার পরিবেশ– এই পাঁচটি বিষয়ে ২৩টি সূচকের ভিত্তিতে দেশগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

শিশু সুরক্ষা হেলপ লাইনে প্রায় ১ লাখ শিশু সহায়তা পেয়েছে

শিশু সুরক্ষায় সরকারি 'চাইল্ড হেলপ লাইন' সরাসরি নাম্বার ১০৯৮-এ গত দেড় বছরে প্রায় ১ লাখ শিশুকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা ১৭ই মে শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত 'পথশিশু উন্নয়ন ভাবনা ও ৫ জন পথশিশুর সার্বিক দায়িত্ব হস্তান্তর' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, 'শিশু অধিকারসমূহের পরিবেশগত সুরক্ষা' প্রকল্পের আওতায় পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশু কল্যাণে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০টি জেলায় ৪০ হাজার শিশু-কিশোরকে ২ হাজার করে অর্থ সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে।

দেশের পথশিশুদের জরিপ কাজও সম্পন্ন হয়েছে। তিনি দুস্থ ও অসহায় পথশিশুদের কল্যাণে বিত্তবান মানুষকে সাধ্যমতো সহায়তা দানের আহ্বান জানান।

পরিবেশ সুরক্ষায় শিশু-কিশোরদের শপথ গ্রহণ

১৯শে মে সরকারি শিশু-কিশোর পত্রিকা *নবারুণ* আয়োজিত পরিবেশ সম্মেলনে শিশু-কিশোররা পরিবেশ রক্ষা ও এর যত্ন নেওয়ার বিষয়ে নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়েছে।

এদিন তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রকাশিত শিশু-কিশোর মাসিক *নবারুণের* খুদে লেখক ও আঁকিয়েদের নিয়ে আয়োজন করে 'নবারুণ পরিবেশ সম্মেলন'। সম্মেলনে প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু উপস্থিত শিশু-কিশোরদের

১৯শে মে ২০১৭ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত নবারুণ পরিবেশ সম্মেলনে উপস্থিত শিশু-কিশোররা –ডিএফপি

সাথে অন্তরঙ্গ আলাপকালে পরিবেশ রক্ষা বিষয়ে ছন্দোবদ্ধ স্লোগান দেন। শত কিশোর এসময় মন্ত্রীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে, ' ভালো করে লেখাপড়া শিখব, পশুপাখি গাছপালা মায়া করব, ঘরবাড়ি আশপাশ ঠিকঠাক রাখব'।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ রক্ষা করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব। আর এজন্য শিশুকাল থেকেই পরিবেশের বন্ধু হিসেবে গড়ে ওঠা জরুরি। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন। **প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন**

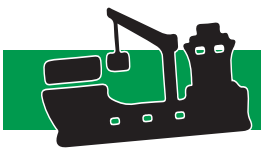

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

এগিয়ে যাচ্ছে দেশীয় পোলট্রি শিল্প

দেশের অর্থনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত পোলট্রি শিল্প। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৮৫ লাখ মানুষ এ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এ শিল্প খাত সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, বর্তমানে বাংলাদেশের মোট মাংসের চাহিদার ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশই এ শিল্প থেকে আসছে। দেশের ডিম ও মাংসের শতভাগ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির প্রস্তুতিও নিচ্ছে দেশীয় পোলট্রি কোম্পানিগুলো। বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে পোলট্রি শিল্পের অবদান প্রায় ২ দশমিক ৪ শতাংশ। তবে এ পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে। তাছাড়া পোশাক শিল্পের পর এটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত। পরিস্থিতি বিবেচনায়, আগামী ২০১৭–১৮ অর্থবছরের বাজেটে পোলট্রি শিল্প খাতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সরকার।

রপ্তানি পণ্য বৈচিত্র্যকরণে নির্মাণ শিল্প খাত

১১ই মে নিরাপদ নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী 'সেইফকন ২০১৭' উদ্‌বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। এ সময় তিনি বলেন, পদ্মা বহুমুখী সেতু, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেল প্রকল্পের মতো মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে দেশের নির্মাণ শিল্প খাত বিকাশের অপার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাই দেশেই আন্তর্জাতিক মানের নির্মাণ উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। এর ফলে নির্মাণ সামগ্রীর অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। তাই এ শিল্পখাতের প্রসার রপ্তানি পণ্য বৈচিত্র্যকরণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

আমদানি-রপ্তানি অফিসে সহজ সেবা

বর্তমানে আমদানি-রপ্তানি অফিসে ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা গ্রহণের জন্য ব্যবসায়ীদের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হয় এবং অনলাইনেই রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও নবায়ন করা হয়। ফলে ব্যবসায়ীদের জন্য এ সেবা প্রাপ্তি সহজ হয়েছে। বাণিজ্য সহজ এবং ব্যবসায়ীদের দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য এ অফিসে ডিজিটাল সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। গত ২১শে মে ঢাকায় আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের নতুন কার্যালয় উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ১১ই মে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নিরাপদ নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী 'সেইফকন ২০১৭' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

তোফায়েল আহমেদ এসব কথা বলেন। দেশের বাণিজ্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'গত অর্থবছরে আমাদের রপ্তানি আয় ছিল ৩৪ দশমিক ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ দশমিক ৭৭ ভাগ। এ বছর রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালে এ রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াবে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে।

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

ডিএফপি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫ অর্জন

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর নিবেদিত ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর গণহত্যার ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি*। এ চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন আবদুল্লাহ আল হারুন। এর ব্যাপ্তিকাল ২৫ মিনিট। ২০১৫-এর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এ প্রামাণ্যচিত্রটির কাহিনি মূলত ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর সমগ্র বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা চালায় তা ঘিরে। এই

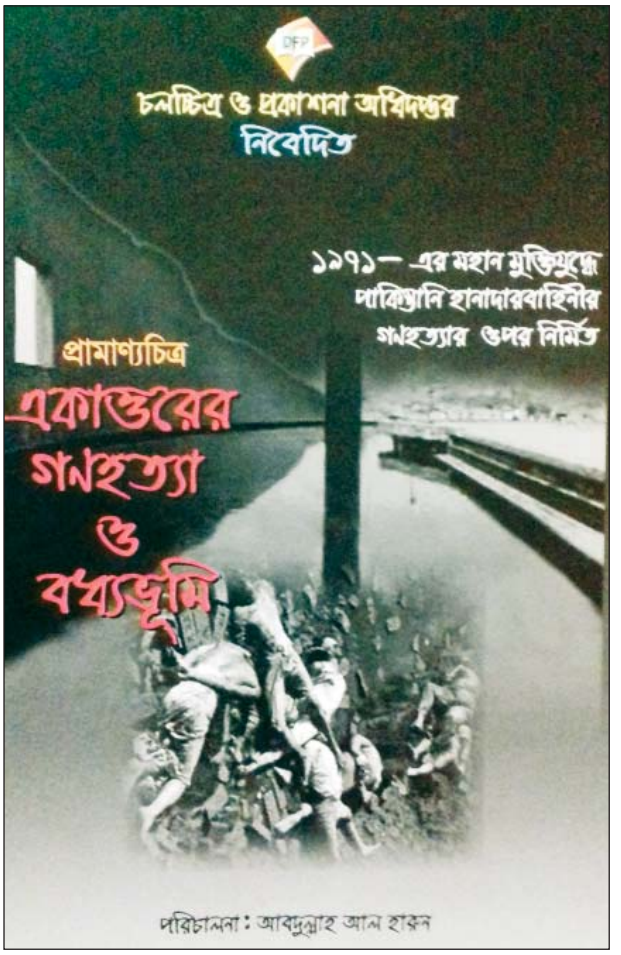

৭১-এর গণহত্যা ও বধ্যভূমি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে শুটিং দল –ডিএফপি

গণহত্যার প্রক্রিয়া যেমন ছিল পৈশাচিক ও ভয়াবহ তেমনি ছিল নৃশংস আর নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষরবাহী। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের গুলি করে, আগুনে পুড়িয়ে, বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে, জবাই করে আবার কখনোবা নির্যাতনের পর গর্তের মধ্যে ফেলে জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। '৭১- এ গোটা দেশটাই পরিণত হয়েছিল বধ্যভূমি আর গণকবরে। আর সেসব গণকবরগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এ প্রামাণ্যচিত্রটিতে নিখুঁতভাবে।

একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি প্রামাণ্যচিত্রটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' দিয়ে শুরু হয়েছে। এরপর দেওয়া হয় গোটা দেশে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের নির্মম ও ভয়াবহ সব মুক্তিযুদ্ধের গণকবরগুলোর চিত্র ও তার বর্ণনা। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী প্রথমে ঢাকা থেকে শুরু করে তাদের বর্বরোচিত অত্যাচারের নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ কর্মকাণ্ডের তাণ্ডবলীলা। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর প্রথম লক্ষ্যবস্তু ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জল্লাদখানা বধ্যভূমি থেকে শুরু করে ঢাকার রায়ের বাজার বধ্যভূমির ছিন্নভিন্ন লাশের চিত্র এবং সেখানকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এভাবে ঢাকার আরো অনেক বধ্যভূমি দেখানো হয়েছে প্রামাণ্যচিত্রে। ঢাকা থেকে শুরু করে খুলনা, বাগেরহাট, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম, সিলেট, নওগাঁ এভাবে সব জেলার বিখ্যাত বধ্যভূমি দেখানো হয়েছে এবং খুব চমৎকারভাবে তার বর্ণনা করা হয়েছে। এসব বধ্যভূমিতে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পরিচয়, প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাদের স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। সবদিক বিবেচনায় *একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি* প্রামাণ্যচিত্রটির চমৎকার বিষয়বস্তু, কাহিনি ও নির্মাণশৈলীর কারণে ছবিটি ২০১৫ সালের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যচিত্র পুরস্কার জিতে নেয়। এটা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের একটা বড়ো অর্জন।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫ ঘোষণা

বেশ কয়েক বছর ধরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভিন্নধারার ছবির জয়জয়কার চলছে। এবারের পুরস্কারের ২৫ ক্যাটাগরির মধ্যে সেরা ছবিসহ ১৭টি পুরস্কারই দখল করেছে ভিন্নধারার চলচ্চিত্রগুলো। জাতীয় পুরস্কার যারা পেলেন– আজীবন সম্মাননা শাবানা ও ফেরদৌসী রহমান, সেরা নায়ক শাকিব খান ও মাহফুজ, নায়িকা জয়া আহসান। ১৮ই মে ঘোষিত ২০১৫ সালের জাতীয় পুরস্কারে

সেরা ছবি হিসেবে সম্মাননা পায় যৌথভাবে দুটি ছবি। এগুলো হলো– *বাপজানের বায়স্কোপ* ও *অনিল বাগচীর একদিন*। এ দুটি ছবির নির্মাতা যথাক্রমে রিয়াজুল মওলা রিজু ও মোরশেদুল ইসলাম সেরা নির্মাতার পুরস্কার পান। সেরা পার্শ্ব চরিত্রের পুরস্কার পায় গাজী রাকায়েত *(অনিল বাগচীর একদিন)* ও তমা মির্জা *(নদীজন)*। শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী হিসেবে পুরস্কার পায় যারা যারিব *(প্রার্থনা)*। একই শাখায় একই ছবির জন্য বিশেষ পুরস্কার পায় প্রমিয়া রহমান। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক সানী জুবায়ের (*অনিল বাগচীর একদিন*)। শ্রেষ্ঠ গায়ক : যুগ্মভাবে সুবীর নন্দী (তোমারে ছাড়িতে বন্ধু, চলচ্চিত্র *মহুয়া সুন্দরী*) ও এস আই টুটুল (উথাল পাথাল জোয়ার, চলচ্চিত্র *বাপজানের বায়স্কোপ*)। শ্রেষ্ঠ গীতিকার আমিরুল ইসলাম (উথাল পাথাল জোয়ার, চলচ্চিত্র *বাপজানের বায়স্কোপ*, শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার মাসুম রেজা *(বাপজানের বায়স্কোপ)*, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার যুগ্মভাবে মাসুম রেজা *(বাপজানের বায়স্কোপ)* ও মো. রিয়াজুল মওলা রিজু (*বাপজানের বায়স্কোপ*), শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা হুমায়ূন আহমেদ *(অনিল বাগচীর একদিন)* শ্রেষ্ঠ সম্পাদক মেহেদী রনি *(বাপজানের বায়স্কোপ)* শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান : শফিক *(জালালের গল্প)*। এছাড়া ডিএফপি নির্মিত *একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি* ২০১৫ সালের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে।

ঈদের দুই ছবি নবাব ও রাজনীতি

ঈদে মুক্তি পাচ্ছে বাংলাদেশের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়া ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এসকে মুভিজের যৌথ প্রযোজনায় *নবাব* ছবিটি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জয়দীপ মুখার্জি। এ ছবিতে অন্য এক শাকিবকে দেখতে পাবে ভক্তরা। সিনেমাটিতে শাকিবের নায়িকা শুভশ্রী। *নবাব* ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে বাংলাদেশে আর কলকাতায় মুক্তি পাবে জুলাইয়ে। ঈদে আরো মুক্তি পাচ্ছে শাকিব খান এবং অপু বিশ্বাস জুটির *রাজনীতি* ছবিটি। এই ছবির শুটিং হয়েছে BFDC চত্বর ফ্লোরে এবং নেপালে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বুলবুল বিশ্বাস। **প্রতিবেদন : মিতা খান।**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মে নৌবাহিনী সদর দপ্তরে 'সেরা সাতারুর খোঁজে বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন –পিআইডি

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

খুদে সাঁতারুরা একদিন বিশ্বসেরা হবে– প্রধানমন্ত্রী

২৫শে মে 'সেরা সাঁতারুর খোঁজে বাংলাদেশ' শীর্ষক সুইমার ট্যালেন্টহান্ট অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের নতুন প্রজন্মের সাঁতারুরা সঠিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে আগামীতে বিশ্বমানের প্রতিযোগী হয়ে উঠবে। নৌবাহিনী সদর দপ্তরে এই অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী।

একদিনের ক্রিকেটের র‍্যাংকিংয়ে ছয় নাম্বারে উঠে এসেছে বাংলাদেশ

একদিনের ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কাকে ডিঙিয়ে বাংলাদেশ ছয় নাম্বারে উঠে এসেছে। মে ২০১৭ আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে ভালো করায় ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের এই উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ উভয়ের ওয়ানডে র‍্যাংকিং পয়েন্ট ৯৩। এরপর সপ্তম স্থানে শ্রীলঙ্কা, অষ্টম স্থানে পাকিস্তান, নবম স্থানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবস্থান করছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বড়ো কিছু করার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ

পয়লা জুন থেকে ইংল্যান্ডে শুরু হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভালো কিছু করার আশা করছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে ছাড়া টেস্ট খেলুড়ে বাকি আট দলকে নিয়ে ১লা জুন ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ এবার শক্ত গ্রুপে পড়েছে। বাংলাদেশের গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড রয়েছে। তথাপি শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তী কুমার সাঙ্গাকারা বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতার ডার্ক হর্স বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশ দল সেমি ফাইনালে খেলার স্বপ্ন দেখছে।

প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজংগী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এসকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে, কিনবে
লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 12, June 2017, Tk. 25.00

বিছানাকান্দি, গোয়াইনঘাট, সিলেট

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

জুন ২০১৭ ■ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৪